মাক্সিম গোর্কি

ইতালির রূপকথা

'...ইতালির অপরূপ প্রকৃতির মোহনীয় পটে সত্যাসিদ্ধ কথায় মাক্সিম গোর্কি দেখাতে পেরেছেন ইতালীয় জনগণের জীবন: তাদের দারিদ্র্য, দুর্দশা, ক্লেশ আর মহৎ সংগ্রাম।'

জিয়োভান্নি জেরমানেত্তো
ইতালীয় লেখক

'রূপকথার জন্যে ধন্যবাদ... মানুষের জন্যে কী ভালোবাসা তাতে, তার প্রাণ সম্পর্কে কত যে চেতনা, প্রকৃতির কী না অনুভব। আশ্চর্য রোদ-ঝলমল বই!'

মিখাইল কংসিউবিনস্কি
ইউক্রেনীয় লেখক

ইটালির রূপকথা

মাক্সিম গোর্কি

ইতালির রূপকথা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইয়া. মালিকভ

তৃতীয় সংস্করণ

Максим Горький

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

На языке бенгали

Maxim Gorky

TALES OF ITALY

In Bengali

•

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Г $\frac{4702010200—575}{031(01)—84}$ 260—83

সূচি

ধর্মঘট	৯
পার্মার ছেলেরা	১৫
ফুল	২১
টানেল	২৬
শহর	৩৩
দুপুর	৩৬
শুভ বিবাহ	৪২
রাজনৈতিক কর্মী	৪৯
মা	৬০
বিকলাঙ্গ	৭১
বেইমানের মা	৭৯
মাঝির শেষ উপদেশ	৯০

বিচার	১০০
জিয়োভান্নির সিদ্ধান্ত	১০৮
ভাই বোন	১১৯
বুদ্ধিজীবী	১৩৯
আলাপ	১৫৪
প্রতিহিংসা .	১৬৩
জিয়োভান্নি তুবা	১৭৫
বুড়ো চেক্কো	১৮২
খ্রীস্টের জন্ম	১৯১
নুন্‌চা	২০২
কার্লোনে গালিয়ার্দি	২১৪
তরুণ ইতালি	২২৪
ঘৃণা	২২৯
পেপে	২৩৯
ইস্টার	২৪৮

'স্বয়ং জীবনের হাতে যা রচিত
তার চেয়ে সুন্দর রূপকথা কিছু নেই।'

হান্স এন্ডারসেন

ধর্মঘট

নেপ্‌ল্‌স্‌-এর ট্রামশ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। রিভিয়েরা-ডি-কিয়াইয়া জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি খালি গাড়ি। পিয়াজা দেল্লা ভিত্তোরিয়া-তে এসে জমায়েত হয়েছে একদল ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর — সকলেই তারা খাঁটি নেপ্‌ল্‌স্‌-স্বভাবী — ফুর্তিবাজ, হট্টগোলে, আর পারদের মতো টলমলে। পার্কের বেড়া ছাড়িয়ে লোকগুলোর মাথার ওপরে সরু তলোয়ারের মতো ঝিলিক দেয় একটা ফোয়ারার জলধারা। চারপাশ ঘিরে বিরূপ একদল লোকের ভিড় — বিস্তীর্ণ শহরটার নানা খানে তাদের যাবার কথা। দোকান-কর্মচারী, কারিগর, ছোটো ব্যবসায়ী আর মেয়ে-দর্জিদের এই ক্রুদ্ধ দঙ্গলটা ধর্মঘটীদের চিৎকার করে তিরস্কার করে চলে। দুপক্ষেই বলে কড়া কথা আর গা-জ্বালানো টিটকারি। হাত নাড়ারও বিরাম নেই, কেননা নেপ্‌ল্‌স্‌-এর লোকেরা বেয়াড়া জিভ দিয়ে যেমন, তেমনি হাত নেড়েও কথা বলে সমান ব্যঞ্জনায়।

একটু হালকা বাতাস বয়ে যায় সমুদ্র থেকে। শহুরে পার্কের বিশাল বিশাল পাম গাছগুলোর শ্যামলকৃষ্ণ শাখা মৃদুমন্দ দোলে পাখার মতো — গাছগুলোর গুঁড়ি দেখে মনে হবে যেন কোন এক

দানবীয় হাতির গোদা গোদা পা। নেপল্‌স্‌-এর রাস্তার যারা সন্তান, সেই সব অর্ধনগ্ন বাচ্চাগুলো হুটোপাটি করে বেড়ায়, চড়ুই পাখির মতো তাদের কিচির-মিচির হাসিখুশিতে বাতাস ভরা।

প্রাচীন একটা এনগ্রেভিং-এর মতো শহরটা দেখতে। তপ্ত রৌদ্রে তা নেয়ে উঠেছে, মনে হয় বুঝি মন্দ্রিত হয়ে চলেছে একটা অর্গানের মতো। শহরের হৈচৈ আর গণ্ডগোলের সঙ্গে তাম্বুরিনের চপচপের মতো অস্পষ্ট তাল দিয়ে, পাথরের বাঁধের ওপর আছাড় খেয়ে সঙ্গত করে চলে উপসাগরের নীল তরঙ্গরাশি।

ধর্মঘটীরা গোমড়া মুখে গা ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে। জনতার তীক্ষ্ন মন্তব্যের কোনো জবাব প্রায় না দিয়েই পার্কের রেলিং-এর ওপর উঠে লোকজনের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে কী দেখতে থাকে উদ্বিগ্ন হয়ে, মনে হয় যেন কুকুরের বেড়াজালে আটকা পড়েছে একদল নেকড়ে। বেশ বোঝা যায় একই রকম পোশাক-পরা এই লোকগুলো যা ঠিক করেছে তা করবেই এমন একটা প্রতিজ্ঞায় হাতে হাত মিলিয়েছে। তাতে আরো ধৈর্যচ্যুত হয়ে ওঠে ভিড়টা। কিন্তু জনতার মধ্যেও দার্শনিকের অভাব হয় নি। ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তারা রুষ্টতর ধর্মঘট-বিদ্বেষীদের বোঝায়:

'লোকগুলো যদি তাদের ছেলেপুলেদের মুখে দেবার মতো মাকারনিও না জোটাতে পারে, তাহলে কি করে বলুন, সিনোর?'

ফিটফাট সাজের পৌরসভা পুলিসের দুজন তিনজনের এক একটা দল তদারক করে, যাতে লোকের ভিড়ে গাড়ির রাস্তা না আটকায়। ওরা চেষ্টা করে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় নিরপেক্ষ থাকতে। ধিকৃত এবং ধিক্কারকারী উভয় পক্ষ সম্পর্কেই তারা সমান শান্ত। চিৎকার আর অঙ্গভঙ্গিতে যখন ব্যাপারটা বেশ গরম হয়ে ওঠে, তখন ওরা ভালোমানুষী টিটকারি দেয় উভয় পক্ষকেই। ছোটো ছোটো হালকা বন্দুকওয়ালা একদল সশস্ত্র সেপাই পাশের

গলির দালানের গায়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। গুরুতর সংঘর্ষ বাধলে তারা গিয়ে হস্তক্ষেপ করবে। তিনকোণা টুপি, খাটো কুর্তা, আর ট্রাউজারের দুপাশ দিয়ে নেমে আসা দুই ধারা রক্তের মতো লাল দুটো করে স্ট্রাইপে ওদের দেখায় কেমন ভয়ঙ্কর।

হঠাৎ থেমে যায় গালাগালি, টিটকারি, ধিক্কার আর অনুনয়-বিনয়ের পালা। নতুন একটা হাওয়া, ঠিক যেন মিটমাটের হাওয়া বয়ে যায়, ধর্মঘটীদের মুখচোখ আরো শক্ত। সেই সঙ্গে তারা এগুতে থাকে আরো ঘন হয়ে, ভিড় থেকে চিৎকার উঠছিল:

'সৈন্য!'

ধর্মঘটীদের উদ্দেশে সোল্লাস শিস আর টিটকারির সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল স্বাগত করার একটা হর্ষধ্বনি। হালকা ধূসর পোশাক আর প্যানামা-টুপি-পরা মোটা মতো একটি লোক হঠাৎ ফুটপাথের পাথরের ওপর পা ঠুকে নাচতে শুরু করে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে এগুতে থাকে কন্ডাক্টর আর ড্রাইভারেরা। তারা যায় ওয়াগনগুলোর দিকে, কেউ কেউ গাড়িতে চেপে বসে। চারদিককার উল্লাসের জবাবে ওরা যখন কাটা কাটা উত্তর দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোয়, তখন ওদের দেখায় কেমন আগের চেয়েও থমথমে। হৈচৈ থেমে আসে।

সান্তা লুচিয়া বাঁধের ওপর থেকে হালকা নাচের মতো কদম ফেলে আসে ধূসর পোশাকের হ্রস্বকায় একদল সৈন্য। ওদের পা পড়ে তালে তালে, যন্ত্রের মতো এক ভাবে দোলে বাঁ হাত। দেখে মনে হয় বুঝি টিনের সেপাই — কল দেওয়া খেলনার মতোই বা ঠুনকো। লম্বা সুপুরুষ একটি অফিসার ওদের নেতৃত্বে। লোকটার চোখে ভ্রূকুটি, ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের বাঁকা রেখা। তার পাশে লাফাতে লাফাতে আসে একটা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক, মাথায় টপ্-হ্যাট, অনর্গল কী যেন বলে যাচ্ছে প্রচণ্ড হাত নেড়ে।

গাড়িগুলোর কাছ থেকে সরে দাঁড়ায় ভিড়টা। ধূসর কয়েকটা পংক্তির মতো ছড়িয়ে পড়ে গাড়ির প্ল্যাটফর্মে যেখানে ধর্মঘটীরা দাঁড়িয়ে তার সামনে গিয়ে তাক করে দাঁড়ায় সৈন্যগুলো।

টপ্-হ্যাট-পরা লোকটার সঙ্গে আরো কিছু ভারিক্কি লোক এসে জুটেছিল। দারুণভাবে হাত নেড়ে তারা চিৎকার করে ওঠে:

'এই শেষ বারের বার... উল্টিমা ভোল্টা!* শুনতে পাচ্ছ?'

উদাসীন ব্যাজার এক ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অফিসার তা দিতে থাকে মোচে। টপ্-হ্যাটটা দোলাতে দোলাতে লোকটা ছুটে যায় তার কাছে। ভাঙা গলায় কি যেন বলে। কটাক্ষে তার দিকে একবার তাকিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় অফিসার, তারপর বুক চিতিয়ে হুকুম দেয় চিৎকার করে।

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা লাফিয়ে উঠতে থাকে ট্রামগাড়িগুলোর প্ল্যাটফর্মে, প্রতি প্ল্যাটফর্মে দুজন দুজন করে। অন্য দিক দিয়ে সেখান থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে ড্রাইভার কন্ডাক্টররা।

জনতার কাছে ব্যাপারটা মজার মনে হয়। হল্লা আর শিস আর হাসি ওঠে ভিড়ের মধ্যে থেকে। কিন্তু তক্ষুনি তা থেমে গেলে থমথমে উৎকণ্ঠিত মুখে বিস্ময়ে চোখ বড়ো বড়ো করে লোকগুলো সরে এসে গভীর নিঃশব্দে এগুতে থাকে সামনের ট্রামগাড়িখানার দিকে।

দেখা গেল সেখানে, গাড়ির চাকার ঠিক দুই পা আগে লোহার লাইনের ওপর আড়াআড়ি শুয়ে আছে একজন ড্রাইভার, পাকা চুলে ভরা মাথাটা থেকে খুলে ফেলেছে টুপি, মুখখানা তার সৈনিকের মতো, শুয়ে আছে চিত হয়ে, ছমছমে মোচজোড়া উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। বাঁদরের মতো পুঁচকে চটপটে একটা ছোঁড়া গিয়ে

---

* শেষ বারের বার।

শুয়ে পড়ল ড্রাইভারের পাশে। তারপর ধীরে সুস্থে শুয়ে পড়তে থাকে আরো অনেক, অনেক লোক...

ভিড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা গুঞ্জন ওঠে। শোনা যায় আর্তস্বরে 'মাডোনা'কে স্মরণ করার ডাক, ভয়ঙ্করভাবে শাপান্ত করতে থাকে কেউ, মেয়েরা চ্যাঁচাতে শুরু করে আর সর্বত্র দৃশ্যটায় অভিভূত বাচ্চাগুলো লাফায় রবার বলের মতো।

কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে কী যেন বলে টপ্-হ্যাট-পরা লোকটা। অফিসার তার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকায়: ওর সৈন্যেরা ড্রাইভারদের বদলি হবে বটে, কিন্তু ধর্মঘটীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাবার কোনো হুকুম ওর নেই।

টপ্-হ্যাট-পরা লোকটা অতঃপর কিছু ধামাধরা লোক জুটিয়ে চলে যায় সশস্ত্র সেপাইগুলোর কাছে, ওরা এসে লাইনের ওপর শুয়ে থাকা লোকগুলোকে তুলবার জন্য এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওদের ওপর।

ধস্তাধস্তি চলে কিছুটা। সহসা ধূলিধূসর গোটা ভিড়টাই দুলে ওঠে, হাঁক ছাড়ে, গর্জায়, তারপর ছুটে যায় লাইনের দিকে। পানামা-টুপি-পরা লোকটা তার টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বাগ্রে গিয়ে শুয়ে পড়ে ধর্মঘটীদের শেষ প্রান্তে আর পাশের ধর্মঘটীকে কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিতে থাকে উচ্চ কণ্ঠে।

ধপধপ করে একের পর এক লোকে লাইনের ওপর শুয়ে পড়তে শুরু করে, এমন-ভাবে যেন হঠাৎ তাদের পা খোয়া গেছে। ফুর্তিবাজ হৈহল্লা-করা এই লোকগুলো দু'মিনিট আগেও এখানে ছিল না। মাটির ওপর শুয়ে পড়ে ওরা হাসতে থাকে, পরস্পরকে মুখ ভেঙচায় আর চিৎকার করে অফিসারের উদ্দেশে। টপ্-হ্যাট-পরা লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অফিসারটা মৃদু হেসে তার

নাকের কাছে দস্তানাটা নাড়াচাড়া করে আর সুন্দর মাথাখানা দোলায়।

এদিকে লোকের পর লোক পড়ে লাইনের উপর — মেয়েরা ছুঁড়ে ফেলে তাদের ঝুড়ি-পুঁটলি, আর কুকুর কুণ্ডলী হয়ে হাসিতে লুটিয়ে পড়ে শুয়ে পড়তে থাকে ছোঁড়াগুলো। এমন কি সুদৃশ্য পোশাক-পরা লোকেরাও গড়াগড়ি দিতে শুরু করে ধুলোর মধ্যে।

প্রথম গাড়িখানার প্ল্যাটফর্মে যে পাঁচ জন সৈন্য মোতায়েন ছিল, তারা চাকার নিচে মানুষের স্তূপ দেখে রগড়ের দমকে হেসে ওঠে হো হো করে, ডাণ্ডায় ভর দিয়ে, মাথাটা পেছনে হেলিয়ে, শরীরগুলো সামনে ঝুঁকিয়ে। এখন আর তাদের মোটেই টিনের সেপাই বলে মনে হয় না।

...আধঘণ্টা বাদে ঝন ঝন, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে নেপ্‌ল্‌স্‌-এর রাস্তা দিয়ে ছুটল ট্রামগাড়িগুলো। গাড়ির মুখে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখ সহর্ষ বিজয়ীরা। গাড়ির ভেতরেও তারাই যাত্রীদের মধ্য দিয়ে পথ করে এগুতে এগুতে সসৌজন্যে জিগ্যেস করে:

'টিকিট ? !'

আর চোখ ঠেরে, হেসে, ভালোমানুষি মুখ ঝামটা দিয়ে যাত্রীরা এগিয়ে দিতে থাকে তাদের লাল হলদে নোট।

পার্মার ছেলেরা

জেনোয়া রেল স্টেশনের সামনেকার স্কোয়ারে প্রচণ্ড ভিড় জমেছে। তাদের বেশির ভাগই মজুর, তবে বেশ কিছু ভদ্র পোশাক-পরা সুপুষ্ট লোকও আছে। ভিড়ের সামনে পৌর পরিষদের সদস্যেরা। তাদের মাথার ওপরে নগরের ভারি পতাকা — তাতে সুনিপুণ রেশমী এম্ব্রয়ডারি। তার পাশেই পত পত করছে শ্রমিক সংগঠনগুলোর নানা-রঙা নিশান। ভিড়ের মধ্যে চক চক করে নিশানের সোনালী থোপনা, ঝালর, আর রশি, পতাকাদণ্ডের শীর্ষগুলো ঝকমক করে, শোনা যায় সিল্কের মর্মর, আর উৎসবমুখর ভিড়টা মৃদুস্বরে গুঞ্জন করে কোরাসের মতো।

তাদের মাথা ছাড়িয়ে, উচ্চ বেদীতে স্বপ্নদ্রষ্টা কলম্বাস মূর্তি — যিনি বহু দুঃখ সহ্য করেছিলেন বিশ্বাসের জন্য, — আর জেতেন, কেননা বিশ্বাস করেছিলেন। আজকেও যেন তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন, মর্মর মুখ তুলে বলছেন:

'তারাই জিতবে যাদের বিশ্বাস আছে।'

বেদী ঘিরে মূর্তির পায়ের কাছে বাদকদল তাদের বাজনাগুলো নামিয়ে রেখেছে। পেতলগুলো রোদে ঝকমক করে সোনার মতো।

স্টেশনের অর্ধবৃত্তাকার জগদ্দল মর্মর ভবনটা যেন তার পাখা প্রসারিত করে অপেক্ষমাণ জনতাকে আলিঙ্গন করতে চায়। বন্দর থেকে ভেসে আসে জাহাজের দীর্ঘশ্বাস, জলের মধ্যে প্রপেলার ঘোরার অস্পষ্ট শব্দ, শেকলের ঝমঝম, হুইসিল আর হল্লা। তপ্ত রোদ-ঢালা স্কোয়ারখানা কিন্তু চুপচাপ, গুমোট। বাড়ির জানলা আর ব্যালকনিতে মেয়েরা ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের পাশে উৎসবের পোশাক পরা বাচ্চাগুলোকেও দেখায় যেন ফুলের মতো।

স্টেশনে ঢোকার মুখে হুইসিল দেয় ইঞ্জিনটা, অমনি চঞ্চল হয়ে উঠে ভিড়, দলামোচড়া কয়েকটা টুপি ওড়ে বাতাসে, যেন কালো কয়েকটা পাখি। বাজনদাররা বাজনা তুলে নেয়, আর জনকয়েক গুরুগম্ভীর বয়স্ক লোক পোশাক ঠিকঠাক করে সামনে এগিয়ে যায়, তারপর জনতার দিকে ফিরে ডাইনে বাঁয়ে ক্রমাগত হাত নেড়ে কী বলতে শুরু করে।

ধীরে ধীরে লোক দুভাগ হয়ে রাস্তায় যাবার একটা চওড়া পথ করে দেয়।

'কাকে অভ্যর্থনার জন্যে ওরা এসেছে?'

'পার্মা শহরের ছেলেগুলোর জন্যে!'

পার্মাতে একটা ধর্মঘট চলছে, মালিকেরা হার মানতে রাজী নয়। মজুরদের অবস্থা সঙ্গীন, ছেলেমেয়েগুলো অনশনে ভুগতে শুরু করেছে, তাই এখন ওদের জড়ো করে পাঠিয়ে দিচ্ছে জেনোয়া-র সাথীদের কাছে।

স্টেশনের থাম্বাগুলোর পেছন থেকে আবির্ভূত হয় ছোটোদের দিব্যি একটা মিছিল; ছেলেগুলো অর্ধনগ্ন, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে তাদের দেখায় যেন কতকগুলো বিচিত্র লোমশ প্রাণী। এক-এক সারে পাঁচ জন করে দাঁড়িয়ে হাতে হাত দিয়ে ওরা হাঁটে, দেখায় কেমন ছোট্ট, ধূলিধূসর, বোঝা যায় ক্লান্ত। মুখগুলো ওদের গম্ভীর,

কিন্তু চোখগুলো উজ্জ্বল, পরিষ্কার। বাজিয়েরা গ্যারিবল্ডি বন্দনার বাজনা শুরু করতেই তাদের উপবাস-ক্লিষ্ট ছোটো ছোটো হাড়খোঁচা মুখের ওপর আনন্দের হাসি খেলে যায়।

ভবিষ্যতের এই নরনারীদের জনতা স্বাগত করে এক কর্ণভেদী চিৎকার তুলে, তাদের সামনে অবনত হয় নিশান আর ছেলেগুলোকে বিমূঢ় বিস্মিত করে দিয়ে বেজে উঠে পেতলের রামশিঙা। আচমকা এই অভ্যর্থনায় কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে ছেলেগুলো এক মুহূর্তের জন্য পেছিয়ে যায় তারপর দাঁড়ায় সিধে হয়ে, আর মনে হয় যেন তারা আগের চেয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে; আরো ঘন হয়ে আসে যেন একটি দেহে, আর শত শত কণ্ঠে একটি বুকভরা ধ্বনিতে চেঁচিয়ে ওঠে:

'ভিভা ইতালিয়া!'*

ছেলেগুলোর দিকে ছুটে যেতে যেতে বজ্রকণ্ঠে জনতা বলে: 'তরুণ পার্মা জিন্দাবাদ!'

'এভ্ভিভা গ্যারিবল্ডি!'** ধূসর একটা কীলকের মতো জনতাকে ভেদ করে, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে ছেলেগুলো।

হোটেলের জানলাগুলো থেকে আর ঘরবাড়ির ছাত থেকে শাদা শাদা পাখির মতো পাখা নাড়ে রুমাল আর নিচের লোকেদের মাথার ওপর নেমে আসে পুষ্পবৃষ্টি আর ফুর্তির উচ্চ চিৎকার।

সবকিছুতেই একটা উৎসবের আবহাওয়া জেগে ওঠে, সবকিছুই যেন উঠে দাঁড়ায় প্রাণ পেয়ে, এমন কি ধূসর মর্মর পাথরগুলো পর্যন্ত ঝলমল করে ওঠে রঙের ছোপে।

---

* ইতালির জয় হোক।

** জয় হোক গ্যারিবল্ডির।

বাতাসে দোলে নিশান, ফুল আর টুপি ওড়ে আকাশে, বয়স্ক লোকেদের মাথার ওপরে উ'চু হয়ে ওঠে বাচ্চাগ্লোর ছোটো ছোটো মাথা, গাঢ় রঙের ছোটো ছোটো হাত বাড়িয়ে তারা অভিনন্দন জানায় আর লুফতে শুরু করে ফুলগুলো, বাতাসে অবিরাম ধ্বনিত হতে থাকে প্রচণ্ড এক নির্ঘোষ:

'ভিভা ইল সোশ্যালিজমো!'*

'এভ্ভিভা ইতালিয়া!'

প্রায় সবকটি বাচ্চার হাত ধরে আছে কেউ না কেউ, কেউ কেউ ওঠে বয়স্কদের কাঁধে, কাউকে কাউকে চেপে ধরা হয়েছে কঠোর-দর্শন সগুম্ফ লোকগুলোর চওড়া বুকের ওপর। গোলমাল হাসি আর চিৎকারে বাজনার শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

ভিড়ের মধ্যে ছোটাছুটি করে অবশিষ্ট আগন্তুকদের কোলে তুলে নিতে নিতে পরস্পর চে'চামেচি করে চলে মেয়েরা:

'আন্নিতা, আপনি দুজনকে নিচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, আর আপনিও তাই?'

'খোঁড়া মার্গারেটকেও একটা দিতে হবে কিন্তু...'

চারিদিকেই সানন্দ উৎসবাকুল মুখ, করুণাঘন সজল চোখ। ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ছেলে রুটি চিবুতে শুরু করেছে।

'আমাদের কালে এমন কাণ্ড ভাবতেই পারত না কেউ!' মন্তব্য করে এক বুড়ো: নাকটা তার শুকপাখির ঠোঁটের মতো, দাঁতে গোঁজা কালো একটা চুরুট।

'অথচ কী সোজা ব্যাপার...'

'ঠিকই, সোজাও বটে, বিচক্ষণও বটে।'

মুখ থেকে চুরুট খসিয়ে বুড়ো তাকায় তার ডগায়, ছাই

---

* সোশ্যালিজ্‌ম্‌ জিন্দাবাদ!

ঝাড়তে ঝাড়তে নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর কাছেই দুটি পার্মার ছেলেকে দেখতে পেয়ে — বোঝাই যায় ওরা দুটি ভাই — ভয়ানক রকমের একটা মুখের ভাব করলে সে, যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে তার লোম। তা দেখে তাকিয়ে থাকে গম্ভীর মুখ ছেলেদুটো। লোকটা ইতিমধ্যে চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে দুই হাত ছড়িয়ে দেয়। তারপর ছেলেদুটো ঘেঁষাঘেঁষি করে ভ্রূ কুঁচকে যেই পেছিয়ে যাবার চেষ্টা করে অমনি বুড়ো হঠাৎ উবু হয়ে বসে সজোরে ডাকতে শুরু করল মোরগ-ডাক। আর পাথর-বাঁধা রাস্তার ওপর নগ্ন পা ঠুকে হো হো করে হেসে ওঠে ছেলেরা। আর উঠে টুপি ঠিক করে নিয়ে দুর্বল পায়ে টলতে টলতে হেঁটে চলে যায় লোকটা, ভাবখানা যেন সে তার কর্তব্যটুকু করে গেল।

কলম্বাসের মূর্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি কুঁজো মেয়ে, মাথায় পাকা চুল, মুখখানা যেন ডাইনির মতো, হাড্ডিসার থুতনির ওপর শক্ত শক্ত পাকা পাকা কিছু লোম। মেয়েটা কাঁদতে শুরু করে আর লাল চোখদুটো মুছতে থাকে তার বিবর্ণ শালের প্রান্ত দিয়ে। লোকেদের এই উদ্বেল ভিড়ের মধ্যে কুৎসিত ময়লা রঙের মেয়েটাকে লাগে কেমন অদ্ভুত নিঃসঙ্গ...

নাচতে নাচতে চলেছে কৃষ্ণকেশী এক জেনোয়া-ওয়ালী। সঙ্গে তার সাত বছরের বাচ্চা। বাচ্চাটার পায়ে কাঠের জুতো, মাথায় তার ধূসর টুপি কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। ছোট্ট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ছেলেটা চেষ্টা করে যাতে টুপিতে তার চোখ ঢাকা না পড়ে যায়, টুপিটা কিন্তু ক্রমাগত তার মুখের ওপর ঝুলে ঝুলে পড়ে। তাই দেখে মেয়েটা টুপিখানা খুলে নিয়ে হাওয়ায় দোলাতে শুরু করে, আর হাসতে থাকে, কী যেন গাইতে থাকে। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে ছেলেটা মাথা তুলে একবার দেখে তারপর লাফাতে শুরু করে টুপিটা ধরবার জন্য। ওই ভাবেই ওরা সরে যায় দৃষ্টির বাইরে।

চামড়ার এপ্রণ-পরা একটা লম্বা লোক: বিশাল হাতদুটো তার অনাবৃত। কাঁধের ওপর চাপিয়েছে একটা ছয় বছরের বাচ্চা মেয়েকে। ছোট্টখাট্ট ধূসর কেমন একটা ইঁদুরের মতো দেখায় মেয়েটাকে।

লোকটার পাশে পাশে হাঁটছে একটা মেয়ে। আগুনের মতো লালচুলো একটা বাচ্চাকে সে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। মেয়েটাকে বলছিল লোকটা:

'কি বলছিলাম জানো... এই রকম ব্যাপার যদি বেশ রপ্ত হয়ে যায়, তাহলে আমাদের হারানো সহজ হবে না, তাই না?'

তারপর বিজয়ের এক গাঢ় উচ্চহাসি হেসে সে তার কাঁধের ওপরকার ছোট্ট বোঝাটাকে নীল শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে:

'এভ্‌ভিভা পার্মা-আ!'*

ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে লোকজন। চলে যায় ছেলেগুলোকে কেউ কাঁধে চাপিয়ে, কেউ হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে। শূন্য হয়ে যায় স্কোয়ার, পড়ে থাকে শুধু দলিত ফুলগুলো, লজেন্সের মোড়ক, একদল ফুর্তিবাজ কুলী আর তাদের সকলের ওপর সেই মহান মানবের মূর্তি যিনি আবিষ্কার করেছিলেন নতুন জগৎ।

আর রাস্তায় নতুন জীবনের দিকে যারা এগিয়ে চলেছে সেই জনগণের উল্লাসধ্বনি নির্গত হতে থাকে ঠিক যেন এক বিপুল রামশিঙা থেকে।

---

* পার্মা জিন্দাবাদ।

ফুলে

গুমোট দুপুর। কোথায় যেন দ্বিপ্রহরের তোপ পড়ে, অতিকায় একটা পচা ডিম ফাটানোর মতো কেমন একটা অদ্ভুত নরম আওয়াজ করে। বিস্ফোরণে ঘুলিয়ে ওঠে শহরের যত কটু গন্ধ — অলিভ তেল আর রশুন আর মদ আর রোদ-পোড়া ধুলোর গন্ধ যেন আরো ঝাঁঝালো লাগে।

কামানের ঢপঢপে শ্বাসে চাপা পড়ে দক্ষিণী দিনের তপ্ত কোলাহল যেন মুহূর্তের জন্য মুখ গুঁজেছিল রাস্তার গনগনে পাথরগুলোয়। মুহূর্ত পরেই তা আবার রাস্তায় আছড়ে পড়ে চওড়া ঘোলা একটা নদীর মতো বইতে থাকে সমুদ্রের দিকে।

ধর্মযাজকের জমকালো নক্সা তোলা পোশাকের মতো শহরটা চিত্রবিচিত্র বর্ণাঢ্য। তার আবেগঘন চিৎকার, বুকের দুরুদুরু আর গোঙানি যেন জীবনের স্তবগানে ঝঙ্কৃত। সব শহরই হল মানুষের মেহনতে তোলা এক একটা মন্দির, সব মেহনতই হল ভবিষ্যতের কাছে এক-একটি প্রার্থনা।

আকাশের মধ্যবিন্দুতে সূর্য। আগুনে নীল আকাশ চোখ ধাঁধায়। যেন তার প্রতি বিন্দু থেকে পৃথিবী আর সমুদ্রের ওপর

নেমে আসছে আগুনে নীল এক-একটি কিরণ, জল আর শহুরে পাথরের বুকে বিঁধে যাচ্ছে গভীরভাবে। রুপোলী জরির ঘন কাজ করা জামদানি সিল্কের মতো ঝক ঝক করে সমুদ্র — তার উষ্ণ-শ্যাম তরঙ্গের নিদ্রালু ভঙ্গিতে তট সামান্য ছুঁয়েই, মৃদুস্বরে গায় জীবন আর সুখের উৎস সূর্যকে নিয়ে এক সম্বোধি গান।

দলে দলে ধুলো-মাখা ঘামঝরা মানুষ ফুর্তিতে, হৈচৈ করে; ডাকাডাকিতে সাড়া দিয়ে চলেছে তাদের দুপুরের খাওয়ার জন্য। অনেকে ছুটে যায় সৈকতের দিকে, ধূসর জামাকাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। জলের মধ্যে তাদের ব্রোঞ্জরঙা শরীরগুলো দেখায় হাস্যকর রকমের ছোটো ছোটো, যেন বিরাট এক পাত্র সুরার মধ্যে কালো কালো কয়েকটা ধূলিকণা।

জলের রেশমী তরঙ্গাঘাত, দেহে তাজা হয়ে স্নানার্থীদের খুশির চিৎকার, বাচ্চাগুলোর উচ্চ হাসি আর চিল্লানি — আর এই সবকিছুর সঙ্গে লোকেদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় খান খান হয়ে যাওয়া সমুদ্রের রামধনুরঙা জলোচ্ছ্বাস যেন নিবেদিত হয়ে চলেছে সূর্যের কাছে এক সানন্দ অর্ঘ্যের মতো।

পেভমেণ্টের ওপর উঁচু একটা বাড়ির ছায়ায় বসে খাবার আয়োজন করে রাস্তা তৈরির চারটে মজুর — শক্ত, শুকনো, আর ধূসর। তীক্ষ্ম চোখ কুঁচকিয়ে পাকাচুলো একটা বুড়ো লম্বা রুটি কাটে। ফালাগুলো যাতে ছোটো বড়ো না হয়ে যায় সেই দিকে তার কড়া নজর। বুড়োটার সারা শরীর ধূলিময়, যেন ছাই ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ। মাথায় একটা হাতে-বোনা লাল টুপি। টুপির খোপা ক্রমাগত তার চোখের ওপর এসে পড়ে আর থেকে থেকে সে তার প্রকাণ্ড ঋষিতুল্য মাথাটা ঝাঁকায়, ফোঁৎ ফোঁৎ করে তার লম্বা শুকচঞ্চু নাক, ফুলে ওঠে নাসারন্ধ্র।

বাহাদুর চেহারার একটা ছোকরা লোকটার পাশে গরম পাথরের

ওপর চিতপাত দিয়ে শুয়ে। ছেলেটার গায়ের চামড়া ব্রোঞ্জের মতো, মাথার চুলগুলো ভিমরুলের মতো কালো। মুখের ওপর তার ঝরে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো রুটি, আর আলস্যে চোখ কোঁচকায় ছোকরাটা, গুন গুন করে গান গায় যেন ঘুমের মধ্যে। বাকি দুজন লোক বাড়িখানার শাদা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বসে ঢোলে।

এক হাতে এক পাত্র মদ আর অন্য হাতে একটা ছোটো বাণ্ডিল নিয়ে একটি ছেলে এগিয়ে আসে তাদের দিকে। মাথা হেলিয়ে পাখির মতো তীক্ষ্ন চিৎকার করে কি যেন বলে ছেলেটা। ওর খেয়াল নেই যে বোতলের খড়ের মোড়ক থেকে চুনির মতো লাল ঘন মদ চুইয়ে পড়ছে মোটা মোটা ফোঁটায়।

বুড়ো লোকটার চোখে পড়ে তা। শুয়ে থাকা ছোকরাটার বুকের ওপর রুটি আর ছুরি রেখে সে ছেলেটার দিক হাত নেড়ে চিৎকার করে বলে:

'জলদি! কানা কোথাকার! মদ পড়ে যাচ্ছে যে!'

মদের পাত্রটা মুখের সামনে উঁচু করে তোলে ছেলেটা, তারপর আফশোষের শব্দ করে দৌড়ে ছুটে আসে মজুরগুলোর দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই চঞ্চল হয়ে ওঠে তারা, চিৎকার করে উত্তেজনায় পাত্রটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখতে থাকে। ছেলেটা তীরবেগে ছুটে যায় একটা বাড়ির আঙিনায় আর সমান ক্ষিপ্রতায় সেখান থেকে ফিরে আসে বড়োসড়ো হলদে রঙের একটা জামবাটি নিয়ে।

মাটির ওপর নামিয়ে রাখা হল বাটিটা। তাতে লাল সঞ্জীবনী ধারা বুড়ো ঢালে সযত্নে। চারজোড়া চোখ মুগ্ধ হয়ে দেখে রোদ্দুরে সুরার ঝিলিক। শুকনো ঠোঁটগুলো তাদের লোভে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

পেভমেণ্টের ওপর বাদামী জুতোর উঁচু হিলে শব্দ তুলে আসতে দেখা যায় একটি নারীকে, পরনে তার ফিকে নীল রঙের পোশাক,

কালো চুলে সোনালী লেসের উড়নী। সঙ্গে হাত ধরা একটি কোঁকড়া-চুল ছোট্ট মেয়ে, ডান হাতে তার দুটি লাল কার্ণেশন ফুল। হাতটা দোলাতে দোলাতে সে গেয়ে চলছে:

'ও মা, ও মা, ও মিয়া মা-আ...'*

বুড়ো মজুরের পেছনে এসে মেয়েটার গান থামল। পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে সে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে দেখে বুড়োটার কাঁধের ওপর দিয়ে। দেখে হলদে বাটিতে মদ পড়ছে, বইছে, কল কল করছে যেন তার গানেরই খেই ধরে।

মায়ের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটা চটপট করে ছিঁড়ল ফুলের পাপড়িগুলো, তারপর ঘোর রঙের ছোট্ট হাতখানা চড়ুইয়ের ডানার মতো তুলে লাল পাপড়িগুলো ছুঁড়ে দিলে সুরা পাত্রের মধ্যে।

চারজন লোক চমকে উঠে ধুলিধুসর মুখ তোলে রাগে। বাচ্চা মেয়েটা হাততালি দেয়, হাসে, ছোট্ট পা দুখানা ঠোকে মাটিতে। বিব্রত হয়ে মা ওর হাত চেপে ধরতে যায়, ধমক দিতে থাকে তীক্ষ্ম কণ্ঠে। হাসিতে গড়িয়ে পড়ে ছেলেটা আর বাটিতে গাঢ় রঙের মদের ওপর ফুলের পাপড়িগুলো ভাসতে থাকে ছোটো ছোটো গোলাপী কতকগুলো নৌকার মতো।

কোত্থেকে একটা গেলাস জোগাড় করে, ফুলসমেত মদ তুলে নিয়ে বুড়োটা কষ্টে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর ঠোঁটের কাছে গেলাসটা এনে আশ্বস্ত করার মতো গম্ভীর গলায় বলে:

'ঠিক আছে, সিনোরা, ঠিক আছে! শিশুর দান হল ভগবানের দান... আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি, সুন্দরী সিনোরা, আর তোরও স্বাস্থ্য, মেয়ে! মায়ের মতোই তুই সুন্দরী হয়ে ওঠ, সুখী হোস মায়ের দ্বিগুণ!'

* ও মা, ও মা, ও আমার মা...

বুড়োর পাকা মোচের শেষ প্রান্তটা ডুবে যায় গেলাসের মধ্যে। চোখ কুঁচকে ধীরে ধীরে সে চুমুক দিতে শুরু করে গাঢ় সুধায়, ঠোঁট চাটতে থাকে সশব্দে, আর কাঁপতে থাকে তার বাঁকা নাকখানা।

মা হেসে, নিচু হয়ে অভিবাদন করে চলে যায়, হাত ধরে নিয়ে যায় মেয়েটাকে। পেভমেণ্টের ওপর ছোট্ট পা দুখানা ঘষতে ঘষতে, এদিক ওদিক দুলতে দুলতে আধবোজা চোখে মেয়েটা গাইতে থাকে:

'ও, মা-আ...ও, মিয়া মা-আ...'

মজুরগুলো ক্লান্তিতে মুখ ফেরায়। একবার মদের দিকে আর একবার ছোটো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওরা হাসে, দক্ষিণাঞ্চলের উপভাষায় পরস্পর কি যেন বলাবলি করে তড়বড় করে।

আর বাটিতে গাঢ়-রক্তিম মদের ওপর দুলতে থাকে ফুলের গোলাপী পাপড়িগুলো।

গান গেয়ে ওঠে সমুদ্র, গুঞ্জন করে চলে শহর, আর রূপকথা রচনা করে উজ্জ্বল হয়ে থাকে সূর্য।

টাগেল

চিরন্তন তুষার-মৌলি উঁচু উঁচু পাহাড়ের ফ্রেমে বাঁধাই প্রশান্ত নীল হ্রদ। জমকালো ভাঁজে ভাঁজে কাননের ঘন লেস নেমে এসেছে জলের কিনারা পর্যন্ত। শাদা শাদা বাড়িগুলো মনে হয় বুঝি চিনি দিয়ে তৈরি, তাকিয়ে আছে জলের দিকে। চারদিকের সবকিছুই শিশুর শান্ত স্বপ্নের মতো।

সময়টা সকালবেলা। পাহাড় থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে সোহাগী। সবে সূর্য উঠেছে, গাছের পাতা আর ঘাসের ফলায় শিশির বিন্দু তখনো শুকোয় নি। পাহাড়ের স্তব্ধ খাদের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া একটা ধূসর ফিতের মতো রাস্তাটা। পাথর দিয়েই বাঁধানো, তবু মনে হয় রাস্তাটার গা বুঝি-বা মখমলের মতোই নরম। ইচ্ছে হয় হাত বুলিয়ে দেখি।

ইঁট পাথরের একটা স্তূপের পাশে বসে আছে একটি মজুর, ভোমরার মতো কালো তার গায়ের রঙ, মুখের ভাবে সাহস আর সহৃদয়তার ছাপ, বুকের ওপর একটি মেডেল।

পথচলতি একটা লোক দাঁড়িয়েছিল বাদামগাছের তলায়। ব্রোঞ্জরঙা হাতখানা হাঁটুর ওপর রেখে মজুরটা তার মুখের দিকে তাকায়।

বলে, 'এই মেডেলটা, সিনোর, পেয়েছি সিম্‌প্লন টানেলে কাজের জন্যে।'

বুকের ওপর চোখ নামিয়ে সুন্দর ধাতুখন্ডটার দিকে তাকিয়ে ও সস্নেহে মুচকি হাসে।

'ঠিকই, সব কাজই প্রথমটা কঠিন যতক্ষণ না সেটা ভালোবাসছি। তারপর কাজই তখন আর উদ্বেল করে তোলে মানুষকে, তখন আর তা কঠিন মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, আমাদের কাজটা ছিল সত্যিই কঠিন।'

অল্প একটু মাথা নাড়ে সে, হাসে সূর্যের দিকে চেয়ে; তারপর হঠাৎ তাজা হয়ে উঠে হাত নাড়ে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর কালো চোখদুটো।

'কখনো কখনো এমন কি ভয়ই লাগত বৈকি। মাটিরও কিছু বোধশক্তি থাকার কথা, তাই না? আমরা যখন পাহাড়ের গায়ে জখম করে কেটে একেবারে ভেতরে গিয়ে খুঁড়তে লাগলাম তখন সেখানে মাটি আমাদের নিলে কড়া মেজাজে! আমাদের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলত সে, তাতে বুক আড়ষ্ট হয়ে যেত আমাদের, মাথা ভার হয়ে উঠত, টন টন করত হাড়। আমাদের অনেকেরই হল ঐ এক দশা! তারপরে তো মাটি পাথর ফেলতে লাগল লোকেদের ওপর, গরম জল দিয়ে একেবারে ভিজিয়ে দিলে আমাদের। ওহ্‌, সে কি ভয়ানক! আগুনের আলো পড়লেই সে জল হয়ে উঠত রাঙা রাঙা। আর আমার বাপ বলত: 'মাটিকে জখম করেছি আমরা, মাটি এবার আমাদের সকলকে ডুবিয়ে ঝলসিয়ে মারবে তার রক্তের মধ্যে!' ওটা অবিশ্যি নিছক কল্পনা। কিন্তু মাটির একেবারে অনেক গভীরে দম আটকানো অন্ধকারের মধ্যে যেখানে বিছছিরি প্যাচ প্যাচ করছে জল, পাথরের ওপর দাঁত কড়মড় করছে লোহা, সেখানে এই রকম একটা কথা শুনলে ভুলে যেতে হয় ওটা কল্পনা। সেখানে

সবই ভারি অলৌকিক, সিনোর। মেঘ পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে পাহাড় আর আমরা মানুষ কত ছোটো। আর সেই পাহাড়ের গর্ভের মধ্যেই খুঁড়ে চলেছি আমরা... চোখে দেখলে বুঝতেন কী তার মানে! দেখতে হত এই আমরা, — এই ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষগুলোই পাহাড়ের গায়ে কিরকম একটা হাঁ-করা কালো খোঁদল খুঁড়ে ফেলেছিলাম, রোজ ভোরে সূর্যোদয়ে সেই খোঁদলের মধ্যে আমরা ঢুকছি, পৃথিবীর পেটের মধ্যে যারা সেঁধোচ্ছি, মনমরার মতো তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছে সূর্য; দেখতে হত আমাদের মেশিনগুলোকে, পাহাড়ের গোমড়া মুখটাকে, শুনতেন সেই কোন ভেতর ভাগে গম্‌গম্‌ শব্দ, আর এক পাগল্যার অট্টহাসির মতো বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি!'

লোকটা তার হাতদুটোকে খুঁটিয়ে দেখে একবার, নীল কুর্তার ওপর মেডেলের ফিতেটাকে ঠিক করে নেয়, তারপর অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে একটা।

সগর্বে সে বলে চলে, 'কেমন করে কাজ করতে হয় তা মানুষ জানে বটে! সত্যি সিনোর, মানুষ ছোটো প্রাণী বটে, কিন্তু কাজে নামলে সে এক দুর্দান্ত শক্তি! বিশ্বাস করুন সিনোর, এই ক্ষুদে মানুষটাই যা চায়, শেষ পর্যন্ত তা সবই করে। আমার বাপ কিন্তু প্রথমে তা কিছুতেই বিশ্বাস করে নি।

''পাহাড়ের দেয়াল দিয়ে ভগবান নিজে একটা দেশ থেকে আর একটা দেশ আলাদা করে দিয়েছেন' — আমার বাপ বলত; 'এ-দেশ থেকে ও-দেশ পর্যন্ত পাহাড় খুঁড়ে গেলে ভগবানের ইচ্ছা অমান্য করা হবে। দেখবে তোমরা, মাডোনা ছেড়ে চলে যাবেন আমাদের!' বাপের কথাটা ঠিক নয়। মাডোনাকে যারা ভালোবাসে মাডোনা থাকেন তাদের সঙ্গে। পরে কিন্তু এই আজ আমি যা আপনাকে বলছি, বাপও প্রায় সেই রকমই ভাবতে শুরু করেছিল।

কেননা পাহাড়ের চেয়েও আমরা বড়ো, পাহাড়ের চেয়েও যে আমরা বলবান এটা আমার বাপের ঠাহর হয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে পরবের সময় আমার বাপ এক বোতল মদ সামনে নিয়ে খাবার টেবিলে বসত, আর আমাকে আর অন্য সবাইকে উপদেশ দিয়ে বলত:

''ভগবানের ছেলেপিলেরা সব শোনো' — বাপ খুব ভালো মানুষ আর ধর্মভীরু লোক ছিল কি না, তাই এটা ছিল তার পেয়ারের বুলি। তা আমার বাপ বলত: 'ভগবানের ছেলেপিলেরা শোনো বাপু, মাটির সঙ্গে এভাবে লড়া অন্যায়। মাটির গায়ে যে জখম করেছি, মাটি তার শোধ তুলবে, হার মানানো যাবে না মাটিকে! দেখবে তোমরা: পাহাড়ের কলজের কাছ পর্যন্ত আমরা পৌঁছব খুঁড়তে খুঁড়তে, তারপর যেই কলজের ছোঁয়া লাগবে, অমনি আমাদের পুড়িয়ে মারবে, দাউ দাউ আগুন ছাড়বে আমাদের ওপর, কেননা সকলেই জানে মাটির কলজেটা হল আগুন! মাটির ওপর চাষ করা সে হল তার প্রসবে সাহায্য করা, সেটা মানুষের কাজ। কিন্তু আমরা তার মুখ, তার গড়ন বিকৃত করে চলেছি। দেখছ না, যতই পর্বতের মধ্যে গিয়ে খুঁড়ছি, ততই গরম হয়ে উঠছে বাতাস, ততই কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে...''

লোকটা আস্তে করে হাসল, দুহাত দিয়ে মোচটা পাকিয়ে নেয় একবার।

'আমার বাপ একাই যে এই সব ভাবত তা নয়। তাছাড়া ব্যাপারটাও তো সত্যি — যতই এগোই ততই গরম, ততই কষ্ট, ক্রমেই বেশি বেশি লোক অসুস্থ হয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। গরম জলের ঝোরা আসতে লাগল বেশি বেশি তোড়ে, চাঙ চাঙ মাটি পড়তে লাগল খসে আর আমাদের দলের লুগানো এলাকার দুটো লোক গেল পাগল হয়ে। রাত্রে ব্যারাকে কত লোকে ঘুমের ঘোরে ভুল বকত, গোঙাত, কী এক আতঙ্কে লাফিয়ে পড়ত বিছানা থেকে...

'বাপ বলত: 'দ্যাখ, ঠিক বলেছিলাম কি না?' বাপের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ। ওর কাশিটাও হচ্ছিল ঘন ঘন, বুক-ভাঙা। বলত: 'কী বলেছিলাম! পৃথিবীকে হার মানানো অসাধ্য কাজ।'

'শেষ কালে তো আমার বাপ সেই যে শয্যা নিল আর উঠল না। বেশ শক্ত জান ছিল আমার বাপের। তিন হপ্তারও বেশি দিন ধরে যমের সঙ্গে লড়াই করলে একরোখা, নালিশ করত না, নিজের তাকত যাদের জানা আছে তাদের মতো।

'একদিন রাত্রে আমায় বললে: 'আমার কাজ ফুরুল, পাওলো, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখিস, বাড়ি ফিরে যাস, মাডোনা তোর সঙ্গে থাকবেন!' তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইল আমার বাপ, চোখ বুঁজে শ্বাস নিতে লাগল টেনে টেনে।'

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পর্বতের দিকে তাকাল, তারপর এমন জোরে আড়িমুড়ি ভাঙল যে মট মট করে ওঠে তার দেহখানা।

'তারপর আমার বাপ আমার হাত ধরে কাছে টেনে এনে বললে — সত্যি বলছি সিনোর, ভগবানের দিব্যি! — বললে: 'জানিস, পাওলো বেটা আমার, আমার কিন্তু মনে হয়, ও হবেই হবে। এ দিকে আমরা আর পাহাড়ের অন্য দিক থেকে যারা খুঁড়ে আসছে, ওই পেটের মধ্যে আমরা মিলবোই, তাই না বেটা? কথাটা তুই বিশ্বাস করিস না?' করি বৈকি। 'বহুৎ আচ্ছা, বেটা! তাই দরকার: সবকিছুই করা উচিত তার ভালো ফল আর ভগবানে বিশ্বাস রেখে। মাডোনার প্রার্থনায় ভগবান ভালো কাজে সাহায্য করবেনই। আমি তোকে বলে যাই বাপু, যদি তাই হয়, যদি পর্বতের পেটের মধ্যে লোকগুলো এসে মেলে, তবে আমার কবরে এসে বলিস, হয়েছে বাবা! যেন জানতে পাই আমি!'

'ভালোই হল সিনোর, আমি কথা দিলাম। এর পাঁচ দিন পরে মারা গেল বাপ। মরার দুদিন আগে আমাকে আর অন্য সবাইকে বললে, টানেলের ভেতরে যেখানে সে কাজ করছিল সেই-খানটায় যেন

তাকে কবর দেওয়া হয়। খুবই মিনতি করেছিল। কিন্তু আমার মনে হয় ভুল বকছিল তখন...

'আমরা আর ওপাশ থেকে যারা আসছিল তারা একসঙ্গে পাহাড়ে মিললাম বাপ মারা যাবার তেরো হপ্তা পর। আহ্, সে একটা পাগলা দিন ছিল বটে সিনোর, সেই মাটির নিচে অন্ধকারে আমরা শুনছিলাম অন্য দলটার কাজের আওয়াজ! ছোটো ছোটো আমরা মানুষ, মাথার ওপরে মাটি — সে মাটির জগদ্দল চাপে এক লহমায় আমরা সকলেই পিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি! তবু সেই মাটির পেটের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে মিলতে আসছে যারা তাদের শব্দ!

'অনেকদিন ধরে ওই আওয়াজগুলো কানে আসত আমাদের, ফাঁপা ফাঁপা আওয়াজ, দিন দিন সে আওয়াজ বেড়ে উঠতে লাগল, বোধগম্য আর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল — আর জিতছি এই পাগল্য আনন্দে ক্ষেপে উঠলাম আমরা। দৈত্যির মতো, ভূতের মতো কাজ করে চললাম আমরা, না টের পেলাম হয়রানি, না দরকার হল তাগাদা দেবার। আহ্, সে যে কী সুন্দর, সত্যি সিনোর, যেন রোদের দিনে নাচ! ছেলেমানুষের মতো কেমন মিষ্টি আর দরদী হয়ে উঠলাম আমরা। আহ্, ওই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ছুঁচোর মতো মাসের পর মাস গর্ত করে চলার পর মানুষকে দেখার কী দারুণ অসহ্য ইচ্ছেই না আমাদের পেয়ে বসেছিল সিনোর, যদি দেখতেন!'

একেবারে লাল হয়ে ওঠে সে। শ্রোতার আরো কাছে এগিয়ে এসে নিজের গভীর, মানবিক চোখ মেলে তাকায় তার চোখে। তারপর মৃদু কণ্ঠে সানন্দে বলে যায়:

'তারপর শেষ কালে যখন মাঝখানের মাটির দেয়ালটা ভেঙে পড়ল আর সেই হাঁয়ের মধ্য দিয়ে দেখা গেল মশালের ঝক্‌ঝকে লাল আলো, তখন আমাদের চোখে পড়ল কার একটা কালো মুখ, আনন্দে তার চোখ বেয়ে জল পড়ছে। তার পেছনে আরো মশাল, আরো সব মুখ।

কানফাটা চিৎকার উঠল জয়ের, আনন্দের — আহ্, জীবনের সেই হল আমার সবচেয়ে সুখের দিন সিনোর, সে কথা মনে পড়লেই ভাবি জীবন আমার বৃথা যায় নি! একে বলে কাজ সিনোর, আমার কাজ, পবিত্র কাজ! তারপর যখন বাইরের আলোয় বেরিয়ে এলাম আমরা, অনেকেই মাটির ওপর উপুড় হয়ে চুমু খেতে লাগল মাটিকে, কাঁদতে লাগল! রূপকথার কাহিনীর মতো সবটাই ভারি ভালো। হ্যাঁ সিনোর, হেরে যাওয়া পাহাড়টাকে চুমু খেলাম আমরা, চুমু খেলাম মাটিকে; আর সেই দিন সিনোর, মাটি আমার আপন বলে মনে হয়েছিল, মেয়েমানুষকে লোকে যেমন ভালোবাসে সেদিন ভালোবেসেছিলাম মাটিকে!

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপের কবরে গিয়েছিলাম বৈকি! জানি, মরে গেলে মানুষ শুনতে পায় না, তবু গিয়েছিলাম, কেননা আমাদের জন্যে যারা মেহনত করল, আমাদের চেয়ে যারা কম সহ্য করে নি, তাদের ইচ্ছাকে মান্য করা তো উচিত, তাই না?

'হ্যাঁ, বাপের কবরে গিয়ে মাটিতে পা দাপিয়ে যা সে বলতে বলেছিল তাই বললাম। বললাম:

''হয়ে গেছে, বাবা! আমরা মানুষেরা জিতেছি। কাজটা হয়ে গেছে!''

শহর

অলপবয়সী এক স্বরকার কালো চোখে একদৃষ্টে সুদূরে তাকিয়ে কথা কইছিল নরম গলায়। বললে:

'আমি যে সঙ্গীত রচনা করতে চাই, তা এই রকম:

'বড়ো একটা শহরের দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা, তাতে হাঁটছে একটি ছেলে। ছেলেটার সামনে শহরটা পড়ে আছে যেন মাটি চেপে ধরা গুরুভার দালানবাড়ির এক স্তূপ। গোঙাচ্ছে, গজ গজ করছে চাপা গলায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র তা পুড়ে গেছে আগুনে, তার ওপরে সূর্যাস্তের রক্তাক্ত অগ্নিশিখা তখনো নিবে যায় নি। গির্জার ক্রুশ, গম্বুজের চুড়ো, আর হাওয়া-মোরগটা থেকে আভা বেরুচ্ছে আগুনের মতো।

'কালো কালো মেঘের পাড়গুলোতেও যেন আগুন ধরেছে। আকাশের লাল লাল ছোপের ওপর বড়ো বড়ো দালানকোঠার কোনাকোনাচগুলো ফুটে উঠেছে তীক্ষ্ম হয়ে, এখানে ওখানে জানলার শার্সি দগ্ দগ্ করছে ঘায়ের মতো। সুখের জন্য ক্ষান্তিহীন লড়াইয়ের এই জায়গাটা, যন্ত্রণাহত শহরটা থেকে রক্ত চোয়াচ্ছে। হলুদরঙা দম আটকানো ধোঁয়া উঠছে তার বুক থেকে।

'গোধূলির আলোয় ছেলেটা হাঁটছে প্রশস্ত ধূসর রাস্তার কিনারা দিয়ে। রাস্তাটা যেন কোন এক পরাক্রান্ত অদৃশ্য হাতে ধরা একটা তলোয়ার, অভ্রান্ত লক্ষ্যে সোজা গিয়ে বিঁধছে শহরটার পাঁজরার মধ্যে। পথের দুধারে গাছগুলো যেন একসার অপ্রজ্বলিত মশাল, তাদের বড়ো বড়ো কালো কালো ঝাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে বাক্যহীনা, কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষমাণ মাটির ওপর।

'আকাশ মেঘে ঢাকা, তারা দেখা যায় না, ছায়াও পড়ছে না কোথাও। সন্ধ্যাটা বিষণ্ণ, নীরব। স্তব্ধতায় অবসন্ন ঈষদন্ধকার নিদ্রাতুর প্রান্তরে অস্পষ্ট শোনা যায় শুধু ছেলেটার ধীর লঘু পদধ্বনি।

'ছেলেটার পেছনে পেছনে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে রাত, যে সুদূর থেকে তার যাত্রা, বিস্মৃতির কালো আবরণে তাকে ঢেকে দিয়ে।

'টিলার ওপর অনাথের মতো পড়ে থাকা শাদা-শাদা লাল-লাল বাড়িগুলো বশীভূতের মতো চেপে ধরেছে মাটি, প্রদোষ ঘন হয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে লুকিয়ে ফেলছে তাদের। বাগানগুলো, গাছগুলো, চিমনিগুলো — চারপাশের সবকিছু রাত্রির তমসায় পিষ্ট হয়ে কালো হয়ে উঠছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যেন লাঠি হাতে ছোট্ট মূর্তিটা দেখে ভয় পেয়েছে, লুকিয়ে পড়ছে তার কাছ থেকে, অথবা খেলা জুড়েছে তার সঙ্গে।

'চুপ করে হেঁটে চলেছে ছেলেটা, পদক্ষেপ না বাড়িয়ে শান্তভাবে দেখছে শহরটাকে। যেন দীর্ঘদিন ধরে একান্ত প্রয়োজনীয় যে কিছু একটার জন্য শহর প্রতীক্ষা করে আছে — তাই বহন করে আনছে ছেলেটা, তার অভ্যর্থনায় উদ্বেগে জ্বলে উঠছে শহরের নীল আর লাল আর হলদে আলোগুলো।

'ডুবে গেছে সূর্য। ক্রশ, বুরুজের লৌহ-চূড়া আর হাওয়া-মোরগ গলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শহরটাকে এখন মনে হচ্ছে নিচু, ছোটো, মূক মাটির সঙ্গে যেন নিবিড় করে বাঁধা।

'শহরের মাথার ওপর ফুটে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে একটা উপলমণি মেঘ। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করা ধূসর দালানকোঠাগুলোর ওপরে একটা হরিদ্রাভ ঝিকিমিকি কুয়াশা। রক্তে প্লাবিত, আগুনে বিধ্বস্ত বলে এখন আর মনে হচ্ছে না শহরটাকে। ছাত আর দেয়ালগুলোর অসমান রেখা এখন কেমন যেন ঐন্দ্রজালিক — কিন্তু অসম্পূর্ণ অসমাপ্ত আভাস। মনে হয় বুঝি মানুষের জন্য এই বিরাট নগরটাকে যে গড়ছিল সে যেন হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা বুঝি-বা যেটুকু গড়া হল তা দেখে হতাশ হয়ে সব ফেলে রেখে উধাও হয়ে গেছে, বিশ্বাস হারিয়ে মরেছে।

'কিন্তু বেঁচে আছে শহরটা। বুকে তার অসহ্য বাসনা, নিজেকে সে দেখবে সুন্দর। সগর্বে মাথা তুলবে সূর্যের দিকে। সুখের বহুতরো আকাঙ্ক্ষায় প্রলাপের ঘোরে গাঙিয়ে চলেছে শহরটা, জীবনের উদগ্র কামনায় সে উদ্বেল। আর শহর ঘিরে প্রান্তরের অন্ধকার নীরবতার মধ্যে বয়ে চলেছে শব্দ চাপা দেওয়া শান্ত স্রোত, আর আকাশের কালো পেয়ালা ক্রমে ক্রমে ভরে ওঠে এক ঘোলাটে বিধুর আলোয়।

'ছেলেটা থামে, মাথা তোলে, উঁচু করে তুললে ভুরু, তারপর শান্ত সাহসী দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে দুলে দুলে পা চালায় জোরে। আর তার পেছু পেছু রাত মায়ের মতো স্নেহকোমল শান্ত গলায় বলে:

''সময় হয়ে এল রে, যা, যা! ওরা অপেক্ষা করে আছে তোর জন্যে...''

...মুখে একটা চিন্তামগ্ন হাসি এনে তরুণ সুরকার বললে, 'কিন্তু এটাকে সুরে বাঁধা অবশ্যই অসম্ভব।'

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাত জোড় করে কেমন একটা উদ্বেগ আর ভালোবাসায় মৃদুস্বরে বলে উঠল:

'অপাপবিদ্ধ মেরী মাতা! শহরে গিয়ে কী পাবে ছেলেটা?'

দুপুর

দুপুরের নীল আকাশে সূর্য গলে পড়ছে, সমুদ্র আর মাটির ওপর নেমে আসে নানা রঙের আতপ্ত কিরণ। তন্দ্রালু সমুদ্র থেকে শ্বসিত হয় উপলমণি এক কুয়াশা, ইস্পাতের মতো ঝক ঝক করে নীলাভ জল, আর সামুদ্রিক লবণের কড়া গন্ধ ভেসে আসে তীরের দিকে।

ধূসর পাথরগুলোর ওপর ঝঙ্কার তুলে তরঙ্গ ছলকিয়ে পড়ে আলস্যে, তারপর তাদের পাঁজড়ার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে ফিরে আসে মর্মরিত নুড়িগুলোর বুকে। এ তরঙ্গের চুড়ো উত্তাল বা ফেনিল নয়, কাঁচের মতো স্বচ্ছ।

পাহাড়কে জড়িয়ে আছে গুমোটের বেগুনি-লাল ভাপ। অলিভ গাছের ধূসর পাতাগুলোকে রোদ্দুরে মনে হয় পুরনো রুপোর মতো। পাহাড়ের গা বেয়ে নামা সিঁড়ি-সিঁড়ি বাগিচার গাঢ় সবুজ মখমলের ওপর কমলা আর লেবু গাছের সোনালী আভা লেগেছে, টুকটুকে হাসিতে হাসছে লাল লাল ডালিম ফুলগুলো। ফুল শুধু ফুল চারিদিকে।

সূর্য সত্যিই ভালোবাসে এই পৃথিবীটাকে...

পাথুরে তটভূমির ওপর দুজন জেলে। একজন বুড়ো, মাথায় স্ট্র হ্যাট, মুখখানা পুরুষ্টু, গালে ঠোঁটে আর থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি, চোখদুটো চর্বিতে ভাসমান, নাকটা লালচে, আর হাতগুলো রোদে পুড়ে ব্রোঞ্জরঙা। লকলকে ছিপখানাকে অনেকটা দূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে ও বসেছে একটা পাথরের ওপর, সবুজ জলের ওপর লোমশ পাদুটো ঝুলিয়ে। ঢেউগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে তা ছুঁয়ে যায়, আর পায়ের গাঢ় রঙের আঙুল থেকে টপ টপ করে উজ্জ্বল ভারি জলের ফোঁটা ঝরে পড়ে সমুদ্রে।

বুড়ো লোকটার পেছনে, একটা পাথরের ওপর কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা জোয়ান ছেলে, ময়লা গায়ের রঙ, চোখদুটো কালো, সুঠাম একহারা চেহারা, মাথায় একটা লাল টুপি। টান করা বুকখানার ওপর দিয়ে নেমে এসেছে একটা শাদা জার্সি। নীল পাজামাদুটো হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। ডান হাতের আঙুলে মোচ খুঁটতে খুঁটতে চিন্তিত মুখে সে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের সুদূরে। সেখানে কালো ডোরার মতো মাছ ধরা নৌকাগুলো জলের ওপর দুলছে, আর তাদের অনেক পেছনে আবছা চোখে পড়ে একটা গতিহীন শাদা পাল মেঘের মতো গলে যাচ্ছে রোদ্দুরে।

বিফল একটা ঘাই মেরে বুড়ো লোকটা জিগ্যেস করে ভাঙা-ভাঙা গলায়, 'মহিলাটি কি বড়োলোক?'

ছোকরা আস্তে করে জবাব দেয়:

'তাই মনে হয়! কী একখান মস্ত নীল পাথর বসানো ব্রোচ্, কানে মাকড়ি, তাছাড়া অনেকগুলো আংটি, ঘড়ি... মনে হয় আমেরিকান...'

'দেখতে সুন্দর?'

'সুন্দর বৈকি! একটু রোগা বটে, কিন্তু চোখদুটো ফুলের মতো; ছোট্টো হাঁ-করা একটু মুখ...'

'ঐ রকম মুখ হয় সতীমেয়েদের, জীবনে যারা একবার ভালোবাসলে ভালোবাসে সারা জীবন।'

'আমারও তাই মনে হয়...'

বুড়ো লোকটা ছিপে ঘাই মেরে শূন্য বড়শিটার দিকে চোখ কুঁচকে তাকায়, তারপর বাঁকা হেসে গজ গজ করে:

'না, মাছগুলো আমাদের চেয়ে বোকা নয়...'

উবু হয়ে বসে ছোকরা বলে, 'ভর দুপুরে কে আবার আসে মাছ ধরতে?'

'আমি আসি' — জবাব দেয় বুড়োটা, তারপর বড়শিতে টোপ গেঁথে অনেকটা দূরে দিয়ে ছিপ ফেলে। জিগ্যেস করে:

'সকাল পর্যন্ত নৌকো বেয়েছিলি, বলছিস?'

'হ্যাঁ, আমরা যখন তীরে এলাম তখন সূর্য উঠে গেছে' — ছোকরা বলে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে।

'কুড়ি লিরা?'

'হ্যাঁ।'

'আরো বেশি দিতে পারত মহিলাটি।'

'অনেক কিছুই দিতে পারত...'

'তোদের আলাপ হল কি নিয়ে?'

ছোকরা মাথা নোয়ায় বিষণ্ণভাবে।

'গোটা দশেক ইতালিয়ান শব্দ ছাড়া ও কিছুই জানত না। তাই কথা না কয়েই কাটাতে হল...'

বুড়ো লোকটা ওর দিকে চেয়ে দরাজভাবে হাসে শাদা শাদা দাঁতগুলো অনাবৃত করে। বলে, 'সাচ্চা ভালোবাসা বুকে এসে বেঁধে একেবারে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো। আর বিদ্যুতের মতোই তা বোবা, তা তো জানিস?'

একটা বড়োমতো পাথর তুলে নিয়ে ছোকরা সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে

মারতে গিয়ে কী ভেবে কাঁধের ওপর দিয়ে ফেলে দেয় পেছনে। বলে:

'মাঝে মাঝে অবাক লাগে, দুনিয়ায় এতোগুলো ভাষার দরকার কি?'

বুড়োটা একটু ভেবে বলে, 'লোকে বলে, একদিন এসব বদলে যাবে।'

সমুদ্রের দূর নীলাঞ্চলের শাদাটে কুজ্‌ঝটির মধ্যে নিঃশব্দে ভেসে যায় একটা শাদা স্টিমার। মনে হয় যেন মেঘেরই একটা ছায়া।

সেই দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বুড়োটা বলে, 'সিসিলি চলল।'

কোথা থেকে একটা লম্বা অসমান কালো চুরুট বার করে বুড়োটা। চুরুটটা ভেঙে দুখানা করে একটা টুকরো ঘাড়ের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দেয় ছোকরাটার দিকে। জিগ্যেস করলে:

'মহিলাটির সঙ্গে নৌকোয় বসে কী ভাবছিলি তুই?'

'মানুষ চিরকাল সুখের কথাই তো ভাবে...'

'সেই জন্যেই তো মানুষ চিরকালই বোকা রয়ে গেল' — বুড়োটা মন্তব্য করে শান্ত গলায়।

চুরুট ধরায় ওরা। নীলাভ ধোঁয়ার স্রোত পাথরের ওপর দিয়ে ভেসে যায় নিশ্চল বাতাসে। সে বাতাসে সুফলা মাটি আর সোহাগী জলের বুকভরা গন্ধ।

'আমি গান গেয়ে শুনিয়েছিলাম। আমার দিকে চেয়ে ও হেসেছিল...'

'আর তারপর?'

'মানে, তুমি তো জানো, তেমন কিছু আমি গাইতে পারি না।'

'তা ঠিক।'

'আমি তাই দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম।'

'সত্যি?'

'ওর দিকে চেয়ে ছিলাম আর মনে হচ্ছিল: 'এই তো আমি রয়েছি, শক্তসমর্থ জোয়ান, আর তোমার একঘেয়ে লাগছে জীবনে। তাহলে এসো না, আমাকে ভালোবাসো, ভালোভাবে বাঁচতে দাও আমায়!..'

'ওর একঘেয়ে লাগছে জীবনে?'

'নইলে, মনে সুখ থাকলে কি আর কেউ এমন পরের দেশে যেতে চায় গরিব ছাড়া?'

'বাহবা!'

'মনে মনে ভাবছিলাম: 'মেরী মাতার দিব্যি দিয়ে বলছি' — ভাবছিলাম: 'আমি তোমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করব, আমাদের চারপাশের লোকেরাও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে...''

'সাবাস!' চিৎকার করে বলে বুড়োটা তার মস্তো মাথাখানা পেছনে হেলিয়ে হাসতে থাকে দরাজ খাদে।

'ভাবছিলাম: 'চিরকাল আমি তোমার কাছে খাঁটি হয়ে থাকব...''

'হুম্...'

'কিংবা ভাবছিলাম: 'তা নইলে এসো আমরা একসঙ্গে কিছু দিন থাকি। যত চাও তত ভালোবাসব তোমাকে, তারপর তুমি আমাকে কিছু টাকা দিয়ো একটা নৌকো, জাল, আর কিছু জমি কেনার মতো। দেশে ফিরে সারা জীবন তোমাকে মনে রাখব, কৃতজ্ঞতা জানাব...''

'সেটা মন্দ নয়...'

'তারপর সকালের দিকে মনে হচ্ছিল, বোধ হয় ওসব কিছু আমার চাই না। টাকা চাই না, অন্তত এই রাতটার জন্যে ওকেই চাই...'

'সেটা অনেক সহজ...'

'শুধু একটা রাতের জন্যে!..'

বুড়োটা বলে, 'সাবাস!'

'আমার মনে হয় কি জানো, পেত্রো খুড়ো, অল্প সুখই চিরকাল খাঁটি সুখ...'

বুড়োটা কিছু বলে না। মোটা ঠোঁটদুটো চেপে তাকিয়ে থাকে সবুজ জলের দিকে। আর মৃদু করুণ গলায় গাইতে শুরু করে ছোকরা:

'ওগো সূর্য, ওগো সূর্য মোর...'

হঠাৎ মাথা নেড়ে বলে বুড়োটা, 'তা ঠিক, অল্প সুখই খাঁটি সুখ, কিন্তু আরো বেশি সুখ আরো ভালো... গরিব লোকের চেহারা সুন্দর, কিন্তু বড়ো লোকদের ক্ষমতা বেশি... সবেতেই এই!'

মর্মর তুলে ছলকে পড়ছে তরঙ্গ। লোকদুটোর মাথা ঘিরে জ্যোতির মতো হয়ে আছে নীল ধোঁয়ার রেশ। ছোকরা গুন গুন করে গাইতে গাইতে ওঠে দাঁড়ায়, ঠোঁটের কোণে চুরুটটা। ধূসর একটা পাথরের গায়ে কাঁধ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি জড়ো করে ও তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। বড়ো বড়ো দুচোখে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি।

বুড়ো লোকটা বসে থাকে নিঝুম হয়ে, মাথাটা নুইয়ে। হয়ত ঢোলে।

পাহাড়ের লাইলাক ছায়াগুলো হয়ে ওঠে যেন আরো ঘন, আরো মিষ্টি।

ছোকরা গাইতে থাকে, 'ওগো সূর্য মোর!'

তোমার চেয়ে অনেক বেশি গো,
অনেক বেশি রূপ,
অনেক বেশি রূপ ধরে সূর্য!
ওগো সূর্য, ওগো সূর্য মোর!
বুকে আমার কিরণ ঢেলে যেয়ো!..

হাসিখুশি সবুজ ঢেউগুলোর ঝঙ্কার বাজতে থাকে সমানে।

শুভ বিবাহ

রোম আর জেনোয়ার মাঝখানে একটা ছোট্ট স্টেশনে আমাদের কামরার দরজা খুলে কন্ডাক্টর একজন তেলকালিমাখা 'অয়লার'-এর সাহায্যে প্রায় ধরাধরি করে নিয়ে এল একটা বুড়োকে। বুড়োটার একটা চোখ কানা।

'ভয়ানক বুড়ো!' ওরা বললে একসঙ্গে, ভালোমানুষের মতো হেসে।

কিন্তু দেখা গেল বুড়ো লোকটা বেশ চাঙ্গা। কোঁচকানো হাতখানা নেড়ে বুড়ো তার সাহায্যকারীদের ধন্যবাদ দিলে, তারপর পাকা মাথাটা থেকে দলামোচড়া টুপিটা একটু তুললে ভদ্রতা দেখিয়ে, ফুর্তিতে। তীক্ষ্ম নজর করে বেঞ্চগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে:

'বসতে পারি?'

যাত্রীরা সরে জায়গা করে দিল। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বুড়ো বসল, হাত দুখানা রাখলে হাড্ডিসার হাঁটুর ওপর, আর দন্তহীন মুখে হাসলে সহৃদয় হাসি।

আমার সঙ্গী জিগ্যেস করলে, 'অনেক দূর যাবেন নাকি, দাদু?'

সাগ্রহেই জবাব দিলে কানা, 'না, না, এখান থেকে কেবল তিন স্টেশন। যাচ্ছি আমার নাতির বিয়েতে...'

মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই বুড়োটা সোৎসাহে শোনাতে শুরু করলে তার কাহিনী। সে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গত করে চলল ট্রেনের চাকার শব্দ। আর গল্পের তালে তালে বুড়োটা দুলতে লাগল বাদলা দিনে ঝড়ে ভাঙা ডালের মতো।

বললে, 'আমি হলাম লিগুরিয়ান। আমরা লিগুরিয়ানরা ভারি শক্ত জাত। আমাকেই ধরো না কেন, আমার তেরোটি ছেলে, চারটি মেয়ে, আর নাতিনাতনী যে কতো তা আমিই জানি না। নাতিদের একটির বিয়ে হয়ে গেছে, এবার এটির হতে চলেছে। মন্দ নয় ব্যাপারটা, কি বলো?'

নিষ্প্রভ কিন্তু প্রফুল্ল ওই একখানা চোখ দিয়েই আমাদের সকলের মুখের দিকে সগর্বে তাকাতে তাকাতে বুড়ো মৃদু হাসল। বললে:

'দ্যাখো, আমাদের রাজা আর দেশের জন্যে কতগুলি লোক দিয়েছি আমি!

'চোখ নষ্ট হল কি করে? ও, সে গেছে অনেকদিন আগে। আমি তখন বাচ্চা, তখনই কিন্তু বাপের সঙ্গে কাজে লাগতে শুরু করেছি। আঙুর-ক্ষেতের মাটি খুঁড়ছিল বাপ — আমাদের ওদিকের জমি ভারি শক্ত আর পাথুরে, ভারি তোয়াজ করতে হয় — তা মাটি খোঁড়ার সময় বাপের গাঁইতি থেকে একটা পাথর ছুটে এসে সোজা লাগল আমার চোখে। তখন তেমন ব্যথা লাগল বলে মনে হয় নি। কিন্তু সেই দিন যখন দুপুরের খাওয়া খাচ্ছি, তখন আমার চোখটা খসে এল। সে ভারি ভয়ানক ব্যাপার, সিনোর!.. সবাই মিলে তো আমার চোখটাকে ফের বসিয়ে গরম রুটির পুলটিশ লাগিয়ে দিলে, কিন্তু কিসের কি, চোখ গেল!'

শিথিল হলদেটে গালটা সজোরে ঘষে নিয়ে আবার সেই ভালোমানুষী ফুর্তির হাসি হাসলে বুড়োটা।

'এখনকার মতো সেকালে তো অতো ডাক্তার ছিল না, লোকে

বৃদ্ধের মতো জীবন কাটাত। হ্যাঁ, বৃদ্ধের মতো ঠিকই, তবু হয়ত লোকের প্রাণে দয়ামায়া তখন একটু বেশি ছিল, কি বলো?'

গভীর ভাঁজ পড়া, চামড়া-ঝোলা একচক্ষু মুখখানা তার ছাতা পড়ার মতো সবুজ-ধূসর দাড়িতে ভরা। এই মুহূর্তে সে মুখটার ওপর কেমন একটা সেয়ানা সেয়ানা ভাব ফুটে উঠল যেন সে জিতেছে।

'আমি যত দিন বাঁচলাম, তত দিন বাঁচার পর মানুষ-জন সম্পর্কে সোজাসুজি কথা বলার একটা হক আসে, তাই না?'

যেন কাউকে ধমক দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে সে একটা গাঢ় রঙের বাঁকা আঙুল তুললে গম্ভীরভাবে।

'মানুষ-জন সম্পর্কে দুটো কথা শোনাই, সিনোর...

'আমি যখন তেরো, তখন বাপ মারা গেল, আর দেখছেন তো আমি এখনও কেমন ছোটোখাটো? কিন্তু চটপটে ছোকরা ছিলাম আমি, আর কাজে লাগলে থামতে জানতাম না। বাপ আমাকে এই সম্পত্তিটুকুই শুধু দিয়ে গিয়েছিল, আমাদের বাড়িখানা আর জমিটুকু বিকিয়ে গিয়েছিল দেনার দায়ে। তা এই ভাবেই তো আমি দিন কাটাতে লাগলাম, সম্বল একটি চোখ আর দুটি হাত, যেখানেই কাজ জোটে সেখানে গিয়েই খাটি... কষ্ট বটে কিন্তু জোয়ান বয়স কি আর কষ্ট দেখে ডরায়, নাকি বলো?

'আমার বয়স যখন উনিশ, তখন দেখা হল সেই মেয়েটির সঙ্গে, যাকে ভালোবাসা আমার প্রজাপতির নির্বন্ধ। আমার মতোই মেয়েটা ছিল গরিব, দেখতে পুরুষ্টু, গায়ে আমার চেয়ে বেশি জোর। থাকত তার অসুস্থ বুড়ি মায়ের সঙ্গে, আমার মতোই যে কাজ জুটত, করত। দেখতে তেমন সুন্দরী ছিল না, কিন্তু মনে দয়ামায়া ছিল, আর ছিল খাসা বুদ্ধি। গলাখানাও ছিল বেশ মিষ্টি! আহ্, গান যা গাইত, একেবারে পেশাদার গাইয়ের মতো। সেই তো এক ঐশ্বয্যি! আমি নিজেও খারাপ গাইতাম না!

'ওকে একদিন জিগ্যেস করলাম, 'বিয়ে করব না আমরা?'

'দুঃখ করে ও বললে: 'বিয়ে করাটা বোকামি হবে রে একচোখো, তোরও কিছু নেই, আমারও কিছু নেই। খাব কি?'

'কথাটা একেবারে ন্যায্য কথা। আমাদের কারো কিছু ছিল না। কিন্তু পীরিত হলে জোয়ান মেয়ে মরদের আর চাই কি? জানেন তো, পীরিতের কাছে অন্য চাহিদা কত কম। আমি জেদাজেদি করলাম, করে জিতলাম।

'শেষকালে আমার ইদা সায় দিলে: 'তা তোর কথাই হয়ত ঠিক। আমরা আলাদা আলাদা আছি তাতে যদি মেরী মাতা আমাদের সাহায্য করতে পারেন, তাহলে একসঙ্গে থাকলে তো তাঁর পক্ষে সাহায্য করা আরো সোজা!'

'তাই আমরা তো গেলাম পাদ্রীর কাছে।

'পাদ্রী বললেন: 'পাগল হয়েছিস! এমনিতেই লিগুরিয়ায় দেখেছিস কতো কাঙাল? দুঃখী লোক তোরা, তোরা শয়তানের ভোলানি জয় কর। নইলে এ দুর্বলতার জন্যে পরে ভয়ানক খেসারত দিতে হবে!'

'সমাজের ছোকরারা আমাদের ঠাট্টা করতে লাগল, বুড়োরা নিন্দে করলে। কিন্তু যৌবন হল গে গোঁয়ার, তবে যা বোঝে তা বুদ্ধি দিয়েই বোঝে! বিয়ের দিন এসে গেল, আগে যা ছিলাম তখনো আমরা তেমনি গরিব। বাসর রাতটুকু যে কোথায় কাটাবো, তারও কিছু ঠিক নেই।

'ইদা বললে: 'চলো যাই মাঠে। খারাপ কী আছে তাতে? লোকে যেখানেই থাকুক না কেন, ঈশ্বরী মায়ের কৃপা থাকবে একই রকম।'

'আমরা তো তাই ঠিক করলাম, বেশ মাটিই হোক আমাদের বিছানা, আর আকাশ হোক আমাদের চাদর!

'তারপরে সে আর এক কাহিনী, সিনোর। মন দিয়ে শুনুন একটু, কেননা এই হল আমার এতখানি জীবনের সেরা কাহিনী! বিয়ের

ঠিক আগের দিন ভোরবেলা। বুড়ো জিয়োভান্নির ঘরে আমি ঢের দিন মুনিষ খেটেছিলাম। ভোরবেলা জিয়োভান্নি এসে এই এমনি বললে যেন ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়:

''তুই, উগো, ভেড়ার ঐ পুরোনো গোয়ালটা পরিষ্কার করে নিতে পারিস, কিছু খড় পেতে নে। জায়গাটা শুকনোই আছে, বছর খানেক ধরে ওখানে আর ভেড়া রাখা হয় না; তাহলেও তুই আর ইদা যদি ওখানে থাকতে চাস, তাহলে ভালো করে গোয়াল পরিষ্কার করে নিতে হবে কিন্তু।'

'তা সেই হল আমাদের ঘর!

'গান গেয়ে কাজ করতে করতে দেখি ছুতোর মিস্ত্রি কনস্তানজিয়ো দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। জিগ্যেস করলে:

''তুই আর ইদা তাহলে এখানেই ডেরা বাঁধছিস? কিন্তু খাট কই তোদের? আমার বাড়িতে বাড়তি একখান আছে। ঘর সাফ হয়ে গেলে এসে নিয়ে যাস।'

'কনস্তানজিয়োর কাছে যাচ্ছি এমন সময় বদরাগী দোকানী মেয়ে মারিয়া গাল পাড়তে লাগল:

''বিয়ে করছে দেখো হতভাগারা, অথচ নিজের বলতে না আছে একখান বালিশ, না আছে একটা চাদর! মাথা খারাপ হয়েছে একচোখোটার, তোর কনেকে পাঠিয়ে দিবি আমার কাছে...'

'ওদিক থেকে খোঁড়া এক্তোরে ভিয়ানো, বাতে আর অসুখে সারা জীবন ধরে ভুগে আসছে, সেই ভিয়ানো তার বাড়ির দরজা থেকে দোকানীকে চেঁচিয়ে বললে:

''নেমন্তন্যের জন্যে কতো মদ জোগাড় করে রেখেছে সেই কথাটা একবার জিগ্যেস করে দেখো ওকে! আচ্ছা, বেহিসেবী লোক বটে বাপু!''

বুড়ো মানুষটার গালের গভীর একটা খাঁজের ওপর চিক চিক

করে উঠল এক ফোঁটা আনন্দাশ্রু। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে নিঃশব্দে হাসলে বুড়ো, হাড়-খোঁচা কণ্ঠটা উঠানামা করতে লাগল, কাঁপতে থাকল শিথিল চামড়াগুলো। শিশুর মতো হাত নাড়তে লাগল সে।

হাসিতে দম আটকে যায় তার: 'ও সিনোর, সিনোর! কী বলব, বিয়ের দিন সকালে ঘরে যা যা দরকার সব এসে গেল — ম্যাডোনার একটা ছোটো মূর্তি, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, আসবাব, দিব্যি দিয়ে বলছি, সবকিছু! ইদা যত হাসে তত কাঁদে। আমিও তাই। অন্য সবাই অবশ্য শুধুই হাসল, কেননা বিয়ের দিন কাঁদতে নেই — আর আমাদের যত আপন জন সব ঠাট্টা করতে লাগল আমাদের!

'সত্যি সিনোর, কাউকে আপন জন বলে ডাকতে পারা যে কী দারুণ সুন্দর! নিজের এমন আত্মীয় কুটুম্ব বলে ভাবতে পারলে তো আরো ভালো, যাদের কাছে আমার জীবনটা তামাসার ব্যাপার নয়, আমার সুখটা জুয়া খেলা নয়!

'আর সে কী একখান বিয়ে, আহ্! আশ্চর্য এক দিন! গাঁয়ের গোটা সমাজ এল অনুষ্ঠানে, সকলেই এল আমাদের সেই ভেড়ার গোয়ালে, হঠাৎ সেটা হয়ে উঠেছে একেবারে অট্টালিকা... সবকিছু ছিল আমাদের! মদ আর ফল, মাংস আর রুটি, সকলেই খেতে লাগল, সকলেই হাসিখুশি... তার কারণ সিনোর, লোকের উপকার করার চেয়ে বড়ো সুখ আর কিছু নেই, বিশ্বাস করুন আমায়, তার চেয়ে আনন্দের, তার চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না!

'পাদ্রীও এসেছিলেন। ভারি সুন্দর আর কড়া গোছের একখানা ভাষণ দিয়েছিলেন তিনি। বললেন: 'এই দুটিতে আপনাদের সকলের বাড়িতে কাজকর্ম করেছে, আপনারাও তাদের জন্যে ভাবলে এই দিনটা, ওদের জীবনের সেরা দিনটাকে সহজ করে তোলার জন্যে যথাসাধ্য করলেন। এইটেই আপনাদের উচিত, কেননা ওরা আপনাদের জন্যে খেটেছে আর খাটুনির দাম তামার পয়সা কি রুপোর টাকার চেয়েও

বেশি, খাটুনির জন্যে যে মজুরি পাওয়া যায়, খাটুনি তার চেয়েও অনেক দামী! টাকা চলে যায়, কিন্তু থেকে যায় কাজ... এই দুটি মানুষ হাসিখুশি, বিনয়ী। ওদের জীবন কষ্টে কেটেছে কিন্তু তার জন্যে ওরা নালিশ করে নি, ওদের জীবনে আরো কষ্ট আসবে কিন্তু তার জন্যে ওরা ককাবে না। ওরা মুশকিলে পড়লে আপনারা সাহায্য করবেন। ওদের কাজের হাত ভালো, দিল দুখানা আরো ভালো...'

'আমাকে আর ইদাকে আর গোটা সমাজকে তারিফ করে আরো অনেক কথা বলে গেলেন পাদ্রী।'

বুড়োর এক চোখের দৃষ্টি আবার যেন তরুণ হয়ে উঠেছে। সেই চোখে আমাদের সকলকে সগর্বে একবার নজর করে দেখে বললে:

'এই হল গে সিনোর, লোক সম্পর্কে কিছু কথা। ভারি মনে ধরে, তাই না?'

রাজনৈতিক কর্মী

বসন্তকাল। জ্বলজ্বলে সূর্য। সকলেই হাসিখুশি। পুরনো পুরনো পাথুরে বাড়িগুলোয় জানলার সার্শি পর্যন্ত যেন হাসছে বলে মনে হয়।

ছোট্ট শহরখানার রাস্তা জুড়ে আসছে এক রঙচঙে জনস্রোত — পরনে তাদের পরব-দিনের পোশাক। সারা শহর এসে জুটেছে এখানে — শ্রমিক, সৈনিক, বুর্জোয়া, পুরোহিত, সরকারী অফিসার, জেলে — সকলেই, বসন্তের সুরায় সকলেই একটু চাঙ্গা, কথা বলছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, প্রচুর হাসছে, গান গাইছে, আর সকলেই যেন একটা সুস্থ দেহের মতো জীবনের আনন্দে ভরপুর।

মেয়েদের রঙবেরঙের টুপি আর ছাতা, আর ছেলেদের হাতে হাতে লাল নীল বেলুনগুলো — সবই মনে হয় অদ্ভুত কী এক ফুলের মতো। রূপকথার কোন রাজার জমকালো পোশাকের ওপর গাঁথা দামী দামী মণিমুক্তোর মতো সর্বত্রই ঝলমলিয়ে উঠছে উল্লসিত হাস্যময় সেই শিশুরা — যারা এ পৃথিবীর দিলখুশ রাজা।

গাছের কচি সবুজ পাতা এখনো ফোটে নি, গুটিয়ে আছে তা

সরস কোরকে, সূর্যের উষ্ণ কিরণ তারা পান করছে লোভীর মতো। দূরে কোথায় বাজনা বাজছে, হাতছানি দিচ্ছে সেদিকে।

মনে হয় যেন মানুষ দুঃখকষ্ট বুঝি-বা পেরিয়ে এসেছে, যেন গতকালই ছিল মানুষের বিতৃষ্ণা জাগানো দুঃসহ জীবনের শেষ দিন, তারপর আজকে সকলেই জেগে উঠেছে শিশুর মতো এক স্বচ্ছ মনে, প্রসন্ন আত্মবিশ্বাসে, নিজের যে সংকল্পের কাছে সবকিছুকে নত হতে হবে তাতে আস্থা রেখে এখন একসাথে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।

এই সজীব জনস্রোতের মধ্যে লম্বা শক্ত-সমর্থ চেহারার একটা লোকের বিষণ্ণ মুখ দেখে অবাক লাগল, দুঃখ হল। একটি যুবতীকে বাহুলগ্না করে লোকটা হেঁটে যাচ্ছিল। বয়স তার তিরিশের বেশি হতে পারে না, কিন্তু মাথার চুল পেকে গেছে। টুপিটা হাতে ধরা, গোল মাথাখানা সবই রুপোলী। শীর্ণ স্বাস্থ্যবান মুখ শান্ত, তবু দুঃখার্ত। বড়ো বড়ো কালো চোখদুটো পল্লবে আধো-ঢাকা, সে চোখ এমনভাবে চায় সেই লোক যে দুঃসহ এক যন্ত্রণা পার হয়ে এসে সেটা ভুলতে পারছে না।

বন্ধু বললেন, 'ঐ দুটিকে দেখুন, বিশেষ করে পুরুষটিকে। উত্তর ইতালির শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমেই ঘন ঘন যে শোকাবহ ঘটনা দেখা যাচ্ছে ও এসেছে তেমন একটা ট্র্যাজেডির মধ্য দিয়ে।'

তারপর বন্ধু আমাকে তার গল্পটা শোনালেন। বললেন:

'লোকটি সোশ্যালিস্ট, স্থানীয় একটি শ্রমিক পত্রিকার সম্পাদক। নিজেও একজন শ্রমিক, রঙ-মিস্ত্রি। সেই জাতের লোক, যাদের কাছে জ্ঞানের মানে হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বাস, আর বিশ্বাসটা আরো বাড়িয়ে তোলে জ্ঞানপিপাসা। ঘোর গির্জা-বিরোধী, তবে বুদ্ধিমান। ঐ দেখুন না, কালো পোশাকের পাদরিরা ওর পিঠের দিকে কি রকম তাকাচ্ছে!

'ও ছিল প্রচারক, বছর পাঁচেক আগে তার সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হয় নিজের পাঠচক্রে। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগ

আকর্ষণ করে। এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে একটা প্রশ্নহীন অটল ঈশ্বরবিশ্বাসের শিক্ষা আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরোহিতেরা এদের মধ্যে এই গুণটাই বাড়িয়ে এসেছে, আর যা ইচ্ছে করেছে। কে যেন বলেছেন ক্যাথলিক গির্জা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মেয়েদের বুকের ওপর, সে কথা অত্যন্ত ঠিক। মাডোনা পুজা শুধু প্রতিমাপুজার অর্থেই সুন্দর তা নয়, মতবাদ হিসেবেও বেশ চতুর। খ্রীস্টের চেয়ে মাডোনা অনেক সহজ। মাডোনার আবেদন বুকের অনেক কাছে। তার মধ্যে নেই কোনো বৈপরীত্য, নরকের ভয় সে দেখায় না। সে শুধু ভালোবাসে, মায়া হয় তার, ক্ষমা করে। চিরজীবনের মতো মেয়েদের হৃদয় জয় করে নেওয়া মাডোনার পক্ষে সহজ।

'কিন্তু পাঠচক্রের ঐ তরুণী মেয়েটি বলতে কইতে পারত বেশ, প্রশ্ন জিগ্যেস করত। লোকটা টের পেত সে প্রশ্নের মধ্যে তার ভাব-ধারণা সম্পর্কে একটা সরল বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে তার সম্পর্কে খোলাখুলি অবিশ্বাসও, প্রায়ই ভীতি, এমন কি তীব্র বিরূপতা। ধর্ম সম্পর্কে ইতালিয়ান প্রচারকের অনেক কিছু বলতেই হয়, এবং পোপ আর ধর্মযাজকদের সম্পর্কে কড়া কথাও শোনাতে হয় প্রায়ই। আর যতবার সে এই সব কথা বলেছে, ততবারই তার নজরে পড়েছে মেয়েটির চোখে ফুটে উঠছে ওর সম্পর্কে ঘৃণা আর বিদ্বেষ। মেয়েটি যদি-বা কোন প্রশ্ন করত, তাহলে তার কথাগুলোয় দেখা দিত শত্রুতা, বিষ ঝরত তার কোমল কণ্ঠস্বরে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক যেসব সাহিত্য আছে, বোঝা যেত সেসব তার ভালোই জানা, এবং পাঠচক্রে মেয়েটি যা যা বলত, তা লোকে কম মনোযোগ দিয়ে শুনত না।

'এখানে, এই ইতালিতে, মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষদের যা মনোভাব সেটা যেমন রাশিয়ায় তার চেয়েও অনেকটা সোজাসাপটা আর

স্কুল, এবং তার জন্য ইতালিয়ান মেয়েরা নিজেরাই অনেক অজুহাত জুগিয়েছে; অন্তত অল্প কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। গির্জা ছাড়া আর কোন কিছুতে তাদের আগ্রহ ছিল না, পুরুষদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তারা সর্বোত্তম ক্ষেত্রে নিস্পৃহ, তার তাৎপর্য তাদের কাছে বোধগম্য হত না।

'আমার বন্ধুর পৌরুষে ঘা লাগল, এই তরুণীটির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিপুণ প্রচারক হিশেবে তার খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করল। মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ত সে, বেশ কয়েকবার মেয়েটির যুক্তি হেসে উড়িয়ে দিতে সে পারে, কিন্তু মেয়েটিও শোধ তুলত একই কায়দায়, অগোচরে নিজের সম্পর্কে ওর মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলল; মেয়েটির পাঠচক্রে পড়াবার আগে ভালো করে তৈরি হয়ে আসতে বাধ্য হল লোকটি।

'কিন্তু সেই সঙ্গে লোকটার নজরে পড়ল, যখনই সে বর্তমান জীবনের কদর্যতার কথা বলত, বলত কী করে এ জীবনে মানুষ নিপীড়িত হচ্ছে, কী করে তার দেহমন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, অথবা যখনই সে ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি তুলে ধরত, মানুষ যেখানে দেহে মনে মুক্ত, তখনই সে তার সামনে দেখত অন্য এক নারীকে। মেয়েটি তার কথা শুনত বুদ্ধিমান আর সবলা এক নারীর জ্বালা নিয়ে, যে জানে জীবনের শেকল কী কঠিন; অথবা শুনত শিশুর মতো আস্থা ভরা আকুলতায়, যেন শুনছে একটা রূপকথার কাহিনী, যা শিশুর মনের সঙ্গে মেলে, শুনত নিজেরও রূপকথার মতো গড়া প্রাণ দিয়ে।

'এ থেকে লোকটার মনে আশা হল, শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে জয় করা যাবে, চমৎকার এক কমরেড হতে পারবে মেয়েটি।

'প্রতিযোগিতা চলল প্রায় বছর খানেক ধরে, কিন্তু কারো মধ্যেই

আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে শুধু দুজনে বিতর্ক চালাবার ইচ্ছা জাগল না। শেষ কালে লোকটিই যেচে এল মেয়েটির কাছে। বললে:

''সিনোরিনা, আপনি তো আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু, কাজের দিক থেকে কি ভালোই হবে যদি আমরা পরস্পরকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানি?'

'সাগ্রহে সায় দিলে মেয়েটি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধ বাধল। উত্তেজিতভাবে মেয়েটি গির্জাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ নিয়ে বললে, সেখানেই মানুষের তাপিত আত্মার শান্তি, করুণাময়ী মাডোনার কাছে সবাই সমান, যে যা পোশাক পরেই আসুক না কেন, সকলেই সমান অনুকম্পার পাত্র। প্রতিবাদ করে লোকটি বললে, মানুষের যা দরকার সেটা শান্তি নয় সংগ্রাম, বৈষয়িক সুখসুবিধার সাম্য ছাড়া সামাজিক সাম্য অসম্ভব, এবং মাডোনার পেছনে লুকিয়ে আছে এমন সব লোক মানুষকে অভাগা ও অজ্ঞান করে রাখাই যাদের স্বার্থ।

'তদবধি ওদের জীবন ভরে উঠল এই সব বিতর্কে। একই উত্তেজিত বিতর্কের জের চলল প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই, এবং দিনদিনই পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল দুজনের দুই বিশ্বাসের মধ্যে চরম আপোসহীনতা।

'পুরুষটির কাছে জীবন হল জ্ঞান সংগ্রাম, প্রকৃতির রহস্যময় শক্তিকে মানুষের ইচ্ছাধীন করে তোলার জন্য সংগ্রাম। সমস্ত লোককেই সমানভাবে সশস্ত্র হতে হবে এই সংগ্রামের জন্য, পরিণামে পাব মুক্তি ও বুদ্ধির জয়। এই হল বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও একমাত্র শক্তি যা সচেতনভাবে সক্রিয়। মেয়েটির কাছে জীবন হল অজানার কাছে মানুষের আর্ত বলিদান, এমন একটা ইচ্ছাশক্তির কাছে চিত্তের বশবর্তিতা যার বিধি আর লক্ষ্য শুধু যাজকদেরই জানা।

''তাহলে কেন আপনি আমার বক্তৃতা শুনতে আসেন?' অবাক হয়ে ও জিগ্যেস করলে, 'সমাজতন্ত্র থেকে কী পাবেন আপনি?'

'বিষণ্ণভাবে মেয়েটি স্বীকার করল, 'জানি, এটা আমার পক্ষে পাপ, আমার স্ববিরোধিতা হচ্ছে। তবু ভারি ভালো লাগে আপনার কথা শুনতে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে সুখসম্ভাবনার স্বপ্ন দেখতে!'

'দেখতে যে খুব ভালো ছিল মেয়েটি তা নয়, একহারা চেহারা, বুদ্ধিমান মুখখানা, বড়ো বড়ো দুই চোখ, দৃষ্টি কখনো তুষ্ট কখনো রুষ্ট, কখনো কোমল কখনো কঠিন। সিল্কের এক কারখানায় মেয়েটি কাজ করত, বাড়িতে বুড়ি মা, পঙ্গু বাপ আর ছোটো বোন, পড়ে একটা কাজ শেখার ইস্কুলে। মাঝে মাঝে বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠত মেয়েটি, হৈচৈ নয় কিন্তু মনোহারিণী। পুরনো পুরনো গির্জা আর মিউজিয়মে যাবার সখ ছিল তার, ছবি আর শিল্পকর্মের সৌন্দর্যে উচ্ছ্বসিত হত। এসব দেখে মাঝে মাঝে সে বলত:

''ভাবতে অদ্ভুত লাগে এই সব সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো লোকেদের ব্যক্তিগত গৃহে একসময় আটকা পড়েছিল, এসব উপভোগ করার অধিকার থাকত শুধু একজনেরই! সুন্দরকে দেখতে পাওয়া চাই সকলেরই, কেবল তখনই তা প্রাণ পায়।'

'প্রায়ই মেয়েটি এমন অদ্ভুতভাবে কথা কইত যে ওর মনে হত, বুঝি কথাগুলো বেরিয়ে আসছে মেয়েটির প্রাণের কোন যন্ত্রণা থেকে যা তার কাছে দুর্বোধ্য, মনে হত ওটা যেন কোন আহতের গোঙানি। লোকটি টের পেত মেয়েটি জীবন আর মানুষকে ভালোবাসে মায়ের মতো গভীর দরদে, সে ভালোবাসায় যত উদ্বেগ তত সমবেদনা। ধৈর্য ধরে লোকটি অপেক্ষা করতে লাগল, একদিন তার বিশ্বাস দিয়ে সে মেয়েটির প্রাণে আগুন ধরিয়ে দেবে, মেয়েটির মৃদু ভালোবাসা উদ্দীপিত হয়ে উঠবে হৃদয়াবেগে। ওর মনে হল, মেয়েটি যেন আরো উৎসুক হয়ে তার কথা শুনতে শুরু করেছে, ভেতরে ভেতরে মেয়েটি বুঝি তার মত মেনে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। আগের চেয়ে আরো আবেগ

ঢেলে লোকটা মেয়েটিকে শোনাতে লাগল পুরনো শেকল ভেঙে মানুষের — জাতিগুলির, বিশ্বজনের মুক্তির জন্য অবিরাম সংগ্রাম কত প্রয়োজন — জঙধরা এ শেকল মানুষের মনের মধ্যে কুরে কুরে খেয়ে সবকিছু বিকৃত, বিষাক্ত করে তুলছে।

'একদিন মেয়েটিকে বাড়ি পেঁছে দেবার সময় ও বললে, মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। এর যা প্রতিক্রিয়া হল তাতে ভয় পেয়ে গেল সে। মেয়েটি টলে উঠল যেন সে তাকে ধাক্কা দিয়েছে। বিস্ফারিত চোখে বিবর্ণ মুখে হাত দুখানা পেছনে রেখে মেয়েটি দাঁড়াল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় আতঙ্কিত হয়ে বললে:

' 'আমি অনুমান করেছিলাম যে এই হবে, আমি টের পাচ্ছিলাম, কেননা অনেকদিন ধরে আমিও তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু, হায় ভগবান, কি হবে এখন?'

'আবেগে ও জবাব দিলে, 'শুরু হচ্ছে তোমার আমার সুখের দিন, একসঙ্গে কাজের!'

' 'না' — মেয়েটি বললে মাথা নিচু করে, 'না, না! আমাদের মধ্যে ভালোবাসার কোন কথাই চলতে পারে না।'

' 'কেন?'

'মৃদু কণ্ঠে জিগ্যেস করলে মেয়েটি, 'গির্জায় গিয়ে বিয়ে করতে রাজী আছো?'

' 'না!'

' 'তাহলে বিদায়!'

'ওর কাছ থেকে দ্রুত চলে গেল মেয়েটি।

'তার সঙ্গ ধরে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে লোকটি। মেয়েটা নীরবে শুনল ওর সব কথা, আপত্তি করলে না, তারপর বললে:

' 'আমি, আমার মা, বাবা — সকলেই আমরা ধর্মভীরু, ধর্ম

নিয়েই আমরা মরতে চাই। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে — সে আমার দ্বারা হবে না। এ রকম বিয়ে থেকে যদি ছেলেপুলে হয় তারা হতভাগ্য হবেই হবে। আমি জানি। গির্জায় গিয়ে বিয়ে করলে তবেই প্রেম পবিত্র হয়ে উঠবে, তবেই সুখ শান্তি সম্ভব।'

'ও দেখলে মেয়েটি সহজে হার মানবে না, কিন্তু সেও তো হার মানতে পারে না। ছাড়াছাড়ি হল ওদের। বিদায় নেবার আগে মেয়েটি বললে:

''পরস্পরের যন্ত্রণা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। আমার সঙ্গে আর দেখা করো না! তুমি যদি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারতে! আমার সে উপায় নেই, আমি বড়ো গরিব...'

'ও বললে, 'সে রকম কোনো কথা দিতে পারছি না।'

'এমনি করেই এই দুটি দৃঢ়চেতা মানুষের মধ্যে লড়াই শুরু হল। দেখাসাক্ষাৎ ওদের অবশ্য হত, এমন কি আগের চেয়ে ঘন ঘনই। তা হত কারণ দুজনেই ওরা চাইত দেখা করতে, আশা ছিল দুজনের একজন হয়ত আর অতৃপ্ত ও ক্রমপ্রজ্বলিত প্রেমের যন্ত্রণা বহন করতে পারবে না। কিন্তু দেখা করে শুধু যন্ত্রণা আর হতাশাই বেড়ে উঠত। প্রত্যেকবার সাক্ষাতের পর লোকটি বিধ্বস্ত আর অসহায় বোধ করত, ওদিকে কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি যেত গির্জায় স্বীকারোক্তি করতে। ছেলেটি তা জানত। ওর মনে হত, মুণ্ডিতমস্তক পুরোহিতেরা যেন এক কালো দেয়ালের মতো ক্রমেই উঁচু হয়ে, দিনে দিনে দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠে ওদের দুজনকে চিরকালের মতো বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইছে।

'একদিন এক ছুটির দিনে ওরা যখন শহরতলীর মাঠে একসঙ্গে বেড়াচ্ছিল, তখন লোকটি একবার বলেছিল:

''জানো, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমাকে আমি যেন খুন করে ফেলতেও পারি।' ভয় দেখাবার জন্য কথাটা ও বলে নি, যা ভাবছিল সেইটেই যেন বেরিয়ে এসেছিল ওর মুখ দিয়ে।

'মেয়েটি উত্তর দেয় নি।

' 'কী বললাম শুনেছ?'

'ওর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে মেয়েটি বলেছিল, 'হ্যাঁ। শুনেছি।'

'আর ওর বুঝতে বাকি রইল না, মেয়েটি মরবে তবু ওর কাছে হার মানবে না। এই 'হ্যাঁ, শুনেছি'র আগে অবশ্য মাঝে মাঝে সে মেয়েটিকে আলিঙ্গন করেছে, চুমু খেয়েছে। একটু-আধটু ঠেকাবার চেষ্টা করেছে মেয়েটা, কিন্তু প্রতিরোধ তার ক্ষীণ হয়ে আসতে শুরু করেছিল। লোকটির আশা হয়েছিল একদিন মেয়েটি হার মানবে তার কাছে, মেয়েটির নারীসুলভ প্রবৃত্তি সাহায্য করবে তাকে জয় করতে। কিন্তু এই ঘটনার পর সে বুঝলে, সেটা জয় হবে না, হবে দাসত্ব। এর পর থেকে মেয়েটির মধ্যেকার নারীকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা সে আর করে নি।

'এমনি করেই মেয়েটির জীবনবোধের অন্ধকার গণ্ডিতে ও ঘুরে বেড়াত মেয়েটির সঙ্গে। যা জ্বালানো সম্ভব তেমন সমস্ত আগুনই সে জ্বালাল তার সামনে। কিন্তু মেয়েটি যেন এক দৃষ্টিহীন জীব, তার কথা শুনে যেত স্বপ্নাতুর হাসি নিয়ে, কিন্তু বিশ্বাস করত না তাকে।

'মেয়েটি একবার তাকে বলেছিল:

' 'মাঝে মাঝে আমি বেশ বুঝতে পারি, তুমি যা বলছ তা সত্যিই সম্ভব। কিন্তু তারপর ভাবি, তা মনে হচ্ছে কারণ আমি তোমায় ভালোবাসি! আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করা অসম্ভব আমার পক্ষে! তারপর তুমি যখন আমার কাছ থেকে চলে যাও, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সবকিছুও চলে যায় আমাকে ছেড়ে।'

'এমনি চলল প্রায় দুবছর, তারপর একদিন অসুখে পড়ল মেয়েটি। লোকটি তার কাজকর্ম সব জলাঞ্জলি দিলে, রাজনৈতিক সংগঠনের কাজ ছেড়ে ছুড়ে দেনা করতে থাকল এবং কমরেডদের এড়িয়ে মেয়েটির ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করত কিংবা বিছানার

পাশে বসে দেখত কিভাবে ক্ষয় পেতে শুরু করেছে মেয়েটি, দিনের পর দিন হয়ে উঠছিল স্বচ্ছ, রোগের আগুন ক্রমেই ধক ধক করে উঠত চোখে।

'মেয়েটি অনুনয় করে বলত, 'ভবিষ্যতের কথা আমায় বলো না গো।'

'কিন্তু ও বলত শুধু বর্তমানের কথা, যা-কিছু আমাদের ধ্বংস করে ফেলছে, যার বিরুদ্ধে সে চিরকাল লড়াই চালাবে, নোংরা ছেঁড়া ন্যাতাকানির মতো যে-জিনিসগুলোকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে হবে মানুষের জীবন থেকে, তার ফিরিস্তি সে দিয়ে চলত সরোষে।

'মেয়েটি শুনত, তারপর ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলে ওকে থামাত ওর হাতখানা ছুঁয়ে, ওর চোখের দিকে অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'ডাক্তার ওকে বলেছিল মেয়েটির রাজযক্ষ্মা হয়েছে, বাঁচার আশা নেই। এর অনেকদিন পরে মেয়েটি ওকে জিগ্যেস করলে, 'আমি কি মরতে চলেছি?'

'জবাব না দিয়ে ও চোখ নামাল।

''আমি জানি আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে' মেয়েটি বললে: 'দাও, হাত দাও।'

'লোকটি তার হাত বাড়িয়ে দিলে। সে হাতে মেয়েটি তার তপ্ত ঠোঁটদুটি ঠেকিয়ে বললে:

''আমায় ক্ষমা করো, আমি অন্যায় করেছি তোমার কাছে। ভুল করে তোমাকে অত যন্ত্রণা দিয়েছি। এখন মরণকালে জেনেছি, আমার নিজের ইচ্ছা আর তোমার চেষ্টা সত্ত্বেও আমি যা বুঝতে পারছিলাম না, আমার ধর্মবিশ্বাস ছিল তার সামনে আতঙ্ক। ওটা আতঙ্কই বটে, কিন্তু সে আতঙ্ক যে আমার রক্তে, এই আতঙ্ক নিয়েই আমি জন্মেছি। বুদ্ধিটা আমার নিজের, অথবা বুঝি সেটা তোমারই, কিন্তু

দেওয়াটা যে পরের। আমি বুঝেছিলাম তুমি ঠিক, কিন্তু হৃদয় তোমার কথা মানতে পারছিল না...’

‘কয়েকদিন পরে মেয়েটি মারা গেল। মেয়েটির মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখতে দেখতে লোকটির চুল পেকে যেতে লাগল — তার সাতাশ বছর বয়সেই শাদা হয়ে গেল চুল।

‘অল্প কিছু দিন আগে লোকটি বিয়ে করেছে ওই মেয়েটিরই একমাত্র বান্ধবীকে, সেও তারই পাঠচক্রের ছাত্রী। ওরা এখন চলেছে কবরখানায়। প্রতি রবিবার ওরা ওখানে গিয়ে মেয়েটির কবরে ফুল দিয়ে আসে।

‘লোকটি বিশ্বাস করে নি সে জিতেছিল। মেয়েটি যখন বলছিল, ‘তুমিই ঠিক’ তখন সে শুধু মিথ্যা বলেছিল তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই ওর দৃঢ় ধারণা। ওর স্ত্রীও তাই ভাবে। ওদের দুজনের কাছেই মেয়েটির স্মৃতি পবিত্র। চমৎকার একটি মানুষের এই মৃত্যুর দুঃসহ ঘটনা ওদের মধ্যে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা আর শক্তি জাগিয়ে তুলেছে, ওদের মিলিত কাজকর্মে সঞ্চার করছে একটা ক্লান্তিহীনতা, বিশেষ রকমের একটা প্রশস্ত, সুন্দর চরিত্র।’

...রোদে ঝলমল বয়ে চলেছে উৎসবের মতো বর্ণবহুল সাজে প্রাণোচ্ছল জনস্রোত, সে স্রোতের সঙ্গে উঠছে ফুর্তির কোলাহল, চিৎকার করছে, হাসছে শিশুরা। এ কথা সত্যি, সকলেরই মন খুশি, লঘুভার এমন নয়। সন্দেহ নেই, অনেকের বুক দুঃখে ভারাক্রান্ত, অনেকের মন স্ববিরোধে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু সকলেই আমরা যাত্রা করেছি মুক্তির দিকে, মুক্তির দিকে!

যতই চলব একসঙ্গে, ততই পৌঁছব তাড়াতাড়ি!

মা

এসো জয়ধ্বনি দিই নারীর নামে, যিনি মা, সর্বজয়ী জীবনের অক্ষয় উৎস-মুখ!

এ হল সেই খোঁড়া বাঘ পাষাণ-হৃদয় তিমুর-লেঙ-এর কাহিনী, সেই ভাগ্যবান দিগ্বিজয়ী সাহেব-ই-কিরানি-র কাহিনী, কাফেররা যাকে বলে তৈমুরলঙ, তামাম দুনিয়াকে যে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

পঞ্চাশ বছর ধরে সে পদদলিত করে ফিরেছে পৃথিবীটাকে, হাতীর পায়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া উইঢিবির মতো তার রথচক্রের তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র, নগরের পর নগর। তার পথ থেকে রক্তের লাল নদী বয়ে গেছে দিগ্বিদিকে। পর্যুদস্ত এক-একটা জাতের হাড় দিয়ে সে বানিয়ে ফিরেছে উঁচু উঁচু মিনার। জীবনকে ধ্বংস করে সে তার শক্তির পাঞ্জা ধরেছে যমের সঙ্গে, তার পুত্র জাহাঙ্গীরকে সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বলে এটা তার প্রতিশোধ। ভয়ঙ্কর এই মানুষটার ইচ্ছা ছিল যমের কাছে যা কোরবানি তা সে কেড়ে নেবে নিজে, খিদে আর মন-পোড়ানিতে মারা যাবে যম!

যেদিন তার ছেলে জাহাঙ্গীর মারা গেল, আর কালো আর আসমানী নীল পোশাকে, ছাই আর ধুলো মাখা মাথায় সমরখন্দের

লোকদের সামনে এসে দাঁড়াল হিংস্র জাটদের বিজেতা তৈমুর, সেই দিন থেকে শুরু করে অবশেষে ওত্রার-এ যখন দেখা হল যমের সঙ্গে, হার মানল যমের কাছে — এই তিরিশ বছর তৈমুর একবারও হাসে নি। এই চলেছে দাঁতে দাঁত চেপে, কারো কাছে মাথা না নুইয়ে, হৃদয়ে সমবেদনার রুদ্ধ ছিল এই তিরিশ বছর!

এসো বিশ্বে জয়ধ্বনি দিই নারীর নামে, মা তিনি, সেই একমাত্র শক্তি যার কাছে যমও মাথা নত করে বাধ্যের মতো! আজ বলা হবে মায়ের সম্পর্কে সত্য কাহিনী, বলব কেমন করে সেই পাষাণ-হৃদয় তৈমুরলঙ, যমের নফর আর গোলাম, পৃথিবীর ওপর রক্তাক্ত কষা মাথা নত করেছিল তার কাছে।

ঘটনাটা বলি:

ভোজসভা বসেছে তৈমুর-বেকের। ভোজসভা বসেছে সেই কানিগুলার রমনীয় উপত্যকায় যেখানে গোলাপ আর জুঁইয়ের মেঘে ছেয়ে গেছে সবকিছু, সমরখন্দের কবিরা যার নাম দিয়েছিল 'ফুলের প্রেম', যেখান থেকে দেখা যায় বিশাল শহরখানার নীল নীল মিনার, মসজিদের নীল নীল গম্বুজ।

উপত্যকা জুড়ে প্রশস্ত ছত্রাকারে গোল গোল ছাউনি পড়েছে পনেরো হাজার, যেন পনেরো হাজার টিউলিপ ফুল, প্রত্যেকটা ছাউনির ওপর বাতাসে উড়ছে রেশমী নিশান, যেন তাজা এক-একটা ফুল।

সব ছাউনির ঠিক মাঝখানে হল তৈমুর-গুরুগানের ছাউনি, যেন সখিদলের মাঝখানে রাণী। ছাউনি চতুষ্কোণ, তার চারটে কোণের এক-একটা দিক লম্বায় একশ পদক্ষেপ, তিন বল্লমের সমান উঁচু, মাঝখানটায় বারোটা সোনার খুঁটি — তবে এক-একটা মানুষের মতো চওড়া। মাথার ওপরে আসমানী রঙের চাঁদোয়া, আর কালো, হলদে, নীল ডোরাকাটা রেশমী কাপড় দিয়ে পাশগুলো মোড়া। এ ছাউনি

যাতে আকাশে উড়ে না যায় তার জন্য লাল লাল পাঁচশ রশি দিয়ে তা মাটির সঙ্গে কষে বাঁধা। চার কোণে চারটি রূপোর ঈগল, আর চাঁদোয়ার নিচে, ছাউনির ঠিক মাঝখানকার বেদীর ওপর বসে আছে পঞ্চম ঈগল, খোদ শাহানশাহ্, অপরাজেয় তৈমুর-গুরুগান।

পরনে তার আকাশী রঙের মুক্তাখচিত ঢোলা রেশমী পোশাক, বড়ো বড়ো মুক্তার সংখ্যাই পাঁচ হাজারের কম নয়! পাকা চুলে ভরা তার ভয়ঙ্কর মাথার ওপর উষ্ণীষ, তার কোনাচে একটা লাল চুনী, কেবলি দুলে দুলে ঝলমলিয়ে যেন একটা রক্ত চক্ষুর মতো নিরীক্ষণ করছে পৃথিবীটাকে।

চওড়া একটা রক্তের মরচে-ধরা ছোরার মতো খোঁড়া তৈমুরের মুখখানা — রক্তে সে ডুব দিয়েছে হাজার হাজার বার। চোখদুটো তার নরুন-চেরা, কিন্তু কোনকিছুই তার নজর ফসকায় না। সে চোখ থেকে আসে জারামুতের মতো তুহীন ছটা, আরবদের কাছে এটা পেয়ারের মণি, কাফেররা তার নাম দিয়েছে পান্না, মৃগী রোগীকেও ভালো করে দেওয়া যায় তা দিয়ে। কান থেকে তার যে মাকড়ি ঝুলছে তাতে সিংহলের চুনী বসানো — রঙ তার সুন্দরী মেয়ের ঠোঁটের মতো।

মাটিতে অপরূপ কার্পেটের ওপর সারি সারি সাজানো আছে তিনশ সোনার কলস ভর্তি শরাব আর রাজকীয় ভোজের জন্য যাকিছু দরকার সব। নহবত বসেছে তৈমুরের পেছনে, দু'পাশে কেউ নেই, তার পায়ের কাছে জ্ঞাতিকুটুম্ব, রাজা-রাজড়া, সেনাপতিদের দল, আর তৈমুরের সবচেয়ে কাছে সেই কবি মাতাল কেরমানি — যাকে একদিন বিশ্ববিধ্বংসী জিগ্যেস করেছিল:

'কেরমানি, আমাকে যদি বিক্রি করা হয়, তাহলে কত দাম ধরবে?'

মৃত্যু ও বিভীষিকার সেই নায়ককে কেরমানি বলেছিল, 'পঁচিশ সেপাই!'

অবাক হয়ে তৈমুর বলে উঠেছিল, 'কিন্তু ওতো আমার কোমরবন্ধটারই দাম!'

কেরমানি বলেছিল, 'আমি তো শুধু তোমার কোমরবন্ধটার কথাই ভেবেছিলাম, ওই জন্যেই পঁচিশ সেপাই, কেননা তোমার নিজের দাম একপয়সাও নয়!'

ভীম ভয়ংকর সেই শাহানশাহ্‌ তৈমুরকে কবি কেরমানি বলেছিল এই কথা। জয় হোক সত্যমুখা কবির, তৈমুরলঙের চেয়েও চিরকাল উঁচু হয়ে থাক কবির গৌরব!

এসো আমরা জয়ধ্বনি দিই কবিদের, সেই সব কবির যাদের শুধু একটি ঈশ্বর—নির্ভীক সুন্দর সত্যবাণী! এই তাদের কাছে চিরন্তন ঈশ্বর!

তারপরে তো সেই যখন ভোজ আর ফুর্তি জমেছে পুরোদমে, লড়াই আর বিজয়ের গল্প চলেছে সাহংকারে, তান ধরেছে নহবত আর শাহের ছাউনির সম্মুখে কোলাহল উঠছে লৌকিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের — চিত্রবিচিত্র পোশাকের অসংখ্য বিদুষক ডিগবাজি খেয়ে চলেছে, কুস্তি করছে পালোয়ানেরা, দড়ির ওপর এমন সব কসরৎ দেখানো হচ্ছে যে মনে হবে বুঝি লোকগুলোর শরীরে হাড় বলে কিছু নেই, হত্যা করার নিখুঁত নৈপুণ্যে তরোয়াল চালাচ্ছে যোদ্ধারা, দেখানো হচ্ছে লাল-সবুজ রঙ করা হাতীর খেলা — তার ফলে কোন হাতীকে দেখাচ্ছে ভয়ংকর, হাসি পাচ্ছে কোনটাকে দেখে — তৈমুরের লোকলস্করদের সেই ফুর্তির মুহূর্তে — সেই সব লোকলস্কর যারা তৈমুর সম্পর্কে ভয়, তার গৌরবে অহঙ্কার, তার জয়লাভের ক্লান্তিতে, শরাবে আর কুমিসে মাতাল — তখনকার সেই উন্মাদ মুহূর্তে সমস্ত কোলাহল ভেদ করে একটি নারী কণ্ঠের, একটি নারী-ঈগলের অহংকৃত চিৎকার এসে পেঁছিল সুলতান বায়াজেত বিজেতার কর্ণকুহরে যেন বজ্রগর্ভ মেঘ ফুঁড়ে এল এক বিদ্যুতের ঝলক। সে

চিৎকার তৈমুরের পরিচিত, তার আহত প্রাণের কাছে আপন, সে প্রাণ আহত মৃত্যুর হাতে, তাই জীবনের ওপর মানুষের ওপর তা নিষ্ঠুর...

লোকদের হুকুম করলে তৈমুর, দ্যাখো, কে অমন নিরানন্দ গলায় চেঁচাচ্ছে। ওরা বললে, একটা মেয়েমানুষ ছিন্নবাসা ধূলিধূসর, মনে হয় এক উন্মাদিনী, আরবী ভাষায় কথা কইছে, আর দাবি করছে, হ্যাঁ, দাবি করছে কিনা আসবে দুনিয়ার তিন প্রান্তের মালিকের কাছে।

শাহ বললে, 'ওকে নিয়ে এসো!'

এসে দাঁড়াল মেয়েটা। খালি পা, ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক বিবর্ণ হয়ে গেছে রোদ্দুরে। কালো চুল নেমে এসে ঢেকেছে নগ্ন বুক। ব্রোঞ্জের মতো মুখের রঙ, আদেশব্যঞ্জক চোখ। খোঁড়ার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া কালো বাহুদুটো কাঁপল না।

জিগ্যেস করলে, 'সুলতান বায়াজেতকে যে পরাজিত করেছে, সেই কি তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি তাকে জয় করেছি, তাকে তো বটেই, আরো অনেককে, জয়লাভে এখনো আমি ক্লান্ত নই। কিন্তু তোমার কী বলবার আছে, নারী?'

মেয়েটা বললে, 'শোনো তবে, যা-কিছুই তুমি করো না কেন, তুমি একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, কিন্তু আমি মা! তুমি সেবা করো মৃত্যুর, আমি জীবনের, আমার কাছে তুমি অপরাধী, তাই আমি এসেছি তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত দাবি করতে। লোকে বলে তোমার মন্ত্রবাণী নাকি 'ন্যায়েই শক্তি'। আমি সে কথা বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমার কাছে তোমাকে ন্যায়পর হতেই হবে, কারণ আমি মা!'

উদ্ধত এই কথার পেছনে যে শক্তি তা অনুভব করার মতো বিজ্ঞতা শাহের ছিল। বললে:

'বসো, বলো কী বলবে, আমি শুনছি!'

আমীর-ওমরাহদের ঘন মণ্ডলীর মধ্যে গালিচার ওপর আরাম করে বসে মেয়েটি তার কাহিনী শুরু করল:

'আমি আসছি সালের্নো থেকে, ইতালির এক অনেক দূরের এক অঞ্চল সেটা — তুমি চিনবে না। আমার বাপ ছিল জেলে, আমার স্বামীও জেলে। সুখী মানুষের চেহারা যেমন সুন্দর হয়, তেমনি সুন্দর ছিল তার চেহারা, আর তাকে সুখামৃত সেবন করাতাম আমিই! একটি ছেলেও ছিল আমার, পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব...'

'আমার জাহাঙ্গীরের মতো' — অস্ফুট স্বরে বললে সেই বৃদ্ধ যোদ্ধা।

'আমার ছেলের মতো সুন্দর আর বুদ্ধিমান ছেলে আর কেউই নেই। ছ'বছর যখন তার বয়স, তখন আমাদের কূলে এসে হানা দিল সারাসীন-বোম্বেটেরা। আমার বাপকে স্বামীকে আরো অনেককে খুন করলে তারা, আর ধরে নিয়ে গেল আমার ছেলেটাকে। তারপর থেকে এই চার বছর আমি তার খোঁজে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে এখন আছে তোমার কাছে। এ আমি জানি, কেননা বায়াজেতের লোকেদের হাতে ধরা পড়েছিল বোম্বেটে দলটা, আর তুমি বায়াজেতকে হারিয়ে তার সবকিছু সম্পত্তি লুট করেছ। তুমি জানো আমার ছেলে কোথায় আছে, তাকে আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।'

সকলে হেসে উঠল। সুলতানেরা সবসময়েই নিজেদের বিজ্ঞ বলে ভাবে। তারা বললে, 'মেয়েটা পাগলী!'

'পাগলী!' বললে সুলতানেরা, আর তৈমুরের বন্ধুরা, আর আমীর-ওমরাহ সেনাপতিরা, হাসতে লাগল সবাই।

শুধু গম্ভীরমুখে কেরমানি আর ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে শাহ তাকিয়ে রইল মেয়েটার দিকে।

'মেয়েটা পাগলী, যেমন পাগলী হয় মায়েরা'—আস্তে করে বললে মাতাল কবি কেরমানি, আর শান্তির দুষমন শাহ বললে:

'নারী! আমার অজানা সেই দেশ থেকে তুমি নদী-সমুদ্র পাহাড়-পর্বত পার হয়ে, বনজঙ্গলের মধ্য দিয়ে এলে কি করে? পশু আর মানুষ — যারা প্রায়ই হয় হিংস্র পশুর চেয়েও হিংস্র — কেন গাত্রস্পর্শ করল না? অসহায় মানুষের একমাত্র দোস্ত তার হাতিয়ার — যতদিন হাতিয়ার চালাবার ক্ষমতা থাকবে ততদিন সে কখনো বেইমানি করবে না। কিন্তু বিনা হাতিয়ারে তুমি কি করে এলে একা একা? তুমি যা বলছ, তা বিশ্বাস করতে হলে এসব আমার জানা দরকার, তোমার সম্পর্কে বিস্ময় যাতে তোমায় বুঝতে বাধা না দেয়!'

এসো জয়ধ্বনি দিই নারীর নামে, যিনি মা, স্নেহের কাছে যাঁর কোন বাধা — বাধা নয়, যাঁর বুকের দুধে বেড়ে উঠেছে তামাম দুনিয়া! মানুষের মধ্যে যা-কিছু সুন্দর, তা এসেছে শুধু সূর্যের আলো আর মায়ের দুধ থেকে! এই থেকেই জেগেছে আমাদের জীবনের প্রতি ভালোবাসা!

মেয়েটি জবাব দিলে:

'শুধু একটি সমুদ্র পড়েছিল আমার পথে। তাতে অনেক দ্বীপ, অনেক জেলে নৌকো। আর লোকে যখন প্রিয়জনকে খুঁজতে বেরয়, তখন বাতাস থাকে সর্বদাই অনুকূল। আর সমুদ্রতটের ওপর যে জন্মিয়েছে, বেড়ে উঠেছে, নদী সাঁতরে পার হওয়া তার কিছুই নয়। আর পাহাড়-পর্বত? সে তো আমি খেয়ালই করি নি।'

আর সহর্ষে বলে উঠল মাতাল কেরমানি:

'ভালোবাসার কাছে পর্বত সে তো উপত্যকা!'

'বনজঙ্গল ছিল সত্যি, বনশুয়োর, ভালুক, বনবিড়াল আর শিঙ-বাগানো ভয়ংকর বুনোমোষের দেখা পেয়েছিলাম আমি। বাঘের চোখে পড়েছিলাম দুবার — তোমার মতো চোখে তাকিয়েছিল ওরা। কিন্তু প্রাণী মাত্রেরই হৃদয় আছে। তোমার সঙ্গে এই যেমন কথা কইছি, তেমনি করে কথা কয়েছিলাম ওদের সঙ্গেও। ওরা বিশ্বাস করল যে

আমি মা, তখন সরে গেল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, ওদেরও কষ্ট হয়েছিল আমার জন্যে! তুমি কি জানো না যে, পশুরাও তাদের শাবকদের ভালোবাসে, তাদের স্বাধীনতা আর জীবনের জন্যে কি করে লড়াই করতে হয় তা তারা মানুষের চেয়ে কম জানে না?'

তৈমুর বললে, 'হ্যাঁ, নারী! আমিও জানি মানুষের চেয়েও মাঝে মাঝে পশুর ভালোবাসা হয় মানুষের চেয়ে বেশি, লড়াই করে আরো রুখে!'

মেয়েটি বলতে লাগল ছেলেমানুষের মতো, কেননা প্রত্যেক মা-ই ভেতরে ভেতরে একশ গুণ শিশু: 'মানুষেরা তার মায়ের কাছে সবসময়েই শিশু, কেননা প্রত্যেক মানুষেরই মা আছে, প্রত্যেক লোকই কোন না কোন মায়ের ছেলে, এমন কি তুমি, বুড়ো, তুমি জানো, তুমিও জন্মেছো নারীর পেটে। ভগবানকেও অস্বীকার করতে পারো তুমি কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার সাধ্য নেই!'

'ঠিকই, নারী!' বলে উঠল নির্ভীক কবি কেরমানি, 'তাই! যত ষাঁড়ই থাক, তা থেকে বাছুর হবে না, সূর্য ছাড়া ফুল ফুটবে না, ভালোবাসা ছাড়া সুখ নেই, ভালোবাসা নেই নারী ছাড়া, আর মা নইলে না হবে কবি, না বীর!'

মেয়েটা বললে:

'ছেলে ফিরিয়ে দাও আমার, কেননা আমি তার মা, তাকে ভালোবাসি!'

মাথা নোয়াই নারীকে, তাঁর থেকেই জন্ম মোজেসের, মোহাম্মদের, সেই মহান পয়গম্বর যীশুর, কু-লোকের হাতে যিনি প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু শরীফ-উদ্দিন বলেছে, আবার উঠে দাঁড়াবেন তিনি, বিচার করবেন জীবিত আর মৃত — সকলের, আর তা ঘটবে এই দামস্কস্-এ, এই দামস্কস্-এ!

মাথা নোয়াই তাঁর কাছে যিনি অবিশ্রান্ত জন্ম দিয়ে চলেছেন মহতের! তারই পুত্র অ্যারিস্টট্‌ল্‌, আর ফিদৌসী, আর মধুর মতো মধুর সাদী, বিষ মেশানো শরাবের মতো ওমর খৈয়াম, সেকেন্দার শাহ আর অন্ধ হোমার — সকলেই তারা তাঁরই সন্তান। তাঁরই দুধ খেয়ে তারা মানুষ, যখন তারা টিউলিপ ফুলের মতো এই এতটুকু, তখন তাদের সকলকে তিনিই হাতে ধরে এগিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর পথে। দুনিয়ার যা-কিছু গর্ব তা এসেছে মায়ের কাছ থেকে!

আর শ্বেতকেশ সেই পুরন্দর, খোঁড়া বাঘ তৈমুর-গুরুগান ভাবনায় ডুবে গিয়ে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ, তারপর সবার উদ্দেশে বললে:

'ম্য' টেংড়ি কুলি তৈমুর! আল্লার নোকর, আমি তৈমুর বলছি যা বলা উচিত! এমনি ভাবেই আমি চলেছি, বহু বছর আমার পায়ের তলে আর্তনাদ করছে মাটি, তিরিশ বছর ধরে মৃত্যুর ফসল আমি লুট করছি, লুট করছি আমার ছেলে জাহাঙ্গীরের জন্যে মৃত্যুর ওপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশে! আমার বুকের মধ্যে সে সূর্যকে নিভিয়ে দিয়েছে বলে রাজ্য আর নগরের জন্যে লোকে আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে, কিন্তু কখনো কেউ আসে নি মানুষের জন্যে লড়তে। আমার চোখেও মানুষের কোন দাম ছিল না। কে সে, কেন সে আমার পথ রোধ করতে এসেছে, এ আমি কখনো তাকিয়ে দেখি নি। আমি তৈমুর, বায়াজেতকে পরাজিত করে আমিই তাকে বলেছিলাম, 'দ্যাখো বায়াজেত, আল্লার কাছে দেশ আর মানুষের কোন দাম নেই। নইলে দ্যাখো না কেন, আমাদের মতো লোকেদের সে ক্ষমতায় বসাচ্ছে — কাণা একটা লোক তুমি, আর খোঁড়া একটা লোক আমি!' এই কথাই আমি বলেছিলাম বায়াজেতকে যখন তাকে শেকলে বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছিল আমার কাছে, শেকলের ভারে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত পারছিল না। তার দুর্দশার দিকে তাকিয়ে আমি বলেছিলাম এই কথা,

আর টের পাচ্ছিলাম জীবন আমার কাছে পোড়ো জমির কাঁটাগাছের মতো তেতো!

'আল্লার নোকর, আমি তৈমুর বলছি যা বলা উচিত! আমার সামনে বসে আছে অনেক নারীর মধ্যেকার একজন সাধারণ নারী, কিন্তু সে আমার বুকের মধ্যে এমন একটা অনুভূতি জাগিয়েছে যা আমি কখনো বোধ করি নি। সমানে সমানে সে কথা বলেছে আমার সঙ্গে, ভিক্ষে চায় নি, দাবি জানিয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি, কিসে এই মেয়েটির এত জোর — কারণ সে ভালোবাসে, ভালোবাসা তাকে শিখিয়েছে যে তার সন্তান হল জীবনের একটা স্ফুলিঙ্গ, শতাব্দীর পর শতাব্দী তা থেকে শিখা জ্বলে যেতে পারে। সব পয়গম্বরই কি একদিন শিশু ছিল না, সব বীরই একদিন অসহায়? জাহাঙ্গীর রে! নয়নের মণি আমার! হয়ত তোকে নিয়ে এ দুনিয়া উঠত কবোষ্ণ হয়ে, পৃথিবীকে ভরে তুলতিস সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়ে, — আমি তো রক্তের বন্যায় ভালোই মাটি ভাসিয়ে তাকে উর্বর করেছি!'

জাতির পর জাতির কাছে যে লোকটা বিভীষিকা, সে আবার ডুবে গেল দীর্ঘ ভাবনার মধ্যে। তারপর বললে:

'আল্লার নোকর, আমি তৈমুর বলছি যা বলা উচিত! আমার রাজ্যের কোণে কোণে এই মুহূর্তে ছুটে যাক আমার তিনশ ঘোড়সওয়ার, এই নারীর সন্তানকে তারা খুঁজে নিয়ে আসুক, মেয়েটি এইখানে অপেক্ষা করে থাকবে, আর আমিও থাকব মেয়েটির সঙ্গে। ঘোড়ার জিনে চাপিয়ে যে ছেলেটিকে নিয়ে ফিরবে, তার ভাগ্য খুলে যাবে — এই কথা বলছি আমি, তৈমুর! ঠিক বলেছি, নারী?'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুখের ওপর থেকে কালো চুলের গোছা সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি হেসে বললে:

'ঠিকই বলেছ, রাজা!'

তারপর উঠে দাঁড়াল সেই ভয়ংকর বৃদ্ধ, নীরবে অভিবাদন করলে

মেয়েটিকে, আর সোল্লাসে সেই ফুর্তিবাজ কবি কেরমানি শিশুর মতো গেয়ে উঠল:

ফুলের গান, তারার গান, এ থেকে ভালো কিবা?
ভালোবাসার গান ভালো ভাই এ সবকিছুর চেয়ে!
বৈশাখের রোদের চেয়েও মোহিনী কার রূপ?
প্রেমিক বলে, যাহারে ভালোবেসেছি, সেই মেয়ে!

নিশীথ রাতের তারার পাঁতি অতি অপরূপ তাহা,
গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে সূর্য মনোলোভা।
ফুলের চেয়েও রম্য তবু প্রিয়তমার আঁখি,
বসন্তের রোদের অধিক তার সে হাসির শোভা।

কিন্তু সবার সেরা যে গান, সে গান আছে বাকি,
যা-কিছু এই দীন দুনিয়ায়, তার সে সূচনা,
মায়ায় ভরা হৃদয়ের গান, বিশ্বভুবনের
বুকের সে গান, গান সেই তার, যাহারে ডাকি মা!

আর তৈমুর বললে তার কবিকে:

'সাধু কেরমানি! আল্লার গুণগান করার জন্যে তোমার ঠোঁট দুখানা পছন্দ করে আল্লা ভুল করে নি।'

'আল্লা নিজেই যে এক মহান কবি!' বললে মাতাল কেরমানি।

হাসল মেয়েটি, হাসল রাজা-রাজড়া আমীর সেনাপতি, তারা সবাই যেন শিশু, তার দিকে চেয়ে — মায়ের দিকে চেয়ে।

এর সবকিছু সত্যি, প্রত্যেকটি কথা সত্যি — আমাদের মায়েরা জানে, তা জিগ্যেস করলে তারা বলবে:

'এসবই হল শাশ্বত সত্য। মৃত্যুর চেয়ে আমরা সবলা, অবিরাম আমরা পৃথিবীকে দান করি জ্ঞানী গুণী, কবি, আর বীরেদের, পৃথিবীকে ভরে তুলি তার গৌরবে!'

বিকলাঙ্গ

দিনটা গরম। সবকিছু চুপচাপ। আলোকিত শান্তিতে নিঝুম জীবন। আকাশের স্বচ্ছ ফিকে নীল চোখ সস্নেহে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। সে চোখের অগ্নিময় মণি-টা যেন সূর্য।

মসৃণ নীল ধাতুর একখানা পাতের মতো সমুদ্র। নানা রঙের মাছ-ধরা নৌকোগুলো নিশ্চল হয়ে আছে, উপসাগরের অর্ধচক্রে যেন রাঙ-ঝালাই করা, আকাশের মতোই তা উজ্জ্বল। আলস্যে ডানা নেড়ে উড়ে যায় একটা গাংচিল, আর জলের ওপর ছায়া জাগে তার — আকাশের পাখিটার বুকের চেয়েও তা আরো শাদা, আরো সুন্দর।

সুদূরের ঝিলমিলির মধ্যে লালচে বেগুনি একটু দ্বীপ যেন শান্তভাবে ভেসে আছে জলের ওপর, নাকি বুঝি গলে যাচ্ছে রোদ্দুরে তেতে উঠে — সমুদ্রের মধ্য থেকে মাথা উঁচু করা ঐ নিঃসঙ্গ শিলাস্তূপকে মনে হয় নেপ্‌ল্‌স্‌ উপাসাগরের আংটিতে যেন আদরের এক রত্ন।

থাক কেটে কেটে সমুদ্রে নেমে গেছে পাথুরে উপকূল। আঙুরলতা, কমলা, লেবু আর ডুমুর গাছের কালচে পাতায় চাঁচর আর উচ্ছল, ম্যাড়-মেড়ে রূপোলী জলপাই গাছগুলোর সবুজে তা আচ্ছন্ন। সমুদ্রে খাড়া হয়ে নেমে যাওয়া পল্লবের মধ্যে লাল সোনালী আর শাদা ফুলগুলো বন্ধুর মতো হাসে, হলদে আর কমলা রঙের ফলগুলো

দেখে মনে পড়ে যায় কোন এক উষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ রাতের তারার কথা, আকাশটা যখন অন্ধকার, বাতাস জলভেজা।

আকাশ, সাগর আর প্রাণ — সব স্তব্ধ। এই স্তব্ধতার মধ্যে জীবন্ত সবকিছু যে নীরব স্তোত্র প্রেরণ করছে সূর্যদেবের কাছে, ইচ্ছে হয় তা শুনি।

কালো পোশাক-পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী নারী হেঁটে চলে বাগিচাগুলোর মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা হাঁটা পথ ধরে, আলগোছে নামছে পাথর থেকে পাথরে সমুদ্রের দিকে। রোদ্দুরে তার পোশাকের রঙ জ্বলে গিয়ে হয়ে উঠেছে ছোপ ছোপ বাদামী, দূর থেকেও তার ওপর তালিগুলো চোখে পড়ে। মাথা তার অনাবৃত, পাকা চুলগুলো ঝকমক করে রুপোর মতো, ছোটো ছোটো কুণ্ডলে চূর্ণ কুন্তল উড়ে পড়ে তার উঁচু কপালে, রগের পাশে, গালের গাঢ় রঙের চামড়ার ওপর — সে চুল এমন যে আঁচড়িয়ে গুছিয়ে রাখা মুশকিল।

চোখা মুখ চোখ মেয়েটির, কঠোর। এ মুখ একবার দেখলে মনে থেকে যাবে চিরকাল: ঐ বিশুষ্ক মুখখানায় সুপ্রাচীন কী যেন একটা আছে; মেয়েটির কালো চোখের দিকে সোজাসুজি তাকালে আপনা থেকেই মনে পড়বে পূর্বাঞ্চলের আতপ্ত মরুভূমি, দেবোরা আর জুডিথের কথা।

হাঁটতে হাঁটতে মাথা নিচু করে লাল রঙের কিছু একটা বুনে চলে মেয়েটা। ইস্পাতের ক্রুশ কাঁটাটা চক চক করে ওঠে। উলের বল পোশাকের তলে কোথায় লুকানো, মনে হয় যেন লাল রঙের সুতোটা বুঝি বেরিয়ে আসছে সোজা মেয়েটির হৃৎপিণ্ড থেকে। পথটা খাড়াই, গোলমেলে। গড়িয়ে পড়া পাথর নুড়ির খড় খড় শব্দ শোনা যায় মাঝে মাঝে। কিন্তু পাকাচুল মেয়েটি নেমে আসছে এমন নিশ্চিন্তে যে মনে হয় পা দিয়েই সে পথ দেখতে পায় বুঝি।

মেয়েটি সম্পর্কে লোকে যা বলে তা এই: মেয়েটি বিধবা, স্বামী ছিল জেলে, বিয়ের কিছু পরেই লোকটা মাছ ধরতে গিয়ে আর ফেরে নি। পেটে একটি ছেলে নিয়ে মেয়েটি একা পড়ল।

ছেলে হবার পর তাকে ও লুকিয়ে রাখতে লাগল লোকের কাছ থেকে। সব মায়েই তার বাচ্চাকে রাস্তায় আর রোদ্দুরে নিয়ে গিয়ে লোকের কাছে বড়াই চায়, কিন্তু এ সেসব কিছুই করল না। ন্যাতাকানি জড়িয়ে ছেলেটাকে সে রেখে দিত তার কুঁড়ের এক অন্ধকার কোণে। দীর্ঘদিন ধরে পড়শীরা শুধু একটা মস্ত বড়ো মাথা আর হলদে মুখের ওপর নিশ্চল বড়ো বড়ো একজোড়া চোখ ছাড়া শিশুটির গড়ন কেমন তা কিছুই দেখে নি। তারা এও লক্ষ করেছিল যে সুস্থসবল চটপটে এই যে মেয়েটি এতদিন অভাবের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই করে আসছিল বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে, অন্যদেরও মন চাঙ্গা করে তুলতে পারত, সে এখন হয়ে উঠেছে কেমন চুপচাপ, কী যেন ভাবত সবসময়, ভুরু কুঁচকে সবকিছুর দিকে তাকাত কেমন একটা দুঃখের কুয়াশা ভেদ করে, চোখে তার একটা বিচিত্র সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

কিছু দিনের মধ্যেই অবশ্য লোকে তার দুঃখের কারণটা জানতে পারল: ছেলেটি তার জন্মেছে বিকলাঙ্গ; সেই জন্যই সে ছেলেটিকে লুকিয়ে রাখত, এইটেই তাকে পীড়িত করত।

পড়শীরা তখন মেয়েটিকে বললে, বিকলাঙ্গ ছেলের জন্ম দেওয়া মায়ের পক্ষে যে লজ্জার বিষয় সেটা তারা বোঝে, এই দুর্ভাগ্যে তাকে ন্যায় শাস্তি দেওয়া হল কিনা তা মাডোনাই জানেন, কিন্তু সে যাই হোক না কেন, ছেলেটার তো কোন দোষ নেই, খামোকা তাকে রোদ্দুর থেকে সরিয়ে রাখছে সে।

মেয়েটি শুনলে ওদের কথা। তার ছেলেটিকে দেখালে। হাত-পা তার এত ছোটো যেন মাছের পাখনা, সরু নড়বড়ে ঘাড়ের ওপর একটা প্রকাণ্ড ফুলো ফুলো মাথা কোনরকমে লেগে আছে, বুড়ো মানুষের

মতো লোল মুখ, ঝাপসা চোখ আর মস্ত হাঁ-মুখখানা মরণের হাসির মতো প্রসারিত।

দেখে কাঁদতে লাগল মেয়েরা, পুরুষেরা বিতৃষ্ণায় মুখ কুঁচকে গোমড়া মুখে চলে গেল। আর মাটির ওপর বসে বিকলাঙ্গের মা একবার করে মুখ ঢাকলে আর একবার করে মাথা তুলে পাড়া-পড়শীদের দিকে তাকিয়ে থাকল এক দুর্বোধ্য নির্বাক প্রশ্ন নিয়ে।

পাড়ার লোকেরা কফিনের মতো একখানা বাক্স বানিয়ে তাতে পশম আর কম্বলের আঁশ ভরে ওকে রাখলে এই উষ্ণ কোমল বাসার মধ্যে। বাক্সটাকে রেখে দেওয়া হল উঠোনের একটা ছায়ায়। গোপন আশা রইল, অঘটনঘটন-পটীয়সী সূর্য থেকে হয়ত অলৌকিক কিছু একটা ঘটবে।

কিন্তু দিন গেল, সেই প্রকাণ্ড মাথা, দীর্ঘ দেহকাণ্ড আর অসহায় চারটে হাত পায়ের কোন বদল হল না। ছেলেটার হাসিটা শুধু বদলে গিয়ে ক্রমেই একটা অতৃপ্ত লোভের সুস্পষ্ট চেহারা নিলে আর মুখখানা ভরে উঠল বাঁকা বাঁকা ধারালো দুই সারি দাঁতে। নুলো হাতগুলো শিখে গেল রুটির টুকরো ধরে প্রায় নির্ভুলভাবে ওর সেই মস্ত গরম মুখখানার মধ্যে পুরতে।

ছেলেটা ছিল বোবা, কিন্তু লোকে কাছাকাছি খাওয়াদাওয়া করলে গন্ধ ভেসে আসা মাত্র চাপা ব্যা ব্যা জুড়ত ছেলেটা, মস্ত মুখটা হাঁ করে, প্রকাণ্ড মাথাখানা নাড়তে শুরু করত, আর রক্ত-শিরার লাল জালে ছেয়ে যেত চোখের ঘোলা ঘোলা শাদা অংশটা।

বেদম খেত ছেলেটা, যত দিন যায় তত বেশি। ব্যা ব্যা চিৎকারেরও বিরাম ছিল না। মা দিনরাত খাটত, কিন্তু প্রায়ই রোজগার হত সামান্য, কখন সখন একেবারেই না। এর জন্য সে দুঃখ করে বেড়াত না। পড়শীদের সাহায্য নিত অনিচ্ছার সঙ্গে, সর্বদা মুখ বুজে। কিন্তু যখন সে বাড়ি থাকত না তখন ছেলেটার ব্যা ব্যা কান্নায় বিরক্ত হয়ে

পাড়া-পড়শীরা ছুটে যেত উঠোনে, রুটির ছাল, শব্জী, ফল—যা-কিছু খাওয়া সম্ভব সব ঠেসে দিয়ে আসত ওই অপরিতৃপ্ত মুখখানার মধ্যে।

'শীগগিরই ও তোমাকেও খেয়ে শেষ করবে!' ওরা বলত, 'ওকে কোন হাসপাতাল কি আতুর-আশ্রমে দিচ্ছ না কেন?'

গোমড়া মুখে মেয়েটি জবাব দিত, 'আমি ওর জন্ম দিয়েছি, ওকে খাওয়াতেও হবে আমাকেই।'

দেখতে ভালো ছিল মেয়েটি, একাধিক পুরুষ ছিল ওর ভালোবাসা প্রার্থী। কিন্তু কোন ফল হয় নি। ওদের মধ্যে যেটিকে সে অন্যদের চেয়ে বেশি সুনজরে দেখত, তাকে সে বলেছিল:

'তোমার স্ত্রী হওয়া আমার চলবে না। ভয় হয় পাছে আর একটা বিকলাঙ্গ জীবের জন্ম দিয়ে বসি। সেটা তোমার লজ্জার কারণ হবে। না, চলে যাও!'

লোকটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, সব মায়ের প্রতি মাডোনা ন্যায়পরায়ণা, নিজের বোনের মতো দেখেন তাদের। কিন্তু বিকলাঙ্গের মা জবাব দিলে:

'কী পাপ করেছি আমি জানি না, কিন্তু দেখেছ তো কী নিষ্ঠুর শাস্তি!'

লোকটা মিনতি করলে, কাঁদলে, ক্ষেপে উঠল, মেয়েটা তখন বললে:

'না, যাতে বিশ্বাস নেই, সে কাজ করা চলে না। তুমি চলে যাও!'

কোন একটা দূর দেশে চলে গিয়েছিল লোকটা, আর ফেরে নি।

এবং এই ভাবে ঐ অতল মুখগহ্বর, সর্বদা চিবিয়ে চলা ঐ হাঁখানার জন্য মেয়েটি খাদ্য জুগিয়ে চলল বহু বছর। তার মেহনতের ফল সব নিঃশেষে খেয়ে চলল সে, শুষে চলল তার রক্ত, তার জীবন। মাথাখানা তার ক্রমেই বড়ো হতে লাগল, ক্রমেই আরো ভয়ংকর, মনে হত যেন একটা প্রকাণ্ড বেলুন, দুর্বলা নড়বড়ে ঘাড় থেকে যেন যে

কোন মুহূর্তে খসে গিয়ে পথের বাড়িগুলোর কোনা-কানাচে ধাক্কা খেয়ে উড়ে বেড়াবে, আর আলস্যে দুলতে থাকবে এদিক-ওদিক।

বাইরের লোক কেউ দৈবাৎ উঠোনের দিকে তাকালে, অজান্তে থমকে যেত বুঝে উঠতে পারত না কী দেখছে! আঙুরলতায় ছাওয়া দেয়ালের পাশে, পাথরনুড়ির স্তূপের ওপর বাক্সটা বসানো থাকত যেন বলিদানের বেদী; তা থেকে বেরিয়ে আসত মাথাখানা। সবুজের পটে চমৎকার ফুটে ওঠা হলদেটে, আকুঞ্চিত, চোয়াড়ে মুখখানার ওপর আটকে যেত দর্শকের দৃষ্টি। আর যেই তা দেখেছে, তার স্মৃতিতে গেঁথে গিয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসা ভোঁতা চোখদুটো প্যাট প্যাট করে ঘুরত, চমকে চমকে উঠত চওড়া ভোঁতা নাক, অস্বাভাবিক বড়ো বড়ো দুই গণ্ড আর চোয়াল ওঠা-নামা করত, হিংস্র দুই সারি দাঁত বার করে নড়ত লোল ঠোঁট, জ্যানোয়ারের মতো সজাগ দুই প্রকাণ্ড কান মনে হত যেন পৃথক একটা জীবন পেয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে, আর এই গোটা বিকটাকার অবয়বের ওপর নেমে আসত নিগ্রোর মতো অতি কুঞ্চিত কালো চুলের টোপর।

টিকটিকির থাবার মতো ছোটো ছোটো ক্ষুদে ক্ষুদে হাতে কোন একটুকরো খাবার ধরে ছেলেটা মাথা নিচু করত কাঠঠোকরা পাখির মতো, দাঁত দিয়ে টেনে নিত সেটা, সজোরে চিবাত, ফোঁস ফোঁস করত। পেট ভরলে আশেপাশের লোকেদের দিকে তাকিয়ে সর্বদা দাঁত কেলাত ছেলেটা, তারপর চোখদুটো ঠেলে তুলত শিবনেত্রের মতো, অর্ধমৃত এই যে মুখখানার ভাবভঙ্গিতে যেন ফোটে মৃত্যু যন্ত্রণা, তাতে চোখদুটো মিশে যেত অতল একটা ঘোলাটে পোঁচে। খিদে পেলে লম্বা করে দিত ঘাড়খানা, উদ্‌ঘাটিত করত লাল মুখগহ্বর, আর সাপের মতো লক্‌লকে জিভখানা নেড়ে নেড়ে ব্যা ব্যা শুরু করত জেদ ধরে।

এ দৃশ্য দেখে ক্রুশ করে প্রার্থনা শুরু করে দিত দর্শকেরা, চলে

যেত তাড়াতাড়ি, হঠাৎ তাদের মনে পড়ে যেত যত খারাপ তারা দেখেছে, যত দুর্ভাগ্য জীবনে সয়েছে, তার কথা।

রুক্ষ স্বভাবের বুড়ো কামারটা বহুবার মন্তব্য করেছে:

'ঐ সর্বভুক হাঁখানাকে যত দেখি, ততই মনে হয় অমনি একটা কিছুই যেন আমারও শক্তি-সামর্থ্য শুষে খেয়ে নিচ্ছে; আমার ধারণা, সবাই আমরা বাঁচি আর মরি পরগাছাদের জন্যে।'

মূক ওই মুণ্ডখানা সকলের মনেই জাগাত বিষাদ চিন্তা, ভয় ঢুকত বুকে।

বিকলাঙ্গটা সম্পর্কে যে যা বলত, মা তা সব শুনে যেত নীরবে। দ্রুত ওর চুল পেকে যেতে লাগল, মুখ ভরে উঠল বলিরেখায়; হাসতে ভুলে গিয়েছিল সে অনেক আগেই। লোকে জানত, রাত্রে মেয়েটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কার যেন প্রতীক্ষা করত।

ওরা বলাবলি করত, 'অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে কিসের জন্যে?'

'ছেলেটাকে গিয়ে রেখে আয় ওই গির্জার পাশের আঙিনায়!' লোকে পরামর্শ দিলে, 'ওখান দিয়ে বিদেশী লোকেরা রোজ সব আসা-যাওয়া করে। ওকে দেখে প্রতি বার দু'এক পয়সা ছুঁড়ে দিতে আপত্তি করবে না তারা।'

কিন্তু সভয়ে কেঁপে উঠল মা।

বললে, 'অন্য দেশের লোক ওকে দেখবে, সে ভারি ভয়ানক! কী তারা ভাববে আমাদের?'

ওরা বললে, 'গরিব সব দেশেই আছে। সে তো সকলেই জানে!'

আপত্তি করে মাথা নাড়ল মা।

কিন্তু একঘেয়েমির চাপে বিদেশীরা ঢুঁড়ে বেড়াত সবখানে, উঁকি দিয়ে বেড়াত সবারই উঠোনে। এবং স্বভাবতই তারা এই মেয়েটির উঠোনেও এসেছিল একদিন। মেয়েটি বাড়িতেই ছিল, এই সব

অলস লোকগ্নলোর ভোজনতৃপ্ত ম্নখের ওপর বিতৃষ্ণার রেখা ফুটে উঠতে দেখলে সে। শ্ননলে, চোখ কুঁচকে, ম্নখ বেঁকিয়ে ওরা তার ছেলের সম্পর্কে কী বলছে। খোলাখ্নলি ঘেন্না আর বিতৃষ্ণার স্নরে উচ্চারিত কয়েকটা দেমাকী শব্দ ঘা দিল তার ব্নকে।

বিদেশী শব্দগ্নলোকে সে বার বার আউড়ে ম্নখস্থ করে নিয়েছিল। কেননা ওর মনের কাছে, ইতালিয়ান একজন নারী ও মায়ের মনের কাছে ধরা পড়তে বাকি থাকে নি যে কথাগ্নলো অপমানকর। পরিচিত একজন কমিশনারের কাছে গিয়ে সে জিগ্যেস করলে, শব্দগ্নলোর মানে কী।

ভুর্ন কুঁচকে সে বললে, 'কে বলছে তার ওপর নির্ভর করে। এর মানে: 'অন্যান্য রোমান জাতগ্নলোর চেয়েও ইতালি তাড়াতাড়ি মরতে শ্নর্ন করেছে।' এ মিথ্যে কথাটা কোথায় শ্ননলে?'

উত্তর না দিয়ে সে চলে এসেছিল।

পরের দিন তার ছেলে অপর্যাপ্ত খেয়ে খিঁচনি উঠে মারা গেল।

ছেলের প্রাণহীন মাথাটার ওপর একটা হাত রেখে ও বসে রইল আঙিনায় বাক্সটার পাশে, কিসের যেন প্রতীক্ষা করতে লাগল শান্তভাবে, আর ম্নতকে দেখবার জন্য যারা এল তাদের দিকে তাকাতে লাগল সপ্রশ্ন দ্নষ্টিতে। কেউ কথা বললে না, কেউ কোন প্রশ্ন জিগ্যেস করলে না ওকে। অথচ অনেকেই হয়ত তাকে তার দাসত্বের হাত থেকে ম্নক্তির জন্য অভিনন্দন জানাতে চাইছিল, কথা বলতে চাইছিল কিছ্ন সান্ত্বনার, কেননা হাজার হোক, ছেলে মারা গেছে মেয়েটির। কিন্তু কেউ কিছ্ন বললে না। কখনো কখনো লোকে বোঝে, এমন কথা আছে যা প্নরোটা বলা চলে না।

এর পর অনেক দিন ধরে মেয়েটা লোকেদের দিকে তাকিয়ে থাকত, কী একটা যেন জিগ্যেস করতে চায়, তারপর সেও সহজ হয়ে এল সকলের মতোই।

বেইমানের মা

মায়েদের নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই।

কয়েক সপ্তাহ যাবৎ শত্রু-সৈন্যেরা অস্ত্রের নিশ্ছিদ্র লৌহবেষ্টনে অবরোধ করে রেখেছে শহরটাকে। রাত্রে শিবিরাগ্নি জ্বলে, মসীকৃষ্ণ অন্ধকার থেকে লক্ষ লক্ষ লাল চোখে নগর-প্রাচীরের দিকে চেয়ে থাকে আগুন। হিংস্রের মতো সে আগুন জ্বলতেই থাকে। তার শাসানির মতো জ্বলনে বিমর্ষ দুর্ভাবনা জাগত অবরুদ্ধ নগরের অভ্যন্তরে।

নগর-প্রাচীর থেকে দেখা যেত শত্রুর ফাঁস ক্রমেই চেপে বসছে কঠিন হয়ে; চোখে পড়ত আগুনের আশেপাশে চমকাচ্ছে কালো কালো ছায়া, কানে আসত তাগড়াই ঘোড়াগুলোর ডাক, অস্ত্রের ঝনঝন, উচ্চ হাসি আর জয়লাভ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত লোকগুলোর ফুর্তির গান — আর শত্রুর গান আর হাসি শোনার চেয়ে যন্ত্রণাকর আর কী আছে?

শহরের জল সরবরাহ করার মতো যতকটি নদী ছিল, তার সবকটিতে মড়া ফেলেছে শত্রুরা, নগর-প্রাচীরের চারিপাশের আঙুরবাগিচা পুড়িয়ে ছাই করেছে, দলিত করে গেছে শস্যক্ষেত্র,

কেটে নিঃশেষ করেছে ফলের বাগান — সবদিক থেকে নগর এখন শত্রুপক্ষের কাছে উন্মুক্ত। আর প্রায় প্রতিদিন শত্রুপক্ষের কামান আর বন্দুক ঝরিয়ে যেত সীসে আর লোহা।

শহরের সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে যুদ্ধক্লান্ত, অর্ধভুক্ত সৈন্যের এক একটা বাহিনী টহল দিয়ে ফিরত গোমড়া মুখে। ঘরবাড়িগুলোর জানলা থেকে ভেসে আসত আহতদের গোঙানি, বিকারগ্রস্তদের চিৎকার, নারীকণ্ঠের প্রার্থনা আর শিশুদের কান্না। লোকে কথা কইত দমিত অস্ফুট গলায়, কথার মাঝখানে পরস্পরকে থামিয়ে দিয়ে উদ্বেগে কান পাতত: শত্রু এগিয়ে এল নাকি?

জীবন অসহ্য হয়ে উঠত সন্ধ্যে থেকে: যখন স্তব্ধতার মধ্যে আরো স্পষ্ট, আরো প্রচুর শোনা যেত গোঙানি আর কান্না, যখন দূরের পাহাড়টার খাদ বেয়ে শত্রুর ছাউনি আড়াল করে অর্ধভগ্ন প্রাচীরের দিকে চুপি চুপি এগিয়ে আসত নীল-কালো ছায়া, আর পাহাড়ের কালো কালো দাঁতের ওপর তরোয়ালের ঘা খেয়ে হস্তচ্যুত এক ঢালের মতো দেখা দিত চাঁদ।

আর সাহায্যের সম্ভাবনা না দেখে, দিন দিন হতাশ হয়ে, ক্ষুধায় আর পরিশ্রমে কাতর নগরবাসীরা সভয়ে তাকাত সেই চাঁদের দিকে, দাঁতালো শৈলশিরাগুলোর দিকে, খাদের অন্ধকার গহ্বরের দিকে, শত্রুপক্ষের হৈ-হল্লা ভরা শিবিরের দিকে। সবকিছুই মনে করিয়ে দিত মৃত্যুর কথা। সান্ত্বনা পাবার মতো একটা তারাও আকাশে দেখা যেত না।

ঘরে বাতি জ্বালতে সাহস পেত না কেউ, ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত রাস্তাঘাট। আর এই অন্ধকারের মধ্যে আপাদমস্তক কালো পোশাকে ঢাকা একটি নারী মূর্তি নদীর গভীরে মাছের মতো এগিয়ে যেত নিঃশব্দে।

ওকে দেখলে লোকে কানাকানি করত:

'এ সেই না?'

'সেই!'

তারপর নিঃশব্দে লুকিয়ে পড়ত খিলানের নিচে, নয়ত মাথা নিচু করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে যেত তাকে। টহলদার বাহিনীর সেনাপতিরা ওকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিত:

'আবার বেরিয়েছেন, মোনা মারিয়ানা? হুঁশিয়ার! মারা পড়বেন কিন্তু, কে খুন করলে তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না...'

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করত নারী। কিন্তু টহলদার সৈন্যগুলো হয় সাহস পেত না, নয় অস্ত্র তুলতে ঘেন্না হত তাদের। সশস্ত্র লোকেরা ওকে এড়িয়ে চলে যেত যেন সে একটা মড়া। অন্ধকারে সে থেকে যেত, তারপর একলা আবার সে তার স্তব্ধ নিঃসঙ্গ পরিভ্রমণ শুরু করত রাস্তা থেকে রাস্তায় নিঃশব্দে, ছায়ার মতো, যেন নগরের দুর্দশাটারই প্রতিমূর্তি। আর তার চারপাশে যেন তার পিছু নিয়ে এগিয়ে আসত যত আর্ত করুণ শব্দ — গোঙানি, কান্না, প্রার্থনা আর বিজয়ে হতাশ্বাস সৈন্যদের রুক্ষ বিড়বিড়ানি।

নাগরিকা সে এবং মা। ভাবনা তার নিজের ছেলে আর স্বদেশ নিয়ে: যে লোকগুলো এই নগরখানাকে ধ্বংস করে চলেছে তার নেতৃত্বে রয়েছে তারই ছেলে, তারই হাসিখুশি, সুপুরুষ, হৃদয়হীন পুত্র। কিছু দিন আগেও এ ছেলেকে দেখে তার গর্ব হত, মনে হত যেন দেশের জন্য সে ছেলে এক মূল্যবান অর্ঘ্য, যে নগরে, যে বাসায় তার নিজের জন্ম, যে নগরে জন্ম নিয়ে বেড়ে উঠেছে তার ছেলে, সেই নগরের জনগণকে সাহায্যের জন্য এক কল্যাণময় শক্তি। হৃদয় তার শত শত অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এই প্রাচীন পাথরগুলোর সঙ্গে যা দিয়ে সৌধ গড়েছে, প্রাচীর তুলেছে তার পূর্বপুরুষেরা। হৃদয় তার বাঁধা এই মাটির সঙ্গে যেখানে সমাধিস্থ

হয়ে আছে তার আত্মপরিজনের অস্থি, বাঁধা এখানকার লোককথা, গান আর আশার সঙ্গে। মায়ের হৃদয় তার প্রাণপ্রিয় লোকটিকে হারিয়েছে বলে অশ্রুভারাক্রান্ত। মনে মনে সে যেন তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখতে চাইছিল, কোন্‌টা বেশি, পুত্রের জন্য তার স্নেহ নাকি তার জন্মভূমি নগরের জন্য ভালোবাসা? কোন্‌টা বেশি, কোন্‌টা কম তা সে বুঝে উঠতে পারছিল না কিছুতেই।

আর তাই এমনি ভাবেই সে রাত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়াত পথে পথে। চিনতে না পেরে অনেকেই আঁতকে উঠত তাকে, তার কালো মূর্তিটাকে ভাবত বুঝি-বা মূর্তিমতী মৃত্যু, যে মৃত্যু তাদের সকলেরই ভারি কাছে। আর চিনতে পারলে বেইমানের মায়ের কাছ থেকে নিঃশব্দে চলে যেত তারা।

কিন্তু একদিন একটু দূরে নগর-প্রাচীরের পাশে ও দেখল একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একটি মৃতদেহের পাশে — এত নিশ্চল যে মনে হয় যেন এক চাঙর মাটি। নক্ষত্রের দিকে বেদনার্ত মুখখানা তুলে প্রার্থনা করছিল সে। আর প্রাচীরের ওপর নিচু গলায় কথা কইছিল প্রহরীরা, পাথরে লেগে কড়মড় শব্দ হচ্ছিল ওদের অস্ত্রের।

বেইমানের মা জিগ্যেস করলে, 'তোমার স্বামী?'

'না।'

'ভাই?'

'ছেলে। স্বামী মারা গেছে তেরো দিন আগে, আজ গেল আমার ছেলে।'

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিহতের মা বললে বিনীতভাবে, 'মাডোনা সবই দেখছেন, সবই জানেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ!'

প্রথম নারী জিগ্যেস করলে, 'কেন?'

দ্বিতীয়া বললে, 'এখন যখন দেশের জন্যে যুদ্ধ করে সসম্মানে

ও প্রাণ দিতে পারল, এখন বলা যায় ওর জন্যে মনে মনে ভয় ছিল আমার; বড্ডো অগভীর প্রকৃতির ছেলে ছিল ও, বড়ো ভালোবাসত ফুর্তির জীবন, ভয় হত ও হয়ত দেশের প্রতি বেইমানি করবে, যেমন করেছে মারিয়ানার ঐ ছেলে, ঈশ্বরের শত্রু, মানুষের শত্রু, ওই আমাদের শত্রুপক্ষের নেতা, অভিশাপ লাগুক ওকে, আর যে ওকে পেটে ধরেছে তাকেও!..'

মুখ ঢেকে চলে গেলে মারিয়ানা। পরদিন সে নগর-রক্ষীদের কাছে গিয়ে বললে:

'আমার ছেলে তোমাদের শত্রু। তাই হয় আমাকে মেরে ফেলো, নয়ত ফটক খুলে দাও, আমি ওর কাছে চলে যাব...'

ওরা বললে:

'তুমি মানুষ, তোমার কাছেও তোমার দেশ প্রিয় হবার কথা। তোমার ছেলে যেমন আমাদের প্রত্যেকের শত্রু তেমনি তোমারও শত্রু সে।'

'আমি মা। আমি ওকে ভালোবাসি। ও যা হয়ে উঠেছে তার জন্যে আমিও দোষী বলে আমার ধারণা!'

তখন ওরা পরস্পর আলোচনা করে স্থির করলে:

'তোমার ছেলের অপরাধের জন্যে তোমার প্রাণ হরণ করা অনুচিত। আমরা জানি এই ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্যে তুমি তোমার ছেলেকে প্ররোচিত করো নি — তোমার যন্ত্রণা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু জামীন হিশেবে তোমাকে ধরে রাখবারও কোন দরকার দেখছি না, কেননা তোমার ছেলে তোমার জন্যে মোটেই চিন্তিত নয়। ও এক শয়তান, তোমার কথা ও ভুলেই গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তোমার শাস্তি পাওয়া দরকার বলে যদি তোমার ধারণা হয়ে থাকে তবে এই যথেষ্ট শাস্তি! মৃত্যুর চেয়েও এ অবস্থা ভয়ঙ্কর বলে আমাদের ধারণা!'

ও বললে, 'হ্যাঁ, মৃত্যুর চেয়েও এটা ভয়ঙ্কর।'

ওর জন্য ওরা ফটক খুলে নগর ছেড়ে চলে যেতে দিল ওকে। ওর ছেলে যে রক্ত ঝরিয়েছে তাতে স্বদেশ আজ রক্তাক্ত। এই স্বভূমি ছেড়ে ও চলেছে, প্রাকারের ওপর থেকে ওরা তা দেখলে তাকিয়ে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে হাঁটছিল ও, দেশ ছেড়ে চলে যেতে ওর পাদুটো যেন চাইছিল না। নগর রক্ষা করতে গিয়ে যারা মারা পড়েছে সেই সব মৃতদেহের উদ্দেশে মাথা নোয়ালে সে। ভাঙা একটা হাতিয়ারে ল্যাথি মারলে ঘেন্নায়, কারণ যাতে জীবন রক্ষা পায় এমন হাতিয়ার ছাড়া আক্রমণের সব হাতিয়ারই মায়েদের কাছে ঘৃণার বস্তু।

ও হাঁটছিল এমনভাবে যেন ওর পরিচ্ছদের তলে এক পাত্র পবিত্র জল বহন করে নিয়ে চলেছে, ভয় পাচ্ছিল বুঝি তা ছলকে পড়বে। নগর-প্রাচীর থেকে যারা ওকে লক্ষ্য করছিল তাদের চোখে ওর মূর্তিটা ক্রমেই ছোটো হয়ে আসতে লাগল। ওদের মনে হল, ঐ মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে হতাশা আর নৈরাশ্যও যেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে ওদের।

ওরা দেখলে, মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে থামল নারী, তারপর মাথার আবরণ ফেলে দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল নগরের দিকে। আর ওদিকে, শত্রুশিবিরের লোকেরা দেখল মাঠের মধ্যে ও একা, ওরই মতো কালো কালো কয়েকটা মূর্তি তাড়াহুড়া না করে সন্তর্পণে এগিয়ে এল ওর দিকে।

এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলে কে সে, কোথায় যাচ্ছে।

'তোমাদের অধিনায়ক আমার ছেলে' — ও বললে, এবং একজন সৈনিকও সে কথা অবিশ্বাস করল না। ওর সঙ্গে সঙ্গে যেতে যেতে ওরা তার পুত্রের প্রশংসা করতে লাগল, বললে কি রকম বুদ্ধিমান,

কি রকম সাহসী সে। একটুও অবাক না হয়ে সগর্বে মাথা তুলে ও শুনে গেল, কেননা ওর ছেলের এই রকমটাই হওয়া উচিত!

তারপর অবশেষে ও গিয়ে দাঁড়াল সেই তার কাছে যাকে সে চেনে তার জন্মের নয় মাস আগে থেকে, যাকে সে কখনো তার নিজের হৃদয় থেকে আলাদা করে দেখতে পারে নি। রেশম আর মখমলের পোশাকে সে তারই সামনে দাঁড়িয়ে, বহুমূল্য মণিতে খচিত তার অস্ত্র। যা হওয়া দরকার সবকিছুই ঠিক তেমনি, ঠিক এই মূর্তিতেই ও বহুবার তার ছেলেকে দেখেছে স্বপ্নে — ঐশ্বর্যশালী, খ্যাতনামা, জনপ্রিয়!

মায়ের হাত চুম্বন করে ছেলে বললে, 'মা, তুমি আমার কাছে এসে গেছ, তাহলে বুঝতে পেরেছ আমাকে, আর ভাবনা নেই, কালই ওই অভিশপ্ত নগরখানা আমি দখল করছি!'

'যে নগরে তোর জন্ম' — ও মনে করিয়ে দিল ছেলেকে।

ক্ষমতায় মাতাল, আরো গৌরবের আশায় উন্মাদ তার ছেলে যৌবনের উদ্ধত স্পর্ধায় জবাব দিলে:

'আমি জন্মেছি দুনিয়ার বুকে, দুনিয়ার জন্যে, তাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দেব বলে! এ নগরকে আমি এত দিন কৃপা করেছি তোমার জন্যে — কাঁটার মতো এ নগরটা আমায় বিঁধে আছে, এর জন্যেই ঠেকে আছে আমি যা চাই আমার তেমন সব গৌরব। কিন্তু কালই এই নির্বোধ গোঁয়ারের বাসা আমি চূর্ণ করছি!'

'যেখানে প্রত্যেকটি পাথর তোকে ছেলেবেলা থেকে জানে, ছেলেবেলা থেকে মনে করে রেখেছে' — মা বললে।

'মানুষ যদি পাথরকে দিয়ে কথা না বলায়, তাহলে পাথর তো বোবা। আমার কথা বলুক পাহাড়-পর্বত, এই আমার ইচ্ছা!'

'কিন্তু লোকেরা?' জিগ্যেস করলে মা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকেদের কথাও আমি ভুলি নি, মা! তাদেরও আমার চাই, কেননা লোকের স্মৃতিতেই বীরেরা অমর!'

মা বললে:

'সেই বীর, যে জীবন গড়ে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে, যে জয় করে মৃত্যুকে...'

ও আপত্তি করে বললে, 'না! নগর যে ধ্বংস করে সেও নগরস্রষ্টার মতোই বিখ্যাত। দ্যাখো, রোম কে গড়েছে আয়েনিয়াস না রোমুলাস্ তা আমরা জানি না — কিন্তু রোম যারা ধ্বংস করেছিল সেই আলারিহ আর অন্যান্য বীরদের নাম আমরা ভালো করেই জানি...'

'সব নামের চেয়েও বেঁচে আছে যে রোমের নাম' — মা মনে করিয়ে দিলে ছেলেকে।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই ভাবেই কথা কইলে তারা; ছেলের উন্মত্ত ভাষণে ক্রমেই কম বাধা দিলে মা, ক্রমেই নিচু হয়ে এল তার গর্বিত শির।

মায়ের কাজ সৃষ্টি করা, রক্ষা করা। তার কাছে ধ্বংসের কথা বলার অর্থ মায়ের বিরুদ্ধেই কথা বলা। কিন্তু ছেলে সে কথা বোঝে নি, বোঝে নি যে সে মায়ের জীবনের অর্থটাই খণ্ডন করছে।

মা সর্বদাই মৃত্যুর প্রতিবাদী; যে হাত সংসারে মৃত্যু টেনে আনে সে হাত মায়েদের কাছে ঘৃণ্য, বর্জনীয়। কিন্তু ছেলের নজরে তা পড়ল না, কেননা সে অন্ধ সেই যশের তুহিন ঔজ্জ্বল্যে, যা হৃদয়কে হত্যা করে।

এও তার জানা ছিল না, যে-জীবন মা সৃষ্টি করে, ধারণ করে, যখন প্রশ্ন আসে সেই জীবনকে নিয়েই, তখন যেমন নির্ভীক তেমনি চতুর ও নির্মম এক পশু হয়ে উঠতে পারে মা।

মাথা নিচু করে বসে রইল মা, আর অধিনায়কের ঐশ্বর্যমণ্ডিত শিবিরের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল সেই নগরকে, যেখানে সে প্রথম তার নিজের মধ্যে অনুভব করেছিল একটা জীবনের মধুর স্পন্দন, অনুভব করেছিল তার সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা, আর সেই সন্তানই কিনা আজ ধ্বংসের নেশায় পাগল।

সূর্যের লাল আলোয় নগরের প্রাচীর আর মিনার রাঙা হয়ে উঠেছে রক্তের মতো; জানলার শার্সিগুলোতে জ্বলছে আক্রোশ। সমস্ত শহরটাকেই মনে হচ্ছে আহত, তার শত শত ক্ষতমুখ থেকে ঝরছে রক্তিম প্রাণরস। সময় কাটল, শহরটা শবদেহের মতো কালো হয়ে উঠল আর অন্ত্যেষ্টি দীপের মতো জ্বলতে লাগল মাথার ওপরকার তারা।

মা দেখলে সেই অন্ধকার ভবনগুলিকে, শত্রুর চোখে পড়ার ভয়ে যেখানে লোকে বাতি জ্বালাতে সাহস পায় না, দেখলে রাস্তাগুলোকে অন্ধকারে ঢাকা, শবদেহের পূতিগন্ধে ভরা, কানে এল মৃত্যু-প্রতীক্ষু মানুষগুলোর ত্রস্ত ফিসফাস কথা — এই সব কিছু দেখলে সে, তার অতি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় এই সবকিছু যেন নির্বাক হয়ে তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে, নিজ নগরের সমস্ত লোকের মা বলে তার মনে হল নিজেকে।

কালো পাহাড়ের চুড়ো থেকে মেঘ নেমে এল উপত্যকায়, মৃত্যু-দণ্ডিত নগরটার ওপর সে মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল একদল পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো।

ছেলে বললে, 'রাতটা যদি বেশ অন্ধকার হয়ে যায়, তাহলে আজ রাতেই আক্রমণ করা যাবে! চোখের ওপর যখন রোদ এসে পড়ে, তখন হত্যা করা মুশকিল। অস্ত্রের ঝকমকে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়ে মার ফসকিয়ে যায় অনেক' — তরোয়ালটা পরখ করতে করতে ছেলে মন্তব্য করলে।

মা বললে:

'আয় খোকা, আমার বুকে মাথা দিয়ে একটু শো। মনে করে দ্যাখ দিকি, ছেলেবেলায় কিরকম হাসিখুশি ছিলি তুই, কিরকম মায়াদয়া ছিলি। সকলে তোকে কী ভালোই না বাসত...'

ছেলে মার কথা শুনে তার দিকে নতজানু হয়ে চোখ বুজলে। বললে, 'আমি ভালোবাসি শুধু যশ আর তোমাকে, কারণ আমি যা তেমনটার জন্ম দিয়েছ তুমি।'

'আর মেয়েদের ভালোবাসিস না তুই?' ছেলের ওপর ঝুঁকে জিগ্যেস করলে মা।

'মেয়েরা সংখ্যায় অনেক, চট করেই ক্লান্তি লাগে, বড়ো বেশি সুমধুরে যেমন ক্লান্তি এসে যায়।'

'ছেলে চাস না তুই?' শেষ বারের মতো জিগ্যেস করলে মা।

'কী হবে ছেলেতে? শেষ পর্যন্ত নিহত হবে এই জন্যে তো? আমার মতো কারো হাতে তারা মারা পড়বে শুধু শুধু, তাতে কষ্ট হবে আমার, অথচ বুড়ো বয়সে দুর্বল শরীরে তার কোন প্রতিশোধও নিতে পারব না।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা বললে, 'তুই সুপুরুষ, কিন্তু বিদ্যুতের ঝলকের মতোই তুই নিষ্ফল।'

'ঠিক, আমি বিদ্যুতের মতোই...' ছেলে জবাব দিলে হেসে। আর মায়ের কোলে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তারপর তার গায়ের কালো পোশাকটায় ছেলেকে ঢেকে মা তার বুকে বসিয়ে দিলে ছোরাখানা। কেঁপে উঠে তক্ষুনি মারা গেল তার ছেলে, ছেলের বুকটা কোথায় স্পন্দিত হচ্ছে তা সে জানত ভালোই। তারপর বিমূঢ় প্রহরীদের পায়ের কাছে নিজের কোল থেকে ছেলের শবদেহ ফেলে দিয়ে নগরের দিকে তাকিয়ে সে বললে:

'মানুষ হিশেবে দেশের জন্যে আমি যা পেরেছি তা করেছি;

মা হিশেবে আমার জায়গা ছেলের সঙ্গে। আর একটি সন্তান প্রসব করার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে — আমার জীবনে কারো আর দরকার নেই।'

ছেলের রক্তে — তারই রক্তে ছোরাখানা তখনও তপ্ত। সে-ছোরা সে তার নিজের বুকে বসিয়ে দিলে দৃঢ়ভাবে, এবারও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না, কেননা হৃদয় ব্যথা করলে হৃৎপিণ্ড খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

মাঝির শেষ উপদেশ

ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

জলপাই গাছগুলোর ঘন পল্লবের সঙ্গে যেন হাজার হাজার তার টান করে বাঁধা। শক্ত পাতাগুলো নড়ছে বাতাসে, পাতাগুলোর ছোঁয়া লাগছে সেই তারগুলোয়, আর এই অবিরাম মৃদু স্পর্শে বাতাস ভরে উঠছে এক মাতিয়ে তোলা তপ্ত ঝংকারে। তখনো ঠিক সঙ্গীত নয় তা, তবু মনে হয় যেন অদৃশ্য হাতে কারা শত শত আশ্চর্য বীণায় সুর বাঁধছে, আর সারাক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কখন এ সুর বাঁধার পালা শেষ হয়ে সূর্য, আকাশ আর সমুদ্রের উদ্দেশে এক জয়জয়ন্তী স্তোত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠবে তারযন্ত্রের বিপুল অর্কেস্ট্রায়।

বাতাস বইছে, দুলিয়ে দিয়ে চলেছে গাছগুলোকে, তাদের চুড়োগুলোকে ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে পাহাড় থেকে সমুদ্রে। শিলাতটের ওপর তালে তালে আছড়ে পড়ছে চাপা তরঙ্গভঙ্গ; সমুদ্র ভরে উঠেছে শাদা শাদা সজীব ছোপে — মনে হয় যেন অসংখ্য পাখি ঝাঁক বেঁধে এসে উড়ে বসেছে তার নীল বুকের ওপর। সবাই তারা ভেসে চলেছে একই দিকে, জলের গভীরে ডুব দিয়ে উধাও হয়ে

খাচ্ছে, তারপর অস্ফুট কলরবে জেগে উঠছে আবার। আর যেন তাদের পেছনে ডেকে ধূসর দুটো পাখির মতোই চক্রবালে দুলছে তিনপাল্লা পাল তোলা দুটো জাহাজ। বহুকাল আগের এক অর্ধবিস্মৃত স্বপ্নের মতো সমস্ত দৃশ্যটা কেমন অবাস্তব।

'রাতের দিকে জবর একখান ঝড় উঠবে!' বলে এক বুড়ো জেলে, নুড়ি ভরা ছোটো একটা সৈকতে সে বসে আছে শিলাখণ্ডের ছায়ায়।

ঢেউয়ের তোড়ে গোছা গোছা বাদামী, হলুদ আর সবুজ রঙের ঝাঁঝালো সমুদ্রগুল্ম ভেসে এসে পড়েছে তটের ওপর, রোদে আর গরম পাথর নুড়িগুলোর মধ্যে তা শুকিয়ে উঠছে, লোনা বাতাস ভরে উঠেছে আইওডিনের কড়া গন্ধে। সৈকতে একের পর এক ছুটে আসছে আকুঞ্চিত ঊর্মিমালা।

বুড়োটাকে দেখায় পাখির মতো — ছোটোখাটো শুকনো মুখ, শুকচঞ্চু নাক আর চামড়ার কালো ভাঁজের তলে অদৃশ্য গোল চোখ, কিন্তু নিঃসন্দেহেই খুবই তীক্ষ্ম হবার কথা। হাতের শুকনো গিঁটগিঁট আঙুলগুলোয় বিশেষ নড়নচড়ন নেই।

বুড়োটা কথা বলে তরঙ্গের মর্মর আর ঝিঁঝির ডাকের সাথে সঙ্গতি রেখে। বলে, 'সে প্রায় পঞ্চাশ বছর হল সিনোর, সেটাও ছিল এমনি ঝংকার তোলা ফুর্তির দিন, সবকিছুই যেন হাসছে, গাইছে, আমার বাপের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ, আমার ষোলো, প্রেমে পড়েছি, রোদের দেশে ষোলো বছরের ছেলের পক্ষে ওটা না হয়ে যায় না।

'বাপ বললে, 'চল গুভিদো, পেৎসনি মাছ ধরা যাক।' পেৎসনি হল ভারি সুস্বাদু এক মাছ সিনোর, গোলাপী রঙের পাখনা, প্রবাল মাছও ওদের বলা হয়, কেননা প্রবাল-পানার একেবারে গভীরে ওদের পাওয়া যায়। ধরতে হয় নৌকো নোঙর ফেলে ভারি টোপের বঁড়শি দিয়ে। সুন্দর দেখতে মাছগুলো।

'তা আমরা তো চললাম, বেশ ভালোমতো মাছ ধরা যাবে এই

আশা। আমার বাপ ছিল বেশ শক্ত-সমর্থ জেলে, সাত ঘাটের জল খাওয়া লোক। কিন্তু কিছু আগে অসুখে পড়েছিল, বুকে ব্যথা ধরেছিল, আঙুলগুলো বেঁকে গিয়েছিল বাতে—জেলেদের ঐ এক অসুখ।

'এই যে এখন ডাঙ্গা হতে বাতাসটা বইছে বেশ সোহাগ করে, সমুদ্রের দিকে আস্তে করে ঠেলে ঠেলে দিতে চাইছে, এ কিন্তু ভারি খারাপ বাতাস সিনোর, ভারি সেয়ানা। পিছে হতে চুপি চুপি এসে তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের ওপর যেন ওর কিছু একটা ক্ষতি করেছি আমরা। নাও একেবারে উড়িয়ে লিয়ে যাবে বাতাসে, মাঝে মাঝে এমন হবে কি যে নাও উল্টে গেল আর আমি পড়ে রইলাম জলে। এমন এক মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে ব্যাপারটা যে দুটো গাল পাড়বে কি ভগবানের নাম লিবে, তারও সময় পাওয়া যাবে না — একেবারে হোই দূরে গিয়ে ফেলবে তোমাকে উল্টো পাল্টা করে। এই হাওয়াটার চেয়ে ডাকাতরাও অনেক সাঁচ্চা সিনোর, কিন্তু ঝড়ঝাপটার চেয়ে মানুষ তো চিরকালই অনেক সাঁচ্চা।

'ডাঙ্গা হতে আমরা চার কিলোমিটার দূরে, মানে কাছেই আছি ওই দেখছেন তো, এমন সময় এমনি বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর, একেবারে আচমকা, ভীরু শয়তানের মতো।

'বাঁকাচোরা হাত দিয়ে দাঁড় চেপে ধরে বাপ চিৎকার করে বললে, 'গুভিদো! সামলে গুভিদো! জলদি—নোঙর তোল!'

'আমি নোঙর তুলছি ইদিকে বাপের হাত হতে ছিটকে গেল দাঁড়টা, আর বুকের ওপর এমন ধাক্কা মারলে সেটা যে অজ্ঞান হয়ে নেতিয়ে পড়ল একেবারে নাওয়ের তলায়। বাপকে গিয়ে তুলব এমন সময়ও আমার নেই, কেননা তখন নাও এই ডোবে কি সেই ডোবে। প্রথমটা একেবারে সব ঝটপট, দাঁড় যখন ধরলাম, ততক্ষণে আমাদের কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লেগেছে, চারপাশ হতে এসে পড়তে

লেগেছে জলের ছিটে, ঢেউয়ের মাথাগুলো উড়িয়ে দিয়ে আমাদের ওপর জল ছিটাতে লাগলে বাতাস, পুরুতে যেমন করে জল ছিটোয় তবে তার চেয়েও বেশি তেজে, আর মোটেই পাপ খণ্ডাবার জন্যে নয়।

'জ্ঞান পেয়ে তীরের দিকে চেয়ে বাপ বললে, 'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার রে বেটা! চলবে অনেকখন রে।'

'কাঁচা বয়স হলে বিপদকে বিপদ বলে সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। আমি জান কবুল দাঁড় বাইতে লাগলাম, বিপদ হলে মাঝির যা যা করা দরকার সব করতে লাগলাম আমি, কিন্তু — ঝড় তো নয় হিংস্র দানোর নিঃশ্বাস — ভদ্রতা করে তোমার চারপাশে তারা তো তখন হাজারো কবর খুঁড়তে লেগেছে, বিনা পয়সায় শোনাতে লেগেছে ইষ্টনাম।

'বাপ মুচকে হেসে মাথা হতে জল ঝেড়ে ফেলে বললে, 'চুপ মেরে বসে থাক গুভিদো, দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে সমুদ্দুর খুঁচিয়ে লাভ কি? গায়ের শক্তি খরচ করিস না এখন, নইলে বাড়ি আর ফিরে যেতে হবে না।'

'সবুজ সবুজ ঢেউয়ে আমাদের ক্ষুদে নাওখানাকে নিয়ে ছোড়াছুড়ি করতে লাগল যেন ছেলের হাতে বল। পাশ হতে এসে উঁকি দেয় আমাদের নাওয়ে, মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে গর্জায়, ঝাঁকায়। এই নামছি একেবারে খাদের নিচে, এই ঠেলে উঠছি একেবারে ঢেউয়ের শাদা শাদা চুড়োর মাথায়। আর ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল ডাঙ্গা, সে ডাঙ্গাও যেন নাচছে আমাদের নাওয়ের মতন।

'তখন বাপ আমাকে বললে, 'তুই হয়ত ডাঙ্গায় ফিরবি, কিন্তু আমি আর না! মাছ আর কাজ নিয়ে যা বলছি শুনে রাখ এই বেলা...'

'আর আমার বাপ তো বলতে লাগল কোন্ মাছের কী ধরন, কোথায় কখন তাদের ধরা যায় ভালো — এই সব যা জানত।

'আমাদের অবস্থাটা যে কাহিল তা যখন বুঝলাম, বাপকে বললাম, 'ভগবানের নাম নেওয়াই বরং ভালো এখন, না বাবা?' আমরা যেন তখন দুটি খরগোশ, আর চারপাশে ঘিরে ধরেছে একপাল শাদা শাদা শিকারী কুকুর, দাঁত বার করছে।

'বাপ বললে, 'ভগবান সবই জানেন! তিনি তো দেখছেনই যে ডাঙ্গার জন্যে গড়া মানুষগুলো এখন সমুদ্দুরের মধ্যে মরতে চলেছে, ওদের মধ্যে একজনের তো বাঁচার কোনো আশাই নাই, তাই তার যা কিছু জ্ঞান তা এখন ছেলেকে দিয়ে যাওয়া তার উচিত। কাজটা যে দরকার এ দুনিয়ার জন্যে, মানুষের জন্যে। ভগবান তা বোঝেন...'

'মাছ সম্পর্কে যা কিছু জানা ছিল বাপের তা সব যখন বলা হয়ে গেল, তখন বলতে লাগল লোকেদের সঙ্গে কি ভাবে থাকা দরকার।

'আমি বললাম, 'আমাকে শেখাবার এই কি সময়? ডাঙ্গায় থাকতে তো এসব শেখাতে যাও নি?'

''ডাঙ্গায় যে কখনো এত কাছে মরণ টের পাই নি রে।'

'বুনো জানোয়ারের মতো বাতাস গজরাচ্ছে, ঢেউ আছড়াচ্ছে, আমি যাতে শুনতে পাই তার জন্যে বাপকে কথা কইতে হচ্ছে চিৎকার করে:

''সর্বদা এমনভাবে চলবি যেন তোর চেয়ে ভালো কেউ নেই, খারাপও কেউ নেই — সেই হবে ন্যায্য! খানদানী বলো আর জেলেই বলো, পুরোহিতই বলো আর সেপাই বলো — এসবই হল একই দেহ। সবার মতো তুইও এই দেহের দরকারী অঙ্গ। কখনো এই ভেবে লোকের কাছে যাবি না, যে ওর মধ্যে খারাপটা বেশি ভালোটা

কম। ধরে নিবি ওর মধ্যে ভালোটাই বেশি, দেখবি আসলেও তাই! লোকের কাছ থেকে যে-রকম চাওয়া হয়, লোকে দেয়ও তেমনি।'

'এই সব কথা সে যে এক লহমায় বলে গিয়েছিল তা অবিশ্যি নয় তবে, ওই যেমন হুকুমের মতো। ঢেউয়ের নাগর দোলায় তখন আমরা এই ডুবছি, এই উঠছি। জলের ছিটের মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম কথাগুলো। অনেক কথা আমার কান পর্যন্তও পেঁছয় নি, বাতাসে ভেসে গিয়েছিল, অনেক কথা আমি বুঝিও নি, কেন না মরণ সামনে রেখে কখনো বিদ্যে শিক্ষে করা যায়, সিনোর? ভয় ধরে গিয়েছিল আমার, সমুদ্দুরকে এমন ক্ষেপা আমি আগে কখনো দেখি নি, অমন অসহায় আর কখনো লাগে নি আমার। তখন নাকি পরে, যখন ঐ সময়টার কথা মনে মনে ভেবেছি কখন কে জানে, মনের এমন একটা ভাব হয়েছিল যা আজও গেঁথে আছে কলজেয়।

'বাপের চেহারা আমার এখনো চোখে ভাসছে, নাওয়ের নিচেতে বসে আছে বাবা, বাতে আড়ষ্ট দু'হাত বাড়িয়ে ধরে আছে নাওয়ের দুই পাশ, মাথার টুপিখানা উড়ে গেছে, আর এই ডাইনে নেমে, এই বাঁয়ে থেকে, এই সামনে থেকে, এই পেছন হতে বাপের ঘাড়ে আর মাথায় ঢেউ ভেঙে পড়ছে, আর প্রতিবার বাপ মাথা ঝাঁকিয়ে নাক ঝাড়া দিয়ে থেকে থেকে চিৎকার করে বলে চলেছে আমায়। ভিজে একেবারে একশা হওয়ায় মনে হচ্ছিল যেন দেহখানাও তার ছোটো হয়ে গিয়েছে, আর বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে চোখদুটো ভয়ে, কিংবা হয়ত-বা যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাই হবে বোধ হয়।

'চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাপ বলে, 'শোন! এই, শুনতে পাচ্ছিস?'

'মাঝে মাঝে আমিও জবাব দিই, 'শুনতে পাচ্ছি!'

''মনে রাখিস, যা-কিছু মঙ্গল তা আসে মানুষের কাছ থেকে।'

'আমি বলি, 'বেশ, মনে রাখব!'

'ডাঙ্গার ওপর কখনো বাপ এমন করে আমার সাথে কথা কয় নি।

হাসিখুশি লোক ছিল বাপ, বুকে দয়ামায়া ছিল কিন্তু আমার সঙ্গে ব্যবহার করত যেন খানিক রগড় করে। ভরসা করত না আমাকে, যেন আমি তার কাছে তখনও একটা বাচ্চা। মাঝে মাঝে এতে রাগ হত আমার, কেননা জোয়ান বয়স তো অহংকারী।

'বাপের এই চিৎকারে আমার ডর কমে গিয়েছিল — হয়ত সেই জন্যে এই সবকিছু আমার এত স্পষ্ট করে মনে রয়ে গেছে।'

বুড়ো জেলে চুপ করে গেল, চেয়ে রইল শাদাটে সমুদ্রের পানে। তারপর একটু হেসে চোখ মটকে বলে চলল:

'ঢের লোকজন দেখেছি তো, তাই জানি সিনোর, মনে থাকা মানেই বোঝা, আর যত বুঝবে, ততই মঙ্গল চোখে পড়বে মানুষের মধ্যে — খাঁটি কথা বলছি, সিনোর!

'তা আমার বাপের সেই স্নেহময় ভেজা মুখখানা আমার মনে রয়ে গেছে, বড়ো বড়ো চোখদুটো আমার দিকে গম্ভীরভাবে সস্নেহে এমন করে তাকিয়ে আছে যে আমি তখনই বেশ টের পেয়েছিলাম, সেদিন আমার মরণ নেই কপালে। ভয় লাগছিল আমার কিন্তু জানতাম বেঁচে যাব।

'আমাদের নাওখানা অবশ্য শেষ পর্যন্ত উল্টেই গিয়েছিল। দু'জনেই আমরা টগবগে জলের মধ্যে ফেনায় কানা হয়ে যাবার যোগাড়, ঢেউ ছুঁড়ে ফেলছে আমাদের, ধাক্কা খাচ্ছি নাওয়ের গলুইয়ের সঙ্গে। বাঁধার মতো যা ছিল তাই দিয়ে তো আগেই নৌকার কানার সঙ্গে বেঁধে নিয়েছিলাম শক্ত করে, দড়ি ধরে রাখলাম হাতে। যতক্ষণ ও দড়ি ধরার শক্তি থাকছে ততক্ষণ নাও থেকে বেশি দূরে আমাদের নিয়ে ফেলতে পারবে না। কিন্তু জলে ভেসে থাকাই মুশকিল। বাপ আর আমি এক-একবার গিয়ে ধাক্কা খেল্যাম নৌকার পেটের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাদের। সবচেয়ে মুশকিল হল এই যে মাথা বোঁ বোঁ করতে

লাগল, চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, জল ঢুকছে চোখে কানে, গাদা গাদা জল গিলছি কেবল।

'এমনি চলল অনেকক্ষণ, প্রায় ঘণ্টা সাতেক, হঠাৎ ঝড়ের টান ঘুরে গেল, ঘুরে গিয়ে তোড়ে বইতে লাগল তীরের দিকে, আর ডাঙ্গার পানে জোরে ভেসে যেতে লাগলাম আমরা।

'খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'চেপে ধরে থাকো!'

'বাপও চিৎকার করে কী যেন বললে, কিন্তু আমার কানে এল শুধু একটা শব্দ:

''...আছড়ে ভাঙবে!'

'বাপ ভাবছিল তীরের পাথরগুলোর কথা। কিন্তু সেসব তখনো অনেক দূরে, আমি ওর কথায় কান দিলাম না। কিন্তু আমার চেয়ে বাপের জ্ঞান ছিল বেশি, পাহাড়-প্রমাণ জলের মধ্য দিয়ে আমরা ভেসে চলেছি, গা হাত পা অসাড় অসহায়, শামুকের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছি নৌকার খোলখানা, আর বেদম ধাক্কা খাচ্ছি তার সঙ্গে। এমনি করেই চলল অনেকক্ষণ। কিন্তু যখন তীরের কালো তট চোখে পড়ল তখন থেকে সবকিছুই ঘটে গেল যেন মুহূর্তে। দুলতে দুলতে সেই তট যেন জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তেড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। এক বার, দুই বার ফেনিল তরঙ্গে আমাদের দেহগুলোকে আছড়ে ফেললে, আমাদের নাওখানা থেকে যেন বুটের তলায় বাদাম ভাঙার মতো শব্দ উঠল মড়মড়, দাঁড় হাতছাড়া হয়ে আমি দেখলাম ছুরির ফলার মতো পাথরগুলোর কালো কালো ভাঙা পাঁজরা, দেখলাম আমার অনেক উঁচুতে বাপের মাথাখানা, তারপর দানোর ওই নখগুলোর ওপরে। এক ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা বাদে বাপকে লোকেরা খুঁজে পায়, তখন তার পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে, মাথার খুলি ভাঙা, একেবারে ঘিলু পর্যন্ত। মাথাটা তার হাঁ হয়ে গিয়েছিল, জলের তোড়ে

কিছুটা ঘিলু আগেই ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু আমার এখনো মনে আছে, জখমের মধ্যে ছাই ছাই রঙের ঘিলুগুলোর মধ্যে লাল লাল শিরা, মনে হচ্ছিল যেন ফেনা কিংবা শ্বেত পাথরের সঙ্গে রক্ত। লাসটা তার ভয়ানক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, সব দলামোচড়া কিন্তু মুখখানা ছিল বেশ শান্ত ছিমছাম, চোখদুটো সবখানি বোঁজা।

'আমি? হ্যাঁ, আমিও ভয়ানক থেঁতলানি খেয়েছিলাম। লোকে যখন আমাকে ডাঙ্গায় টেনে তুলল তখন আমার জ্ঞান নেই। আমাল্‌ফি ছাড়িয়ে ঢের দূরে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম, বিভ্রুই, তবে নিজেদেরই লোক বৈ কি—ওরাও জেলে, এরকম ঘটনায় ওদের অবাক লাগে না, বরং সদয় হয়ে ওঠে। যারা বিপদ নিয়ে ঘর করে তারা চিরকালই খুব সদয়!

'মনের মধ্যে যেমন লাগে বাপ সম্পর্কে তেমন করে বলতে পারলাম না নিশ্চয় — একান্ন বছর ধরে বুকের মধ্যে যা ধরে রেখেছি তা বোঝাতে হলে আলাদা এক রকমের ভাষা দরকার, দরকার বোধ হয় গানেরই। কিন্তু আমরা হলাম ঠিক মাছের মতোই সাধাসিধে, যে-রকম সুন্দর করে কথা কইবার ইচ্ছা আমাদের, তা পারি না। যেটুকু মুখে বলতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশি আমরা জানি, অনেক বেশি আমরা টের পাই।

'বড়ো কথাটা হল এই, আমার বাপ তখন মরণের সামনে দাঁড়িয়ে জানছে যে তার নিস্তার নেই, তবু ভয় পেলে না, আমার কথা, তার ছেলের কথা ভুললে না সে; আমার যা জানা দরকার বলে তার মনে হয়েছিল সবকিছু আমাকে জানিয়ে যাবার মতো সময় আর শক্তি করে নিয়েছিল সে। সাতষট্টি বছর আমার বয়স, আমি বলতে পারি, সে সময় বাপ যা যা বলেছিল, তার সব কথা সত্যি।'

যে টুপিটার রঙ এককালে লাল ছিল কিন্তু এখন বাদামী হয়ে গেছে হাতে বোনা সেই টুপিটা মাথা থেকে খুলে নিলে বুড়োটা, তার

ভেতর থেকে পাইপ বার করলে, তারপর ব্রোঞ্জ রঙের নগ্ন করোটি নুইয়ে বললে জোর দিয়ে:

'এর সব কথা সত্যি গো, সিনোর! লোককে যেমন দেখতে চাইবেন, তারা ঠিক তেমনি। তাদের দিকে যদি দয়ামায়া নিয়ে তাকান, তাহলে তাদেরও মঙ্গল আপনারও মঙ্গল! তারাও ভালো হয়ে উঠবে আপনিও ভালো হয়ে উঠবেন! সোজা কথা, না কি বলেন সিনোর?'

ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছিল বাতাসের, উঁচু তীক্ষ্ণ আর ফেনিল হয়ে উঠছিল ঢেউগুলো। সাগরে বেড়ে উঠল পাখির ঝাঁক, তাড়াহুড়ো করে তারা ছুটে চলেছে দূরে আরো দূরে। তিনপাল্লা পাল তোলা জাহাজদুটো চক্রবালের নীল রেখার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেছে তখন।

দ্বীপখানার খাড়া তটভূমি ফেনিল, হল্লা করে আছড়ে পড়ছে নীল জল, আর অক্লান্ত, উদগ্র ডেকে চলেছে ঝিঁঝিঁ।

বিচার

যেদিন এটা ঘটে, সিরক্কো বাতাস বইছিল সেদিন, আফ্রিকা থেকে আসা একটা সোঁদা গরম বাতাস, যাচ্ছেতাই বাতাস! তাতে স্নায়ু উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে, বিগড়ে যায় লোকের মেজাজ। সেই জন্যই ঝগড়া বেধে গেল দুই গাড়োয়ান, জুসেপ্পে চিরোত্তা আর লুইজি মেতার মধ্যে। অলক্ষ্যে লেগে গিয়েছিল ঝগড়াটা, কেউ বলতে পারে না কে প্রথম শুরু করেছিল, লোকে শুধু দেখলে লুইজি জুসেপ্পের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে, আর জুসেপ্পে কাঁধে মাথা রেখে মোটা লালচে গলাখানাকে আড়াল করে দুই কালচে হাতে ঘুষি বাগিয়ে আছে প্রচণ্ড।

সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে দেওয়া হল ওদের। লোকে জিগ্যেস করলে, 'কী ব্যাপার?'

রাগে নীল হয়ে লুইজি চেঁচাল, 'আমার বউ সম্পর্কে ঐ ষাঁড়টা কি বলেছিল তা ফের বলুক তো দেখি সবার সামনে!'

চিরোত্তা সরে পড়তে চাইছিল, ছোটো ছোটো চোখদুটো তার একটা তাচ্ছিল্যের মুখভঙ্গিতে ঢাকা পড়েছে, কালোমতো গোল মাথাটাকে নাড়তে নাড়তে অপমানকর সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি

করতে আপত্তি করলে সে। সুতরাং মেতাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে:

'ও বলছে আমার বউয়ের সোহাগের মধু ও চেখে দেখেছে!'

লোকেরা গুন গুন করে উঠল, 'বটে? উঁহু, এ তো ভারি গুরুতর কথা, তামাসা নয়। অস্থির হয়ো না লুইজি, তুমি এখানে বিরেন এলাকার লোক বটো, কিন্তু তোমার বউ তো এখানকারই মেয়ে, ওকে ওর ছেলেবেলা থেকে আমরা জানি। যদি তোমার মনে ঘা লেগে থাকে তবে তার পাপটা তো আমাদের সকলের ওপরেই পড়ছে। ন্যায্য করতে হবে আমাদের!'

তারপর তারা গেল চিরোত্তার কাছে।

'তুই বলেছিলি ও কথা?'

চিরোত্তা স্বীকার করলে, 'মানে হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'কথাটা সত্যি?'

'আমি কখনো মিছে কথা বলেছি, কেউ দেখেছে?'

চিরোত্তা বেশ সভ্যভব্য মানুষ, স্বামী হিসেবে ভালো, ছেলের বাপ। ব্যাপারটা বিদ্ঘুটে দাঁড়াল। লোকে বিব্রত হয়ে ভাবনায় পড়ল। লুইজি বাড়ি গিয়ে তার বউ কনচেত্তাকে বললে:

'ওই বদমাইসটা যা বলছে তা মিথ্যে এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ, আমি চললাম!'

বউ অবিশ্যি কাঁদলে, কিন্তু কান্না দিয়ে তো আর কিছু প্রমাণ হয় না। লুইজি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ত্যাগ করলে, ছেলে কোলে মেয়েটা পড়ল একা, না রইল টাকাকড়ি, না খাবারমতো রুটি।

তখন মেয়েরা এগিয়ে এল। সবার আগে এল শব্জীউলী কাতারিনা, শেয়ালের মতো চতুর, দেখায় যেন হাড়ে মাংসে ঠাসা একটা পুরনো বস্তা, এখানে ওখানে ভাঁজ।

কাতারিনা বললে, 'সিনোর, তোমরা বাপু শুনেছ তো, ব্যাপারটা আমাদের সকলের সম্মান নিয়েছে। চাঁদনী রাতের মায়ায় এই একটু

দুষ্টুমি, তেমন ব্যাপার তো নয়। দু'দুটি মায়ের ভাগ্য ঝুলছে এর ওপর। ঠিক কিনা? আমি কনচেত্তাকে নিয়ে চললাম আমার বাড়িতে, সত্যি কথাটা কী বার না করা পর্যন্ত ও আমার কাছে থাকবে।'

তাই ব্যবস্থা হল। এর কিছু পরে কাতারিনা আর তিন মাইল দূর থেকেও যার গলা শোনা যায় সেই বুড়ি ডাইনী লুচিয়া দু'জনে গিয়ে লাগল বেচারা জুসেপ্পের পেছনে। জুসেপ্পেকে ডেকে এনে পুরনো ন্যাতাকানির মতো ওরা চিমটে চিমটে দেখতে লাগল ওর আত্মাটাকে।

'বলো বাছা, কতবার তুমি কনচেত্তাকে নিয়েছ?'

মুটকো জুসেপ্পে গাল ফুলিয়ে কী ভাবলে, তারপর বললে, 'একবার।'

'এই কথা বলার জন্যে এত ভাবনা' — স্বগতোক্তি করলে লুচিয়া কিন্তু চেঁচিয়ে।

একেবারে কোথাকার কে এক ম্যাজিস্ট্রেটের মতো জেরা করে চলল কাতারিনা, 'কখন ঘটেছিল ঘটনাটা, সন্ধেবেলা, নাকি রাতে, নাকি সকালে?'

না ভেবেচিন্তেই এবার জুসেপ্পে জানাল সন্ধেবেলা।

'আলো ছিল তখনো?'

'হ্যাঁ' — বললে হাঁদাটা।

'বটে! তাহলে ওর গতরটা তুমি চেয়ে দেখেছ, নিশ্চয়?'

'দেখেছিই তো !'

'বেশ, তাহলে ওর শরীরটা কি রকম, আমাদের বলো!'

জুসেপ্পের খেয়াল হল হঠাৎ এমন প্রশ্ন কোথায় ওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। মুখখানা সে হাঁ করলে এমনভাবে যেন এক দানা যব আটকে গেছে একটা চড়ুইয়ের গলায়। খেয়াল হল আর কী বিড় বিড় করে

এমন রেগে গেল যে তার প্রকাণ্ড কানদুটো রক্তোচ্ছ্বাসে হয়ে উঠল খানিক বেগুনি।

বললে, 'কী আমি বলতে পারি? আমি কি আর তাকে ডাক্তারের মতো পরীক্ষা করেছি নাকি?'

'ও হো! তুমি তাহলে দেখছি ফলটা কেমন না দেখেই খেতে শুরু করো!' বললে লুচিয়া। তারপর দুষ্টুমির একটা চোখ মটকানি দিয়ে ওকে খোঁচাতে লাগল, 'কিন্তু কনচেত্তার একটা বৈশিষ্ট্য তোমার নজরে পড়েছিল নিশ্চয়?'

জুসেপ্পে বললে, 'এত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটেছিল যে ভগবানের দিব্যি কিছুই আমার নজরে পড়ে নি।'

'তার মানে তুমি ওকে পাও নি!' বলে উঠল কাতারিনা। ভালোমানুষ গোছের লোক বুড়ি কাতারিনা, কিন্তু দরকার পড়লে কড়া হতেও সে পারত। মোট কথা, লোকটাকে ওরা এমন উল্টো-পাল্টা গোলমালের মধ্যে ফেললে, যে শেষ পর্যন্ত সে তার নির্বোধ মাথাটা নিচু করে কবুল করলে:

'কিছুই হয় নি, রাগের বশে আমি বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম।'

বুড়ি দু'জন একটুও অবাক হল না।

বললে, 'আমরা জানতাম'—তারপর লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা এবার তুলে দিলে পুরুষদের বিচারে।

পরের দিন আমাদের মেহনতী মানুষগুলোর সমিতি বসল। চিরোত্তাকে আসামী করে অভিযোগ আনা হল, সে একজন পরস্ত্রীর মানহানি করেছে। বুড়ো কামার জিয়াকোমো ফাস্‌কা ভারি সুন্দর একখান বক্তৃতা দিলে:

'নাগরিকেরা সাথিরা, ভাই সব! যদি আমরা চাই যে আমাদের সঙ্গে লোকে ন্যায় আচরণ করুক, তাহলে পরস্পরের প্রতি আমাদের ন্যায় আচরণ করতে হবে। সকলেই জানুক, যে আমরা যা দাবি

করি তার খুবই কদর করি আমরা, ন্যায় কথাটা আমাদের মনিবদের কাছে যেমন ফাঁকা কথা, আমাদের কাছে তা নয়। এই একটি লোক, একটি নারীর মানহানি করেছে, একজন কমরেডকে অপমান করেছে, একটি পরিবারে ভাঙন ধরিয়েছে, আর একটি পরিবারকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছে, নিজের বউকে ঠেলে দিয়েছে লজ্জা আর ঈর্ষার মধ্যে। লোকটার সম্পর্কে আমাদের কঠোর হতে হবে। কী করা যায় ওকে নিয়ে?'

সাতষট্টি জন লোক এক কণ্ঠে বললে, 'ওকে একঘরে করা হোক!'

কিন্তু পনেরো জন বললে, সেটা খুবই গুরুতর শাস্তি হয়ে যাচ্ছে। তর্ক বাধল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল সবাই, কেননা, যাই হোক না কেন, সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে একটা মানুষ সম্পর্কে, এবং শুধু একটা মানুষ নয়, কেননা, যাই হোক না কেন, লোকটা যে বিবাহিত, ছেলেপুলে আছে তিনটি—তার বউ আর ছেলেপুলের কী অপরাধ? লোকটার বাড়ি আছে একখানা, আছে আঙুর-বাগিচা, এক জোড়া ঘোড়া, বিদেশীদের ভাড়া দেবার জন্য চারটে গাধা — এসবই ও কামিয়েছে নিজের শক্তিতে, মেহনত কম যায় নি। বেচারা জুসেপ্পে কোণের দিকে বসে রইল একা, শিশুদের মাঝে শয়তানের মতো মনমরা। চেয়ারের ওপর গুটিয়ে বসেছিল, মাথাটা নোয়ানো, দুই হাতে দলামোচড়া করে চলেছে টুপিখানা। টুপির ফিতেটা তার ইতিমধ্যেই ছেঁড়া হয়ে গিয়েছিল, এবার লেগে পড়েছে টুপির কানাটা নিয়ে; আঙুলগুলো তার নাচছে বেহালাবাদকের মতো। তারপর যখন ওকে জিগ্যেস করা হল, তার কিছু বলার আছে কিনা, অতি কষ্টে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে:

'আমি দয়া ভিক্ষে করছি! কেউই আমরা নিষ্পাপ নই। এ জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া আমাকে উচিত নয়, এ জমিতে তিরিশ

বছরেরও বেশি আমার বাস, এ জমিতেই আমার পিতৃপুরুষেরা মেহনত করে গিয়েছে!'

মেয়েরাও নির্বাসনের পক্ষে ছিল না। শেষ পর্যন্ত ফাস্‌কা পরামর্শ দিলে:

'আমার মনে হয়, লুইজির বউ আর ছেলেকে খাওয়াবার ভার দেওয়া হোক ওর ওপর, তাতেই যথেষ্ট শাস্তি হবে। লুইজি যা রোজগার করত তার অর্ধেকটা ও দিক লুইজির বউকে।'

আরো এক পশলা তর্ক হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পন্থাই সাব্যস্ত হল, জুসেপ্পে চিরোত্তা খুব খুশি হল যে, অল্পে সে পার পেয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে খুশি হয়ে গেল সকলেই, আদালত বা ছোরাছুরি পর্যন্ত না গড়িয়ে নিজেরাই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে পারা গেছে যা হোক। না সিনোর, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার খবরের কাগজের ভাষায় লেখা হোক এ আমরা চাই না, সেখানে আমরা বুঝব এমন কথা বুড়ো মানুষের দাঁতের মতোই একটা-দুটো। আমরা চাই না যে আমাদের কাছে যাঁরা পর সেই জজ সায়েবরা, আমাদের জীবন সম্পর্কে কিছুই যাঁরা প্রায় বোঝেন না, তাঁরা আমাদের সম্পর্কে এমন সুরে কথা কইবেন যেন আমরা হলাম এক দল বুনো অসভ্য, আর তাঁরা হলেন একেবারে ভগবানের দেবদূত — মদ, মাছের স্বাদ জানেন না, মেয়ে তো কখনো ছুঁয়েও দেখেন নি। আমরা সহজ লোক সিনোর, জীবনকেও দেখি সহজভাবে।

তাই ঠিক হল: জুসেপ্পে চিরোত্তা লুইজির বউ আর ছেলের জন্য খোরপোষ দিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই মিটল না। লুইজি যখন জানল যে চিরোত্তা মিছে কথা বলেছিল, এবং তার সিনোরার কোন দোষ নেই, এবং যখন তাকে আমাদের রায়টা শোনানো হল, সে তার বউকে চিঠি লিখলে তার কাছে চলে আসতে। লিখলে:

'চলে এসো আমার কাছে, আমরা আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করব। ঐ লোকটার কাছ থেকে একটা পয়সাও তুমি নেবে না। যদি কিছু নিয়ে থাকো, তা ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসো। তোমার কাছে আমারও দোষ নেই। ও লোকটা যে প্রেমের মতো একটা ব্যাপারে মিছে কথা বলবে তা কে জানত?'

চিরোত্তার কাছে সে আর একটা চিঠি লিখলে:

'আরো তিনটে ভাই আছে আমার, চার ভাই মিলে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি, তুমি যদি তোমার চর ছেড়ে সরেণ্টো কি কাস্টেল্লামারে কি তোর্‌রে কি অন্য কোথাও আসো, তাহলে ভেড়া জবাই করার মতো তোমাকে জবাই করে ছাড়ব। যেই জানব তুমি এসেছ, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে খুন করব কিন্তু, মনে থাকে যেন! তোমার গ্রাম-সমাজের লোকগুলো যেমন খাঁটি, সৎ লোক, এই কথাটাও আমার তেমনি সত্যি কথা। তোমার সাহায্য আমার সিনোরার দরকার নেই, আমার শুয়োর পর্যন্ত তোমার রুটি ছোঁবে না। যেমন আছো — থাকো, কিন্তু আমি যতদিন-না 'হাঁ' বলছি ততদিন চর ছেড়ে কোথাও যেতে চেয়ো না!'

লোকে বলে, চিরোত্তা সেই চিঠিখানা নাকি নিয়ে গিয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে, জিগ্যেস করেছিল হুমকির জন্য লুইজিকে মামলায় ফেলা যায় কিনা? জজ নাকি বলেছিল:

'হ্যাঁ, যায় অবিশ্যি, কিন্তু ওর ভাইরা তখন নিশ্চয় তোমার গলা কাটবে। খুন করবে এখানে এসেই। আমি বলি সবুর করো! সেই বরং ভালো। রাগ তো আর প্রেম নয়, বেশি দিন রাগ বাঁচে না...'

জজ এ কথা বলতেও পারে: লোকটা আমাদের ভালোমানুষ, মাথা আছে, ভালো ভালো কবিতাও লেখে। কিন্তু চিরোত্তা ঐ চিঠি নিয়ে তার কাছে গিয়েছিল এ আমি বিশ্বাস করি না। না,

শতই হোক চিরোত্তা ভালো লোক, ফের একটা বেয়াক্কেলে কাজ সে করবে বলে মনে হয় না, লোকে যে ঠাট্টা করবে।

আমরা সাধাসিধে মেহনতী লোক সিনোর, আমাদের নিজেদের মতোই আমরা থাকি, আমাদের নিজেদের মতোই আমাদের ধ্যান-ধারণা। আমরা যা চাই, যা ভালো বুঝি তেমনি ভাবে বাঁচার অধিকার তো আমাদের আছে।

বলছেন সমাজতন্ত্রী? আরে দোস্ত, আমার যা ধারণা, মেহনতী মাত্রেই যে জন্ম থেকেই সমাজতন্ত্রী। বই পত্তর আমাদের অবিশ্যি পড়া নেই, কিন্তু সত্যিটা আমরা গন্ধ শুঁকে টের পাই আর সত্যি সব সময় জোর গন্ধ ছাড়ে, সব সময় একই রকম — মেহনতী মানুষের ঘামের গন্ধ!

জিয়োভান্নির সিদ্ধান্ত

পুরনো আঙুর-বাগিচার ঘন পল্লবের মধ্যে লুকনো শাদা রঙের ক্যান্টিনটার দরজার পাশে এক জগ মদ নিয়ে বসে আছে ভিন্‌চেন্‌জো আর জিয়োভান্নি। ভিন্‌চেন্‌জো ঘর রঙ করার কাজ করে, জিয়োভান্নি টার্নার। তাদের টেবিলটার মাথার ওপরে আঙুরলতার চাঁদোয়া, তার সঙ্গে মিশে আছে কনভলভুলাস আর ছোটো ছোটো চীনে গোলাপ। ভিন্‌চেন্‌জো দেখতে ছোটোখাটো, হাড্ডিসার, গাঢ় রঙ। কালো চোখদুটোয় স্বপ্নাতুরের ভাবনামগ্ন মৃদু হাসি। ওপর ঠোঁট আর গালের কামানো দাড়ি গোঁপের কালচে নীল আভা সত্ত্বেও সে হাসিতে তার মুখখানায় কেমন একটা সরল ছেলেমানুষী ভাব ফুটে ওঠে। হাঁ-মুখটা তার ছোটো সুকুমার মেয়ের মতো, হাত দুখানা লম্বাটে। চঞ্চল আঙুলগুলো তার খেলা করে একটা সোনালী গোলাপ নিয়ে। ফুলটাকে সে তার ভরাট ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে চোখ বোঁজে।

আস্তে করে বলে, 'তা সম্ভব! আমি ঠিক জানি না, তা হতে পারে!' কানের পাশে চাপা লম্বাটে মাথাটা সে নাড়ে। চওড়া কপালের ওপর এসে পড়ে তার পাটকিলে চুলের কোঁকড়া কোঁকড়া স্তবক।

জিয়োভান্নি বলে, 'আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ! যত উত্তরের দিকে এগুবে, ততই শক্ত মেজাজের লোক দেখা যাবে!' অল্পবয়স জিয়োভান্নির মাথাখানা বড়ো, চওড়া কাঁধ, কোঁকড়া কালো চুল। মুখের রঙ তামাটে লাল, রোদ পোড়া নাক থেকে মরা চামড়ার শাদা শাদা চটায় ঢাকা, বলদের মতো নিরীহ বড়ো বড়ো চোখ। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা নেই। হাতগুলো তার মেশিনের তেল আর লোহার গুঁড়োয় কালি-মাখা। সে হাত যেমন ধীরে নাড়াচাড়া করে ও, কথাও বলে তেমনি ধীরে। ভাঙা ভাঙা নখওয়ালা কালো কালো আঙুলে মদের গেলাস চেপে ধরে ও কথা বলে চলে তার গুরুগম্ভীর গলায়:

'মিলান, তুরিন — চমৎকার, চমৎকার সব কারখানা, আর নতুন রকমের সব মানুষও গড়ে উঠছে সেখানে, বেড়ে উঠছে নতুন মগজ! কিছু দিন সবুর কর, দেখবি দুনিয়াটা হয়ে উঠবে সৎ, বুদ্ধিমন্ত।'

'হ্যাঁ' — বললে বেঁটেখাটো ভিন্‌চেন্‌জো। তারপর রোদের একটা ঝলকের দিকে গেলাসটা উঁচু করে ধরে গাইতে শুরু করল:

প্রথম যবে নয়ন মেলি
বিশ্বভুবনখানা উষ্ণ কোমল হাসে!
হায়রে, তবু দিন যে ফুরোয়, বয়স বাড়ে —
সবই শীতল হয়ে আসে!

'শোনো বলি, যত উত্তরের দিকে যাবে, ততই ভালো কাজ। ফরাসীরা আমাদের মতো আলসে নয়, তারপর ধরো জার্মানদের, তারপর ঐ রাশিয়ানদের! লোক বটে!'

'হ্যাঁ!'

'অধিকার নেই, জান মান স্বাধীনতা হারবার বিপদ, তা সত্ত্বেও বিশাল সব কাণ্ড ঘটিয়েছে ওরা। ওদের জন্যেই দ্যাখো সারা পুব দেশ জেগে উঠল!'

মাথা নুইয়ে ভিন্‌চেন্‌জো বললে, 'বাহাদুরের দেশ! ইচ্ছে হয়, ওখানে গিয়ে থাকি...'

'তুই গিয়ে থাকবি!' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাঁটুর ওপর চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল টার্নার, 'এক হপ্তার মধ্যেই জমে বরফ হয়ে যাবি!'

দুজনেই হেসে ওঠে দরাজ গলায়।

ওদের চারপাশে নীল সোনালী ফুল। বাতাসে কাঁপে সূর্যকিরণ, কাচের স্বচ্ছ পাত্রে আর গেলাসে জ্বল জ্বল করে আল্‌মান্‌দিন্‌ মদ আর দূর থেকে ভেসে আসে সমুদ্রের রেশমী মর্মর।

উদার হাসি হেসে টার্নার বলে, 'তবে শোন, ভিন্‌চেন্‌জো, বলি কি করে আমি সোশ্যালিস্ট হলাম। তুই এটা কবিতা করে লেখ। গল্পটা জানিস?'

রঙ-মিস্ত্রি বলে, 'না তো।' গেলাসে মদ ঢালে সে, লাল স্রোতোধারার দিকে তাকিয়ে হাসে, 'আমাকে কখনো তো বলিস নি। সমাজতন্ত্রের খোলসটা তোর হাড়ে মজ্জায় এমন এ'টে বসা, যে আমার তো ধারণা তুই সমাজতন্ত্রী হয়েই বুঝি জন্মেছিস!'

'তোরই মতো, সকলের মতোই বোকা আর ন্যাংটা হয়েই আমি জন্মেছিলাম। বড়োলোকের কোন মেয়েকে বিয়ে করব বলে স্বপ্ন দেখতাম জোয়ান বয়সে। সৈন্যদলে যখন ছিলাম, তখন প্রাণপণে খাটতাম যাতে পরীক্ষায় অফিসারের পদে উঠতে পারি। তারপর আমার বয়স যখন তেইশ, তখন টের পেতে লাগলাম দুনিয়ার ব্যাপার-স্যাপার তো 'সব ঠিক হ্যায়' গোছের নয়, এ ব্যাপারে বোকাহাবা হয়ে জীবন কাটানো বড়ো লজ্জার কথা!'

রঙ-মিস্ত্রি টেবিলের ওপর কনুই ভর দিয়ে মাথাটা এগিয়ে তাকায় পাহাড়ের দিকে, যেখানে ঠিক খাদের কাছে বড়ো বড়ো পাইন গাছগুলো শাখা দোলাচ্ছে।

'আমাদের, মানে আমাদের ইউনিটটাকে পাঠানো হয়েছিল বোলোনিয়াতে। ওখানকার চাষিরা গণ্ডগোল লাগিয়েছিল, কেউ বলছিল খাজনা কমাতে হবে, কেউ চাইছিল মজুরি বাড়ানো দরকার। আমার ধারণা ছিল, ও দুটো কথাই ভুল। জমির খাজনা কমানো, মজুরি বাড়ানো আজগুবি ব্যাপার বলে আমার মনে হয়েছিল। জমিদারদের যে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে... আমি শহরের লোক, আমার কাছে সবটা যত বাজে ব্যাপার আর নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া গরম আবহাওয়া, অনবরত এখান থেকে ওখানে বদলি, রাতে পাহারার কাজ — কেননা লোকগুলো জমিদারদের চাষের যন্ত্র ভাঙছিল, ফসল পোড়াতে, নিজেদের সম্পত্তি যা নয় তা তছনছ করতে মজা পাচ্ছিল ওরা — এই সব মিলিয়ে আমারও রাগ ধরে গিয়েছিল খুব।'

অল্প অল্প চুমুক দিয়ে মদ শেষ করে ও। তারপর ক্রমেই চাঙ্গা হয়ে বলে যেতে থাকে:

'ভেড়ার মতো পালে পালে ওরা ঘুরে বেড়াত মাঠে। মুখে কথাটি নেই, গোমড়া চেহারা, কাজের কাজী। আমরা ওদের ছত্রভঙ্গ করতাম সঙ্গীন দেখিয়ে, কখনো কখনো কুঁদো দিয়ে গুঁতিয়ে। ওরা কিন্তু ভয় পেত না। ধীরে সুস্থে চলে যেত, ফের জমায়েত হত। গির্জায় মহোপাসনার মতো একঘেয়ে বিরক্তিকর ব্যাপারটা। দিনের পর দিন এমনি চলল যেন সান্নিপাতিক জ্বর। আমাদের করপোরাল ছিল লুওতো, খাসা লোক, বাড়ি আব্রুজিয়ায়, নিজেও চাষি, ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল তার। হলদে মেরে গেল, রোগা হয়ে গেল। বলত:

'বিচ্ছিরি ব্যাপার হে, মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত গুলিই চালাতে হবে। ধুত্তোরি যত সব!'

'ওর বকবকানিতে আমরাও আরো বেশি অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

তাছাড়া প্রতিটি কোনা-কানাচে, প্রতিটি টিলা আর গাছের পেছন থেকে ঐ গোয়ার-গোবিন্দ চাষাগুলো মাথা বার করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আমাদের দিকে, স্বভাবতই আমাদের ওপর ওদের খুব একটা সুনজর ছিল না।'

বেঁটেখাটো ভিন্‌চেন্‌জো বলে, 'নে খা!' সাদরে পুরো একটা গেলাস এগিয়ে দেয় বন্ধুর দিকে।

টার্নার বলে, 'ধন্যবাদ! শক্ত লোকেরা জিন্দাবাদ!' মদটা গিলে হাত দিয়ে মোচটা মুছে নিয়ে সে বলে যায়:

'একদিন আমি দাঁড়িয়ে আছি জলপাই কুঞ্জে ছোটো একটা টিলার ওপর, গাছগুলো পাহারা দিচ্ছিলাম, কেননা চাষিরা তা পয়মাল করে ছাড়ছিল। টিলাটার নিচে কী একটা নালা খুঁড়ছিল দুটো চাষা — একজন বুড়ো, একজন জোয়ান। দিনটা ছিল ভারি গরম, আগুনের মতো পোড়াচ্ছে সূর্য — ইচ্ছে করে মাছ হয়ে জলের তলে গিয়ে থাকি, একঘেয়ে লাগছিল; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই দুটোর কাজ দেখছিলাম খুব রেগে-মেগে। দুপুরে ওরা কাজ থামিয়ে বার করলে কিছু রুটি, পনীর আর এক জগ মদ। মনে মনে বললাম আমি, গোল্লায় যা তোরা! বুড়ো লোকটা এতক্ষণের মধ্যেও একবারও আমার দিকে চায় নি। হঠাৎ সে কী যেন বললে ছোকরাটাকে। ছোকরাটা আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লে, তাতে বুড়োটা কড়া করে চেঁচিয়ে উঠল:

''যা বলছি!'

'ছোকরাটা আমার কাছে এল জগটা নিয়ে। গলার স্বরটা তার বিশেষ প্রসন্ন নয়।

'বললে, 'বাবা ভাবছে, আপনার হয়ত তেষ্টা পেয়েছে, সেই জন্যে কিছু মদ পাঠিয়ে দিল!'

'ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, তবে ভালোও লাগল। দান প্রত্যাখ্যান করে

আমি বুড়োটার দিকে মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু আকাশের দিকে মুখ তুলে বুড়োটা বললে:

''খাও সিনোর, খেয়ে নাও! সৈন্য বলে দিচ্ছি তা নয়, দিচ্ছি মানুষটাকে। আমাদের মদ খেলে সৈন্যেরা যে দয়ালু হয়ে উঠবে তা আমরা ভাবি না।'

'মনে মনে ভাবলাম, 'হুল ফোটাচ্ছে শালা!' তারপর তিন ঢোক মদ খেয়ে ওদের ধন্যবাদ জানালাম, ওরা পানাহার করতে লাগল নিচে গিয়ে। কিছু পরে হুগো এল আমার বদলি হয়ে — হুগোর বাড়ি ওই সালের্নো-তে। হুগোকে আস্তে করে বললাম, ওই চাষাদুটো লোক ভালো। সেই দিন সন্ধেবেলা, যেখানে চাষের যন্ত্রপাতি রাখা হত সেই চালাটার কাছে যখন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন ছাতের ওপর থেকে কয়েকটা টালি এসে পড়ল আমার ওপর। একটা পড়ল মাথায়, সেটা খুব জোরে লাগল না। কিন্তু আর একটা আমার কাঁধের ওপর এমন জোরে এসে লাগল যে বাঁ হাতখানা অসাড় হয়ে গেল।'

মুখ হাঁ করে হাসতে লাগল টার্নার, কোঁচকিয়ে এল চোখদুটো। হাসতে হাসতে বললে:

'ঐ এলাকোটায় সে সময় টালি, লাঠি আর পাথর যেন প্রাণ পেয়ে ঘুরে বেড়াত স্বাধীনভাবে। আর নিষ্প্রাণ বস্তুর এই স্বাধীনতায় আমাদের বেশ ফোলা দেখা দিত মাথায়। সৈন্যটা হয়ত কোথাও যাচ্ছে কিংবা দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে লাফিয়ে এসে ঘা মারত লাঠি, নয়ত আকাশ থেকে বর্ষাত ঢিল। স্বভাবতই এতে ক্ষেপে যেতাম আমরা!'

ছোটোখাটো রঙ-মিস্ত্রির দুচোখ হয়ে উঠল বিষণ্ণ, মুখখানা বিবর্ণ। মৃদুস্বরে বললে:

'এই সব কথা শুনতে লজ্জা হয়...'

'কী করা যাবে! লোকের চৈতন্য হয় ধীরে ধীরে। কিন্তু যা

বলছিলাম। সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে লাগলাম আমি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল একটা বাড়িতে। আমাদেরই আর একজনও সেখানে শুয়ে। পাথরে ওর মুখখানা থ্যাঁতলানো, কি করে হল জিগ্যেস করায় ও একটু শুকনো হেসে বললে:

''বুড়ির কীর্তি দোস্ত, পাকাচুল এক ডাইনি পাথর ছুঁড়ে মেরে বলে কিনা, আয় আমায় খুন কর!'

''গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওকে?' জিগ্যেস করলাম।

''না, আমি বলেছি, আমি নিজেই পড়ে গিয়ে চোট খেয়েছি। আমাদের কম্যান্ডার অবিশ্যি তা বিশ্বাস করে নি। চোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু একটা বুড়ির ঢিলে জখম হয়েছি সে কি কবুল করা যায়! ধুত্তোরিকার! জীবন ওদের বড়ো কষ্টের, কেন যে আমাদের ঘেন্না করে তা বেশ বুঝি।'

'আমি মনে মনে ভাবলাম, 'এই ব্যাপার তাহলে!' খানিক বাদে একটি ডাক্তার এল, সঙ্গে দু'জন মহিলা। একজন দেখতে ভারি সুন্দর, কটা চুল, ভেনিসিয়ান বলে মনে হয়, অন্য জন কেমন ঠিক মনে নেই। ওরা আমার জখম পরীক্ষা করে দেখল — ও তো কিছুই নয়, তা আর বলতে। কম্প্রেস ল্যাগিয়ে ওরা চলে গেল।'

ভুরু কুঁচকে চুপ করে যায় টার্নার। হাত দুখানা ঘষতে থাকে সজোরে। মদের গেলাস দুটো আবার ভর্তি করে দেয় বন্ধু; মদ ঢালার সময় জগটা এত উঁচু করে ধরে যে সুরার রক্তিম চাঙ্গা ধারাটা কাঁপতে থাকে বাতাসে।

মুখ ভার করে বলে যায় টার্নার, 'আমরা বসেছিলাম জানলার কাছে। বসেছিলাম যাতে রোদ না পড়ে, বাগানের মধ্যে সেই সুন্দরী মেয়েটি আর তার বান্ধবী পায়চারি করছিল ডাক্তারের সঙ্গে জানলার কাছে। সুন্দরী মেয়েটির মিষ্টি গলা কানে আসছিল আমার — বলছিল ফরাসি ভাষায়, যা আমিও বেশ জানি।

'শুনলাম মেয়েটি বলছে, 'ওর চোখদুটো দেখেছিলেন? বেশ বোঝা যায়, ও-ও একজন চাষি, নিশ্চয় ইউনিফর্ম খুলে ফেললেই ও ঠিক অন্য সকলের মতোই সোশ্যালিস্ট হয়ে উঠবে। অমনি ধারা যাদের চোখ তারা সারা দুনিয়া জয় করতে চায়, সবকিছু বদলে দিতে চায়, আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করতে চায় কিনা একটা বিছছিরি, অন্ধ ন্যায়বিচারের নাম নিয়ে!'

'ডাক্তার বললে, 'বোকাসোকা লোক সব — আধখানা শিশু, আধখানা জন্তু!'

' 'জন্তু — ঠিকই! কিন্তু শিশুর মতো কি দেখলেন ওদের মধ্যে?'

' 'মানে ঐ বিশ্ব সাম্যের স্বপ্নগুলো...'

'মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ভেবে দেখুন একবার! আমি কিনা ওই বলদ-চোখো লোকটার সঙ্গে সমান, ঐ পাখির মতো মুখওয়ালা লোকটার সমান, আমরা সকলেই, আপনি, আমি, সে, সবাই আমরা সমান কিনা ওদের সঙ্গে, ঐ যত বদ বংশের লোকগুলোর সঙ্গে! যাদের ডাকা যায় কেবল ওদেরই মতো জন্তুগুলোকে খুন করবার জন্যে...'

'মেয়েটি অনেক কথা বলে গেল, বলল বেশ উত্তেজনার সঙ্গে। শুনতে শুনতে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'হায় সিনোরা!' ওকে আমি আগেও দেখেছিলাম, আর জানিস তো, মেয়ের কথা সৈন্যদের মতো অত তীব্রভাবে আর কেউ ভাবে না। স্বভাবতই আমি ভেবেছিলাম মেয়েটির বেশ নরম মন, বুদ্ধিমতী, দয়ামায়া থাকবে, কেননা সে সময় আমি ভাবতাম, উঁচু জাতের লোক হলেই সে বুদ্ধিমান হবেই হবে।

'সঙ্গীকে জিগ্যেস করলাম, 'ওরা কী বলছে তা ও বুঝতে পারছে কি না?' লোকটা ফরাসি জানত না। আমি যখন তাকে বললাম, সুন্দরী মেয়েটি কী বলেছে, তখন দানোর মতো ক্ষেপে উঠল সে। লাফিয়ে উঠে

পায়চারি করতে লাগল ঘরের মধ্যে, জ্বলতে লাগল একটা চোখ, কেননা অন্য চোখটা ছিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

'ও ফুঁসতে লাগল: 'এই কথা তাহলে! আমাকে কাজে লাগাতে কসুর নেই, কিন্তু মানুষ বলে গণ্য করে না! ওঁর জন্যে আমি অপমান সইছি, আর আমার আত্মসম্মান উনি চলছেন পা মাড়িয়ে! ওঁরই সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে আমি আমার বিবেক পর্যন্ত হারাতে বসেছি...'

'লোকটা অবুঝ ছিল না। ভয়ানক অপমানিত লাগছিল ওর। আমারও। পরের দিন আমরা চিৎকার করে খোলাখুলিই ওই মহিলাটি সম্পর্কে আলাপ করলাম, কিছুই রাখা ঢাকা না করে। লুওতো বিড় বিড় করে কি বললে, তারপর সাবধান করে দিলে আমাদের:

' 'সাবধান হে! ভুলে যেও না, তোমরা হলে সৈন্য, শৃঙ্খলা বলে একটা জিনিস আছে!'

'ভুলে আমরা যাই নি, কিন্তু সেই দিন থেকে আমরা অনেকে, সত্যি কথা বলতে গেলে প্রায় সবাই এমন হয়ে গেলাম যেন বোবা কানা। আমাদের এই বোবা কানা হবার খাশাসুযোগ নিলে বাহাদুর চাষারা। দাবি ওরা জিতল। আমাদের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতে লাগল ওরা। শণচুলো মহিলাটি ওদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শিখতে পারতেন। যেমন ধরো, কিভাবে সৎলোকের কদর করতে হয় তা ওঁকে ওরা চমৎকার শেখাতে পারত। তারপর আমরা যেখানে রক্ত ঝরাবার জন্যে গিয়েছিলাম সেখান থেকে আমরা যখন চলে গেলাম, তখন অনেকেই আমরা উপহার পেলাম ফুল। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে আমরা যখন কদম ফেলে চলেছি, তখন ঢিল আর টালির বদলে ওরা আমাদের ফুল মারতে লাগল ছুঁড়ে ছুঁড়ে! বন্ধু হে, আমার মনে হয় সে যোগ্যতা আমরা দেখিয়েছি। বিরূপ অভ্যর্থনার কথাটা ভুলে যাওয়া গেল এই চমৎকার বিদায় অভিনন্দন পেয়ে।'

জিয়োভান্নি হাসে। বলে:

‘এ থেকে একটা কবিতা বানিয়ে দেওয়া তোর উচিত, ভিন্‌চেন্‌জো...’

চিন্তার হাসি হেসে রঙ-মিস্ত্রি বলে:

‘ঠিকই, কবিতা বানাবার মতোই মালমশলা! মনে হয় হয়ত পারা যাবে। পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেলে প্রেমের কবিতা তেমন আসে না। ’

হাতের ফুলটা তার এতক্ষণে দলামোচড়া হয়ে এসেছে। সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা ছিঁড়ে নেয় সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলতে থাকে:

‘মায়ের বুক থেকে প্রেমিকার বুক — এই সবখানি পথ যখন মানুষ পার হয়ে আসে তখন অন্যতর এক সুখের দিকে তার যাওয়া উচিত...’

ওর সঙ্গী গেলাসের মদটায় একটু ঝাঁকি দেয়, কিছু বলে না। আঙুর-বাগিচা পেরিয়ে কোমল মর্মর ওঠে নিচের সমুদ্র থেকে। উষ্ণ বাতাসে ভাসে ফুলের গন্ধ।

‘আমরা যে এত নরম, এত আলসে সে ওই সূর্যের জন্যে’ — অস্ফুট স্বরে বলে টার্নারি।

ভিন্‌চেন্‌জো তার সরু ভ্রু-জোড়া কুঁচকে মৃদুস্বরে বলে, ‘ভালো প্রেমের কবিতা আমি আর লিখতে পারছি না, নিজের ওপর এমন রাগ ধরে যাচ্ছে।’

‘কিছু লিখেছ নাকি?’

রঙ-মিস্ত্রির কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে জবাব পাওয়া যায় না।

অনেকক্ষণ পরে সে বলে, ‘হ্যাঁ, কালকে এসে গেল কবিতাটা, ‘কমো’ হোটেলের ছাদের ওপর।’

তারপর মৃদু তন্ময় সুরেলা গলায় ও আবৃত্তি করে যায়:

নির্জন তটভূমি, প্রাচীন ধূসর শিলাতটের দিকে চেয়ে
কোমল বিদায়-বাণী বলে হেমন্তের সূর্য,
অন্ধকার পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ক্ষুধিত তরঙ্গ,
সূর্যকে ধৌত করে দিতে চায় সমুদ্রের নীল শীতল জলে।
তামারঙা পাতা ঝরে হেমন্তের বাতাসে,
মৃত পাখির উজ্জ্বল শবের মতো ভেসে যায় জোয়ারের ফেনায়,
বিবর্ণ আকাশ বিষণ্ণ, ক্রুদ্ধ সমুদ্র সুগম্ভীর —
শুধু হাসে সূর্য, ধীরে ধীরে বিশ্রামের কোলে ডুবে যেতে যেতে।

চুপ করে থাকে দু'জনেই; মাটির দিকে চেয়ে মাথা নুইয়ে থাকে রঙ-মিস্ত্রি। হৃষ্টপুষ্ট টার্নার হাসে, তারপর বলে:

'অনেক জিনিস নিয়েই ভালো কিছু লেখা যায়, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেখা হয় ভালো মানুষকে নিয়ে, ভালো ভালো মানুষকে নিয়ে গান!'

ভাই বোন

আঙুরলতার শ্যামলকৃষ্ণ ঝালরের ফাঁক দিয়ে সোনালী বৃষ্টির মতো রোদ ঝরে পড়েছে হোটেলের বারান্দায় — শূন্যে যেন টান টান হয়ে আছে সোনার সুতোগুলো। ধূসর টালি-পাথরের মেজে আর শাদা টেবিল-ক্লথের ওপর ছায়ার অদ্ভুত সব নক্সা — মনে হয় বুঝি তার দিকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকলে যেন কবিতার মতো তা পড়া যাবে, বোঝা যাবে কী তাদের অর্থ। মুক্তোর মতো, অথবা সেই জ্যোতিহীন আশ্চর্য পাথর অলিভাইনের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুর ঝিলমিল করছে রোদ্দুরে, টেবিলের ওপর কাঁচের জলপাত্রে জ্বলছে নীল নীল হীরে।

টেবিলগুলোর ফাঁকে মেজের ওপর পড়ে আছে একটা ছোট্ট লেসের রুমাল। স্বভাবতই একটি মহিলার হাত থেকে খসা, এবং মহিলাটি যে অপূর্ব সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই। আলস্যে ভরা এই উষ্ণ প্রশান্ত দিনখানিতে যখন সূর্যের সামনে যা-কিছু মামুলী আর একঘেয়ে সবই লজ্জায় মুখ ঢেকে অদৃশ্য হয়েছে তখন এ কথা না মনে হয়ে উপায় কি।

সবকিছু স্তব্ধ; শব্দ যেটুকু তা শুধু ঐ বাগানের পাখিগুলোর

কিচিরমিচিরে, ফুলের ওপর মৌমাছি গুঞ্জনে, আর পাহাড়ের কোথায় এক আঙুর-বাগিচা থেকে ভেসে আসা একটা গানের অস্পষ্ট রেশে। সে গান গাইছে দুজনে — নারী আর পুরুষ, এক কলি গানের পর থামছে মিনিট খানেক করে, তাতে কেমন একটা বিশেষ ব্যঞ্জনা, প্রার্থনার একটা ভাব এসে লেগেছে গানখানায়।

বাগান থেকে এগিয়ে আসেন একটি মহিলা, শ্বেত পাথরের সুপরিসর সিঁড়ি ভেঙে ওঠেন আস্তে আস্তে। বয়সে বুড়ি, অনেকটা লম্বা, ময়লা রঙের কঠোর মুখখানা, বিরস ভুরুদুটো কোঁচকানো, পাতলা ঠোঁট দুখানি এমন জেদ করে চাপা, যেন মনে হয় এই মাত্র তিনি কাকে বলেছেন, 'কিছুতেই না!'

অস্থিসার কাঁধের ওপর থেকে নেমেছে দীর্ঘ চওড়া সোনালী রেশমী ম্যাণ্টেল, যেন রেনকোট লেসের ঝালর লাগানো। কালো একটি লেসের স্কার্ফে দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছোট্ট পাকাচুলে ভরা মাথাখানা ঢাকা। এক হাতে একটি লম্বা হাতলওয়ালা লাল ছাতা, অন্য হাতে রুপোলী সুতোয় কাজ করা একটি কালো মখমলের হাত-ব্যাগ। রোদ্দুরের চিকন জালি-বুনটের মধ্যে দিয়ে মহিলা হেঁটে যান সৈন্যের মতো কদম ফেলে, বারান্দার বাঁধানো টালি-পাথরে ঠোকা লেগে আওয়াজ ওঠে ছাতাটা থেকে। পাশ থেকে দেখলে মুখখানা তাঁর আরো কঠোর মনে হয়; নাকটা বাঁকা, থুতনিটা চোখা, তাতে মস্ত ধূসর একটা আঁচিল, কালো কোটরের ওপর ঢিপ হয়ে নামা কপাল, বলিরেখার জালে লুকনো চোখদুটো এত গভীরে যে মনে হয় মহিলাটি বুঝি অন্ধ।

মহিলাটির পেছনে হাঁসের মতো এপাশে-ওপাশে দুলতে দুলতে নিঃশব্দে এগিয়ে আসে একটি চারকোনা কুঁজো লোক, নুয়ে পড়া প্রকাণ্ড মাথাখানার ওপরে একটি ধূসর রঙের নরম টুপি। ওয়েস্ট-কোটের পকেটে তার হাতদুটি গোঁজা, ফলে তাকে আরো চওড়া দেখায়,

আরো বাঁকাচোরা লাগে দেহটা। লোকটার পরনে শাদা স্যুট, পায়ে নরম সোল দেওয়া শাদা জুতো। রুগ্ন মুখখানা আধ-খোলা, তার ভেতর থেকে হলদে হলদে অসমান দাঁতগুলো দেখা যায়। ওপরকার ঠোঁটের ওপর খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে কালো বিচ্ছিরি মোচ। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে লোকটা, কষ্ট হয় নিঃশ্বাস ফেলতে, নাকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু মোচটা নড়ে না। হাঁটছে সে বাঁটকুল পা দুখানা কদর্য ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে, বড়ো বড়ো চোখদুটো বিরস দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মাটির দিকে। ক্ষুদ্র অঙ্গে তার বড়ো বড়ো জিনিস অনেক: বাঁ হাতের অনামিকায় মস্ত একটা সোনার জড়োয়া আংটি, ঘড়ির চেনের বদলে একটা কালো ফিতের শেষ প্রান্ত থেকে ঝোলে দুটি চুনি বসানো সোনার এক মস্ত পদক, আর নীল টাইয়ের ওপর একটা বিরাট আকারের ওপ্যাল পাথর, লোকে বলে এ রকম পাথর নাকি দুর্ভাগ্য আনে।

আরো একটি মূর্তি দেখা দেয়; তাড়াহুড়ো না করে উঠছেন বারান্দায়, ইনিও একজন বৃদ্ধা, ছোটোখাটো গোলগাল দেখতে, লাল রঙের কোমল একখানা মুখ, ছটফটে চোখ, সন্দেহ থাকে না, যে বুড়িটি হাসিখুশি, বক বক করতে ভালোবাসেন।

বারান্দা পেরিয়ে ওঁরা হোটেলের দরজার দিকে এগিয়ে যান ঠিক যেন হগার্ত-এর আঁকা একখানা ছবি: অসুন্দর, বিষণ্ণ, কিম্ভূত, এবং এই উজ্জ্বল সূর্যের নিচেকার সবকিছু থেকে এত সুদূর যে মনে হয় তাঁদের দেখামাত্র যেন পৃথিবী নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ হয়ে উঠবে।

ভাই বোনে ওঁরা হল্যান্ডের লোক, জনৈক হীরা ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারের ছেলেমেয়ে। ওঁদের সম্পর্কে লোকে যা রহস্য করে বলে থাকে তা বিশ্বাস করতে হলে বলতেই হবে ওঁদের ভাগ্যটা অদ্ভুত।

ছেলেবেলায় কুঁজো লোকটা ছিল বেশ শান্তশিষ্ট কুনো এবং ভাবুক গোছের, খেলনাপাতি কি খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল না। এ

নিয়ে ছেলেটির দিদি ছাড়া কিন্তু কেউ মাথা ঘামাত না; মা বাপের ধারণা ছিল এমন লোকের পক্ষে হতভাগ্য হওয়ারই কথা, কিন্তু ভাইয়ের চেয়ে চার বছরের বড়ো দিদিটি কিন্তু ভাইয়ের এই অদ্ভুত চরিত্রে খুবই উদ্বিগ্ন বোধ করত।

মেয়েটি প্রায় সারা দিনটাই থাকত তার ভাইয়ের সঙ্গে, তাকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করত, হাসাতে চাইত। খেলার জন্য দিদি খেলনা এনে দিত, কিন্তু ভাই সেগুলিকে গাদাগাদি করে স্তূপ করে রাখত পিরামিডের মতো। কদাচিৎ হাসতে দেখা যেত তাকে, জোর করে আনা হাসি; আশে-পাশের সবকিছু সম্পর্কে যে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে ভাইটি চেয়ে দেখত, বড়ো বড়ো চোখের ঠিক সেই দৃষ্টি দিয়েই সে তাকাত দিদির দিকেও। এ দৃষ্টি দেখে ক্ষেপে যেত দিদি।

পা ঠুকে সে চেঁচিয়ে উঠত, 'খবর্দার অমন চোখ করে তাকাবি না আমার দিকে, বড়ো হয়ে হবি তো একটা ন্যালাখেপা!' চিমটি কাটত দিদি, চড়-চাপড় মারত। কেঁউ কেঁউ করে ভাই তার সরু লম্বা হাত দিয়ে মাথাটা আটকাবার চেষ্টা করত, কিন্তু কখনো দিদির কাছ থেকে পালাত না, নালিশও করত না কারো কাছে।

পরে, দিদির এক সময় মনে হল, যে-জিনিসটা তার নিজের কাছে অত স্পষ্ট, সেটা ভাইও বুঝতে পারবে। এই ভেবে সে শান্তভাবে বোঝালে:

'তোর শরীরটা যখন বিকৃত, তখন বুদ্ধিমান তোকে হতেই হবে, নইলে তোকে নিয়ে আমাদের লজ্জার শেষ থাকবে না — মা-বাবা, সকলেরই লজ্জা! বড়োলোকের বাড়িতে যদি একটা ছোট্ট জড়ভরত দেখে বাইরের লোকেও লজ্জা পায়। বড়োলোকের বাড়িতে সবকিছুই হতে হবে হয় সুন্দর, নয় বুদ্ধিমান, বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।' মস্ত মাথাটা এক পাশে হেলিয়ে দিদির দিকে অন্ধকার নিষ্প্রাণ দৃষ্টি তুলে ও জবাব দিলে গম্ভীরভাবে।

ভাইয়ের প্রতি ছোট্টো দিদির এই মনোভাব দেখে মা-বাপ খুশি হয়েছিল, তার সামনেই তারা মেয়েটির মায়াদয়ার প্রশংসা করত, এবং ক্রমশ সে হয়ে দাঁড়াল কুঁজো ছেলেটার সর্বস্বীকৃত সঙ্গিনী। ভাইটিকে দিদি শেখাত, কি করে খেলনা নিয়ে খেলতে হয়, পড়া বুঝিয়ে দিত আর পড়ে শোনাত পরী আর রাজপুত্রদের কাহিনী।

ভাই কিন্তু সমানেই তার খেলনাগুলো ডাঁই করে তুলতে লাগল যেন তা থেকে কিছু একটা গড়ে উঠবে। পড়াশুনাতে ও বিশেষ মন দিল না। রূপকথার লোকজনদের আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা শুনেই কেবল একটু অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠত তার মুখে। একদিন দিদিকে সে জিগ্যেস করলে:

'রাজপুত্রেরা কেউ কখনো কুঁজো হয় নাকি রে দিদি?'

'না।'

'কোটালপুত্রেরা?'

'না, না!'

কষ্টের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল ছেলেটির বুক থেকে। দিদি তার কর্কশ চুলের ওপর হাত রেখে বললে:

'কিন্তু জ্ঞানী যাদুকরেরা হয় সব সময়েই কুঁজো।'

'তাহলে আমি যাদুকর হব' — বললে ও বাধ্যের মতো। তারপর একটুখানি কী ভেবে জিগ্যেস করলে:

'পরীরা সবাই খুব সুন্দর, না রে দিদি?'

'সবাই।'

'তোর মতো?'

'হতে পারে! তবে আমার ধারণা আমার চেয়েও সুন্দর' — সত্যি কথাই বললে দিদি।

ছেলেটির যখন আট বছর বয়স, দিদির নজরে পড়ল, যখনই ওরা ঘরবাড়ি উঠছে এমন জায়গা দিয়ে যেত, তখনই ছেলেটার মুখ-চোখ

বিস্ময়ে ভরে উঠত। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে দেখত কিভাবে কাজ করছে মিস্ত্রিমজুর। তারপর নিজের নির্বাক চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেরাত দিদির দিকে।

দিদি জিগ্যেস করছিল, 'এগুলো দেখতে ভালো লাগে তোর?'

ও বলত, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'জানি না।'

কিন্তু একদিন ও ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল:

'কত ছোটো লোকগুলো, কত ছোটো ছোটো ইঁট, কিন্তু কী বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরি করছে ওরা। এমনি করে সারা শহরটা তৈরি হয়েছে নাকি রে?'

'হয়েছেই তো।'

'আমাদের বাড়িখানাও?'

'নিশ্চয়ই।'

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দিদি নিশ্চিত স্বরে বললে:

'বড়ো হলে তুই একজন বিখ্যাত স্থপতি হবি!'

এক রাশ কাঠের ব্লক কিনে আনা হল ওর জন্য। বাড়ি বানাবার এক তীব্র ঝোঁক তখন থেকে পেয়ে বসল ওকে। দিনের পর দিন ও তার ঘরের মেজের ওপর বসে নিঃশব্দে গড়ে তুলত লম্বা লম্বা মিনার; সেগুলো যখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত, তখন আবার তা বানাতে বসত। ঝোঁকটা তার কাছে এমন অপরিহার্য হয়ে উঠল যে এমন কি খেতে বসেও ছুরি, কাঁটা, তোয়ালের আংটা দিয়ে সে কিছু-না-কিছু বানিয়ে যেত। চোখদুটো তার গভীর আর একাগ্র হয়ে উঠতে লাগল। হাত দুখানা সজীব হয়ে উঠে চঞ্চল হয়ে থাকত সারাক্ষণ, আর যা-কিছু পাওয়া যেত, তাই নিয়েই নাড়াচাড়া করে যেত আঙুলগুলো।

শহরে বেড়াবার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখত কী করে বাড়ি গড়া হচ্ছে, ছোটো থেকে বড়ো হয়ে মাথা তুলছে আকাশের দিকে। কাঁপা কাঁপা নাক নিয়ে ইঁটের ধুলো ভরা বাতাস আর ফুটন্ত চুণের গন্ধ টেনে নিত ও লোভীর মতো, চোখদুটো তার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আসত আর একটা স্বপ্নাতুর ভাবুকতার ছায়া পড়ত সে চোখের ওপর। যদি ওকে বলা হত, এই ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, সে কথা ওর কানেই ঢুকত না।

'চলে আয়!' দিদি তার ঘোর কাটিয়ে টানত হাত ধরে।

মাথা নিচু করে এগিয়ে যেতে যেতেও সে কেবলি ফিরে তাকাত পিছনে।

'তুই একজন স্থপতি হবি, তাই না?' উৎসাহ দিয়ে দিদি জিগ্যেস করত ওকে।

'হ্যাঁ, হবো।'

একদিন ওরা যখন ড্রইং-রুমে ডিনারের পর কফির জন্য অপেক্ষা করছে, তখন বাপ বললে, খেলনাপাতি ছেড়ে ছেলেটার এখন সত্যি করে পড়াশুনা শুরু করা দরকার। কিন্তু দিদি এমন একটা লোকের মতো কথা কয়ে উঠল যার স্বীকৃতি আছে আর তার মতটাও না ধরলে চলবে না। বললে:

'ওকে কোন ইস্কুলে পাঠাবার কথা আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না, বাবা?'

একটি চুরুট ধরালে বাবা; পরিষ্কার করে দাড়ি গোঁপ কামানো বিপুলাকৃতি একটি লোক সে, সারা শরীরে ঝিলিক দেওয়া এক রাশ জড়োয়া। বললে:

'কিন্তু কেন পাঠাবে না শুনি?'

'কেন, সে তো ভালো করেই জানেন!'

নিজের সম্পর্কে কথা হচ্ছে বলে কুঁজো ছেলেটা ঘর থেকে চুপি চুপি সরে গেল। ধীরে ধীরে যেতে যেতে শুনলে, দিদি বলছে:

'কিন্তু সকলেই যে হাসাহাসি করবে ওকে নিয়ে!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই!' মা বললে এমন একটা গাঢ় সুরে যা হেমন্তের বাতাসের মতো সেঁৎসেঁতে।

উত্তেজিত হয়ে দিদি বললে, 'ওর মতো যারা, তাদের লোকের চোখের আড়ালে রাখা উচিত!'

মা বললে, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই, গর্ব করে দেখাবার মতো তো নয়! সত্যি, মাথা আছে মেয়েটার!'

বাপ সায় দিলে, 'ঠিকই বলেছ তোমরা।'

'কিন্তু দেখো, মেয়েটার কী বুদ্ধি...'

দোরগোড়ায় ফিরে দাঁড়িয়ে কুঁজো বললে:

'আমিও বোকা নই, বলে রাখছি...'

বাপ বললে, 'সে দেখাই যাবে।' আর মা বললে:

'কেউ তো তা বলছে না...'

ভাইটিকে নিজের পাশে বসিয়ে দিদি ঘোষণা করল, 'তুই পড়াশুনা করবি বাড়িতে। স্থপতি হতে গেলে যা যা জানা দরকার সব তোকে শিখতে হবে। মন বসবে তো?'

'বসবে। দেখে নিয়ো।'

'কী দেখব?'

'দেখবে যে মন বসছে।'

ওর চেয়ে দিদি লম্বা — আধ-মাথা খানেক উঁচু, কিন্তু ওর কাছে মনে হত দিদি যেন সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছে, মা-বাবাকে পর্যন্ত। দিদির বয়স তখন পনেরো, ওকে দেখে মনে হত একটা কাঁকড়া, কিন্তু দিদিটি ছিল তন্বী, সুঠাম, সবলা — ওর কাছে মনে হত যেন সে পরী, সারা বাড়িখানাকে এবং তাকেও যাদু করে রেখেছে।

এর পর কুঁজোটার কাছে নিয়মিত আসতে শুরু করলে যত শিক্ষাপ্রাণ অমায়িক লোকজন, তারা ওকে কী সব বোঝাত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু ছেলেটা নির্বিকারভাবে স্বীকার করত যে বিজ্ঞান সে বোঝে না। নিরুৎসাহ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকত কোথায় যেন শিক্ষকদের উপর দিয়ে, আর আপন মনে ভেবে যেত নিজের ভাবনা। সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ওর চিন্তা সাধারণ বিষয় নিয়ে নয়, কথা বলত অল্প, কিন্তু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জিগ্যেস করে বসত বিচিত্র রকমের:

'যারা কিছুই করতে চায় না, তাদের নিয়ে কী করা হয়?'

নিখুঁত আদব কায়দার লোক ছিল তার শিক্ষক; গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা কালো পোশাকে তাকে দেখাত ধর্মযাজক ও সৈন্য উভয়ের মতোই। শিক্ষক বললে:

'এদের কপালে খারাপ যত কিছু কল্পনা করা যায় সবই ঘটে! যেমন ধরো, এদের অনেকেই হয়ে বসে সোশ্যালিস্ট।'

কুঁজো বললে, 'ধন্যবাদ।' শিক্ষকদের প্রতি তার আচরণ ছিল সংযত আর শুকনো, পরিণত বয়সীর মতো, 'কিন্তু সোশ্যালিস্ট কী বস্তু?'

'খুব বেশি ভালো হলে ওরা হল কল্পনাপ্রবণ আর অলস, মোটের উপর নৈতিক দিক থেকে বিকৃত, ঈশ্বর, সম্পত্তি, অথবা স্বজাতি সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা নেই।'

ওর শিক্ষকেরা জবাব দিত সব সময়েই খুব সংক্ষিপ্তাকারে এবং সে জবাব তার স্মৃতির মধ্যে গেঁথে বসত যেন পেভমেন্টের পাথর।

'বুড়ি হলেও কি নৈতিক দিক থেকে বিকৃত হতে পারে?'

'নিশ্চয়ই, ওদের মধ্যে...'

'ছোটো মেয়ে?'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা হল জন্মগত...'

শিক্ষকেরা ওর সম্পর্কে বলত:

'অঙ্কে ওর বিশেষ মাথা নেই, কিন্তু নৈতিক প্রশ্নে আগ্রহ খুব বেশি...'

শিক্ষকদের সঙ্গে ওর আলাপের কথা জানতে পেরে দিদি বললে, 'তুই বড়ো বেশি বকিস।'

'আমার চেয়ে ওরা বেশি বকে।'

'ঈশ্বরের কাছে তুই তো তেমন মন দিয়ে প্রার্থনা করিস না...'

'ঈশ্বর তো আমার কুঁজ সারিয়ে দেবে না...'

অবাক হয়ে দিদি চেঁচিয়ে উঠল, 'বটে! এই সব কথা মাথায় ঢুকেছে দেখছি!'

দিদি ঘোষণা করলে, 'এবারের মতো ক্ষমা করলাম, কিন্তু এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দে, বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।'

মেয়েটি তখন লম্বা লম্বা পোশাক পরতে শুরু করেছে, আর ছেলেটির বয়স হয়েছে তেরো।

সে দিন থেকে দিদির অশান্তি বড়ো বেড়ে উঠল। ভাইয়ের কারখানা-ঘরে ঢুকলেই দিদির পায়ের কাছে, ঘাড়ে, মাথায় কি হাতের ওপর কাঠ, তক্তা কি হাতিয়ারপত্র না পড়ে প্রায় যেত না। কুঁজো অবশ্য সব সময়েই একটা হুঁশিয়ারি দিয়ে উঠত:

'সামলে!'

কিন্তু সব সময়েই সে হুঁশিয়ারি হত ঠিক একমুহূর্ত দেরি করে, এবং প্রায়ই জখম হতে হত দিদিকে।

একবার, যন্ত্রণায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে দিদি রাগে বিবর্ণ হয়ে ছুটে গিয়েছিল ভাইয়ের দিকে।

'বিটকেল কোথাকার, ইচ্ছে করে তুই এসব করিস!' বলে থাপ্পড় মেরেছিল কু'জোটার গালে।

সে থাপ্পড় খেয়ে ছেলেটা তার নড়বড়ে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে উল্টে পড়ে গিয়েছিল। তারপর মেজের ওপর বসে না কে'দে, না রাগ করে বলেছিল:

'কী করে ভাবলি ইচ্ছে করে করেছি? আমাকে তো তুই ভালোবাসিস। ভালোবাসিস না?'

যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে পালিয়ে গিয়েছিল দিদি। পরে ফিরে এসেছিল বোঝাবুঝি করার জন্য। বললে:

'এ রকম তো তুই আগে কখনো করিস নি কিনা...'

'আগে তো আমার এসব জিনিস ছিল না' — ভাই জবাব দিয়েছিল শান্তভাবে; লম্বা হাতে চওড়া একটা বৃত্ত এ'কে দেখিয়ে দিয়েছিল তার গোটা ঘরখানা: তার কোণে কোণে স্তূপ করা তক্তা, দেয়ালের পাশে ছুতোর মিস্ত্রির টেবিল, লেদ মেশিনের উপর উ'চু করা কাঠ, সবকিছুই এলোমেলো।

'যত রাজ্যের এই আবর্জনা এনে ঢুকিয়েছিস কেন?' সন্দেহ আর বিরক্তি নিয়ে দিদি জিগ্যেস করেছিল তার চারিপাশে চেয়ে।

'দেখিস না কী হয়!'

বানাবার কাজ তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। খরগোসের জন্য একটা খাঁচা বানিয়েছিল ছেলেটা, কুকুরের জন্য একটা বাসা, তারপর এখন কাজ করছিল একটা নতুন ধরনের ই'দুর-কল বানাবার জন্য। দিদি তার কাজের অগ্রগতি লক্ষ্য করে চলছিল সোৎসাহে। খাওয়ার সময় মা-বাপের কাছে গর্ব করে ভাইয়ের সাফল্যের কথা জানাত। তারিফ করে মাথা দোলাত বাপ। বলত:

'ছোটো ছোটো জিনিস থেকেই তো সব শুরু। সর্বদা এমনি করেই তো হয়!'

আর মা তার মেয়েটিকে আলিঙ্গন করে ছেলেকে উপদেশ দিত:

'দিদি তোর জন্যে কি না করেছে, জানিস তার কদর করতে?'

'জানি' — জবাব দিত কুঁজোটা।

ইঁদুর-কলটা বানানো শেষ হয়ে গেলে, কুঁজো তার দিদিকে ডেকে এনে বিদঘুটে যন্ত্রটা দেখালে।

বললে, 'খেলনা নয় কিন্তু, এটাকে পেটেন্ট করে নেওয়াও চলে! দ্যাখ না কি সহজ, অথচ কি জোর। ছুঁয়ে দ্যাখ এখানটা!'

দিদি আঙুল ছোঁয়ানো মাত্র কী একটা খট করে বন্ধ হয়ে গেল। বেদম চেঁচাতে লাগল মেয়েটা, আর কুঁজো তার পাশে লাফাতে লাফাতে বিড় বিড় করতে লাগল:

'এ হে, ভুল হাতটা... ভুল হাতখানা...'

ছুটে এল মা তারপর চাকর-বাকরেরা। ইঁদুর-কলটা ভেঙে তারা পিষে যাওয়া নীল আঙুলটা খালাস করে মূর্ছিত অবস্থায় বয়ে নিয়ে গেল মেয়েটিকে।

সেই দিন সন্ধ্যেয় দিদি ভাইকে ডেকে পাঠিয়ে জিগ্যেস করলে:

'ইচ্ছে করে তুই এটা করেছিস। আমার ওপর তোর ভারি রাগ। কিন্তু কেন?'

কুঁজটা দুলিয়ে শান্ত মৃদুস্বরে ভাই বললে:

'স্রেফ ভুল হাতটা দিয়ে তুই ওটা ছুঁয়েছিলি, তাছাড়া আর কিছু নয়।'

'মিথ্যে কথা!'

'কিন্তু... তোর হাতখানা বিছছিরি করে দিয়ে আমার কি লাভ? তাছাড়া, যে হাতটা দিয়ে তুই আমাকে মেরেছিলি, ওটা তো সে হাতখানাও নয়...'

'সাবধান পঙ্গু কোথাকার, আমার চেয়ে বুদ্ধি তোর বেশি নয়!..'

'তা জানি' — ভাই স্বীকার করলে।

ওর কোনা-খোঁচা মুখখানা বরাবরের মতো একই রকম শান্ত, চোখদুটো চিন্তিত। ও রাগ করতে কিংবা মিছে কথা বলতে পারে ব'লে বিশ্বাস করা যায় না।

এর পর থেকে দিদি তার ঘরে অত ঘন ঘন যাওয়া বন্ধ করলে। নানা রঙের গাউন পরা তার হাসিখুশি বান্ধবীরা আসত তাদের বাড়িতে; বড়ো বড়ো এবং ঈষৎ ঠাণ্ডা, গোমড়া গোমড়া ঘরগুলোতে ওরা চমৎকার ছোটাছুটি করে বেড়াত, আর ছবি, মূর্তি, ফুল আর গিল্টিগুলো সব যেন উষ্ণ হয়ে উঠত তাদের পেয়ে। মাঝে মাঝে ভাইয়ের ঘরখানায় ও নিয়ে আসত বান্ধবীদের, গোলাপী নখের ছোটো ছোটো আঙুলগুলো ওরা বাড়িয়ে দিত কেতামাফিক, কুঁজোর হাতটা ছুঁতো আলতোভাবে পাছে বুঝি তা ভেঙে যায়। অতি সবিনয়ে সস্নেহে ওরা কথা কইত ওর সঙ্গে, আর হাতিয়ারপত্র, আঁকা-জোঁকা, কাঠ আর কাঠের চটার স্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা কুঁজোর দিকে ওরা চেয়ে দেখত সবিস্ময়ে কিন্তু বিনা আগ্রহে। কুঁজো জানত, মেয়েগুলো তাকে বলে 'আবিষ্কারক', এটা ওর দিদিই মেয়েদের বুঝিয়েছিল। ওরা সকলেই আশা করত, ভবিষ্যতে সে এমন একটা কিছু করবে, যাতে তার বাপের নাম ধন্য হয়ে যাবে — দিদি বলে বেড়াত একেবারে দৃঢ়নিশ্চিতভাবে।

'ও দেখতে সুন্দর নয় বটে, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান' — প্রায়ই বলত মেয়েটা।

উনিশ বছরে পড়েছিল দিদি, পাণিপ্রার্থীও ছিল, এমন সময় ওদের মা বাপ দু'জনেই মারা গেল জলে ডুবে। নৌকায় প্রমোদ বিহারে গিয়েছিল ওরা, কিন্তু একটা আমেরিকান মাল জাহাজের মাতাল সারেঙের পাল্লায় পড়ে ধাক্কা খেয়ে নৌকাখানা ডুবে যায়। দিদিটিরও কথা ছিল নৌবিহারে যাবার কিন্তু হঠাৎ দাঁতের ব্যথায় যাওয়া হয় নি।

মা-বাপের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দাঁতের ব্যথা ভুলে মেয়েটি ঘরময় ছোটাছুটি করে হাত কচলাতে কচলাতে কাঁদতে লাগল:

'না, না, এ হতে পারে না! হতে পারে না!'

দরজার পরদাটা গায়ে জড়িয়ে কুঁজো ভাইটা চৌকাটের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দিদিকে, তারপর কুঁজটা দুলিয়ে বললে:

'বাবার শরীরটা তো ছিল বেশ মোটা মোটা আর ফাঁপা, কি করে ডুবল বুঝতে পারছি না...'

শুনে দিদি চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর বলছি! কারো জন্যে তোর একটুও ভালোবাসা নেই!'

ও বললে, 'মিষ্টি কথা কি করে কইতে হয় তা যে আমি জানি না।'

বাপের লাস খুঁজে পাওয়া যায় নি। মার মৃত্যু হয়েছিল জলে উল্টে পড়ার আগেই। মায়ের লাসটা নিয়ে আসা হয়েছিল। কফিনের মধ্যে মহিলা শুয়ে রইল ঠিক তেমনি ভাবে, যেমন ছিল সে তার জীবদ্দশায় — বুড়ো গাছের মরা ডালের মতো শুকনো আর ভঙ্গুর।

মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে যাবার পর তীক্ষ্ম ধূসর চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শোকার্ত কঠিন গলায় দিদি বললে, 'তুই আর আমি এবার একা পড়লাম। চালানো কঠিন হবে আমাদের। আমরা কিছুই তো জানি না, অনেক লোকসান করে ফেলব হয়ত। কী দুঃখের কথা, এক্ষুনি যে বিয়ে করে ফেলব তারও জো নেই ছাই!'

'ওহ্ হো!' বলে উঠল কুঁজো।

'ওহ্ হো মানে কি?'

কুঁজো খানিক ভেবে বললে:

'আমরা একা পড়লাম।'

'কথাটা বলছিস এমনভাবে যেন ভারি খুশি হয়েছিস!'

'কিছুতেই আমি খুশি হই না।'

'সেইটাই খুবই আফ্‌সোসের কথা! জীবন্ত মানুষের মতো তুই একটুও নোস্‌!'

সন্ধ্যেবেলায় মেয়েটির পাণিপ্রার্থী আসত তার কাছে। ছোটোখাটো চেহারার চটপটে একটি লোক, কটা চুল, রোদে পোড়া গোল মুখ, পাকানো মোচ। সারা সন্ধ্যে লোকটা অনবরত হাসত, এবং এমনি করে সারা দিনটাও যে সে হেসে যেতে পারত, তাতে সন্দেহ ছিল না। বাগ্‌দান হয়ে গিয়েছিল ওদের, শহরের সেরা, সবচেয়ে নিরিবিলি ও পরিচ্ছন্ন একটা রাস্তায় বাড়ি তৈরি হচ্ছিল ওদের জন্য। নতুন বাড়িটার কাছে কুঁজো কখনো যেত না, বাড়িটা নিয়ে আলোচনাও সে পছন্দ করত না। দিদির ভাবী বর তার আংটি পরা ক্ষুদে ক্ষুদে গোলে গোল হাত দিয়ে ওর কাঁধে চাপড় মেরে হাসত, এবং ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য দাঁত বার করে বলত:

'একবার গিয়ে তোমার দেখে আসা উচিত, হে। কি বলো?'

নানা অছিলায় কুঁজোটা অনেকদিন তাতে আপত্তি করে এসেছিল, কিন্তু শেষ কালে একদিন সে রাজী হল। দিদি আর দিদির প্রেমাস্পদের সঙ্গে গেল সেখানে আর বাড়ি তৈরির জন্য বাঁধা ভারা বেয়ে পুরুষ দুজন উঠে গেল ওপরে, কিন্তু ওপর পর্যন্ত পৌঁছিয়েই ওরা পড়ে গেল নীচে। ভাবী বর পড়ল খাড়া নিচে, চুনের জালার মধ্যে, আর ভারার খোঁচায় পোশাক আটকিয়ে গিয়ে কুঁজোটা ঝুলতে লাগল শূন্যে। রাজ মিস্ত্রিরা ওকে উদ্ধার করে নামিয়ে আনল, হাত আর পা মচকিয়ে যাওয়া ছাড়া ওর বেশি কিছু হয় নি। মুখে ধাক্কা খেয়েছিল, কিন্তু ভাবী বরের শিরদাঁড়া ভেঙে ফেটে বেরিয়ে গিয়েছিল পাঁজরা।

ভির্মি যেতে শুরু করল দিদি। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়িয়ে শাদা শাদা ধুলো ওড়াতে লাগল মেয়েটা। তারপর অনেক দিন ধরে কেঁদেছিল সে, প্রায় এক মাসেরও বেশি, এবং তারপর থেকে ওর

চেহারা হতে লাগল ঠিক ওর মায়ের মতো, হয়ে উঠল রোগা আর লম্বা, নিষ্প্রাণ সেঁৎসেঁতে গলায় বলতে শুরু করলে:

'তুইই আমার শনি!'

আর নিঃশব্দে একদৃষ্টিতে মাটির দিকে চেয়ে থাকত কুঁজোটা। কালো পোশাক পরা শুরু করলে দিদি, ভুরুদুটো কুঁচকে থাকত সব সময়, ভাইকে দেখলে এত জোরে দাঁতে দাঁত চাপত যে খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠত গালের হাড়। দিদিকে এড়িয়ে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করত ভাই, নিজের আঁকা-জোঁকা নিয়ে পড়ে থাকত চুপ করে, একলা। এমনি করেই ওরা কাটালে, তারপর যেদিন থেকে ভাই সাবালক হল সেদিন থেকে ওদের দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা। এই যুদ্ধের উত্তেজনায় ওরা ওদের সমগ্র জীবন সঁপে দিলে, পারস্পরিক অপমান আর মনে আঘাতের দৃঢ় বাঁধনে ওরা বাঁধা পড়ল।

যেদিন ছেলেটি সাবালক হয়েছিল, সেদিন সে দিদিকে বলেছিল কর্তৃত্বের সুরে:

'দুনিয়ায় জ্ঞানী যাদুকরও নেই, উপকারী পরীও নেই, আছে শুধু লোক। তাদের কেউ খারাপ, কেউ বোকা — দয়াধর্ম সম্পর্কে যা-কিছু বলা হয় তা নিছক রূপকথা! কিন্তু আমি সেই রূপকথাকেই সত্যি করতে চাই। তুই কী বলেছিলি একদিন মনে আছে: বড়োলোকের বাড়িতে সবকিছুই হতে হবে হয় সুন্দর, নয় বুদ্ধিমান? বড়োলোকের শহরেও সবকিছু সুন্দর হওয়া উচিত। শহরের বাইরে জমি কিনে আমি তাই একখান বাড়ি তৈরি করছি, তাতে থাকব আমি এবং আমার মতো যারা বিকলাঙ্গ তারা। এই শহর থেকে তাদের আমি সরিয়ে নিয়ে যাব সেখানে, এখানে বাস করা তাদের পক্ষে ভারি কষ্টের, ওদের দিকে তাকাতে তোর মতো লোকেদের বিছছিরি লাগে...'

'না' — দিদি বললে, 'খবর্দার না! এ যে পাগলামি!'

'কিন্তু এতো তোরই কথা।'

ওরা তর্ক করলে সংযতভাবে, উত্তেজিত না হয়ে, ঠিক যেমনভাবে তর্ক করতে পারে শুধু তারা, যারা পরস্পরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে এবং ঘৃণা চেপে রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না।

'আমি ঠিক করে ফেলেছি!' ও বললে।

দিদি বললে, 'আমি ঠিক করি নি।'

কুঁজটা উঁচু করে ও চলে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই দিদি জানল, ও জমি কিনেছে, ভিত্ খোঁড়া হচ্ছে, ইঁট, পাথর, লোহা, কাঠ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়ি গাড়ি।

'এখনো খোকা আছিস নাকি তুই?' দিদি জানতে চাইল, 'এটাও একটা খেলা ভেবেছিস, না?'

ও জবাব দিলে না।

সপ্তাহে একদিন করে দিদি চলে যেত শহরের বাইরে, ছোট্ট একটা ঘোড়ার গাড়ি করে। শুকনো হাড্ডিসার পিঠটা টান করে সগর্বে বসে গাড়ির শাদা ঘোড়াটাকে সে চালাত নিজে, আর যেখানে বাড়ি উঠছিল সেই জায়গাটা দিয়ে যাবার সময় কমিয়ে দিত গাড়ির গতি, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, মাংসের মতো লাল লাল ইঁটগুলো শরীরের রগের মতো লোহার কড়িবর্গার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আর স্নায়ুতন্তুর মতো থাকে থাকে বসছে হলুদ-রঙা কাঠগুলো। দূরে থেকে চোখে পড়ত ভারার ওপর ছড়ি হাতে কাঁকড়ার মতো গুটি গুটি হাঁটছে তার ভাই, মাথায় একটা দলামোচড়া টুপি, মাকড়সার মতো সর্বাঙ্গ ধূলি-ধূসর। ভাই বাড়ি ফিরলে দিদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত তার চাঙ্গা মুখখানা, কালচে চোখদুটোর দিকে, তা হয়ে উঠত আগের চেয়ে কোমল আর স্বচ্ছ।

ও বলেছিল, 'না, আমি বলছি, এটা ভালো মাথায় এসেছে আমার। এতে আমাদের মঙ্গল, তোমাদেরও মঙ্গল! কিছু একটা গড়ে তোলার

মতো চমৎকার জিনিস আর নেই, মনে হচ্ছে শীগগিরই নিজেকে বেশ সুখী বলে ভাবতে পারব এবার...'

'সুখী?' দিদি তার বিকলাঙ্গ শরীরটারে আপাদমস্তক দেখলে একটা বিচিত্র দৃষ্টি নিয়ে।

'হ্যাঁ, সুখী। জানিস, যে লোকগুলো কাজ করে, তারা আমাদের চেয়ে একেবারে তফাত, ওদের দেখে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ভাবনা মনে আসে। রাজমিস্ত্রি হয়ে কয়েক ডজন বাড়ি তৈরি করেছে যে শহরে তার রাস্তা দিয়ে হে'টে যেতে নিশ্চয় কী ভালোই না লাগত! মজুরগুলোর মধ্যে আছে বেশ কিছু সোশ্যালিস্ট। প্রথমত বেশ ধীর স্থির গোছের লোক ওরা, আর মর্যাদা-জ্ঞানও বেশ টনটনে, এ কথা মানতেই হবে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের আশেপাশের লোক-গুলো সম্পর্কে আমরা কী অল্পই না জানি...'

'কী অদ্ভুত সব কথা' — মন্তব্য করলে দিদি।

দিনের পর দিন কু'জোটা আরো সজীব, আরো মুখর হয়ে উঠতে লাগল।

দিদিকে সে বললে, 'আসলে তুই যা চেয়েছিলি, তাই ঘটতে চলেছে। আমি হবো সেই জ্ঞানী যাদুকর, শহর থেকে বিকলাঙ্গদের যে সরিয়ে নেবে। ইচ্ছে করলে তুইও একটা উপকারী পরী হতে পারিস! জবাব দিচ্ছিস না যে?'

সোনার ঘড়ির চেনটা নিয়ে খেলা করতে করতে দিদি বলেছিল, 'পরে এ নিয়ে কথা হবে।'

একদিন ভাই তার সঙ্গে এমন এক সুরে কথা কইলে, যা দিদির কাছে একেবারে নতুন।

'তুই আমার যা ক্ষতি করেছিস, তার চেয়ে হয়ত তোর ক্ষতি আমি করেছি বেশি...'

অবাক হয়ে গেল দিদি।

'আমি — ক্ষতি করেছি তোর!?'

'শোন, দিব্যি নিয়ে বলছি, তুই আমাকে যতটা দোষী বলে ভাবিস ততটা দোষী আমি নই! আমার পাদুটো খুব শক্ত নয়, তাই সেদিন হয়ত আমি তাকে ধাক্কা দিয়েছি, কিন্তু সেটা ইচ্ছে করে করি নি, বিশ্বাস কর! তার চেয়ে বরং অনেক বেশি দোষ করেছিলাম সেদিন, যে হাত দিয়ে তুই আমাকে মেরেছিলি সেটাকে বিকৃত করে দেবার চেষ্টা করে...'

দিদি বললে, 'থাক ও সব কথা!'

'পরস্পরের প্রতি আমাদের আরো সদয় হওয়া উচিত!' অস্ফুট স্বরে বললে কুঁজো, 'শুভ জিনিসটা নেহাত স্বপ্ন নয়, আমার মনে হয় তা সম্ভব...'

শহরের বাইরে বিরাট বাড়িখানা তৈরি হতে লাগল আশ্চর্য তাড়াতাড়ি, উর্বরা মাটিকে আবৃত করে বাড়িখানা উঁচু হয়ে উঠল সেই আকাশের দিকে, যার রঙ সব সময়েই ধূসর, সব সময়েই যেখানে বৃষ্টির আশংকা।

একদিন একদল সরকারী অফিসার এল জায়গাটা দেখতে। তারা দালানটাকে পরীক্ষা করে দেখল, নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কী আলাপ করলে, তারপর হুকুম দিলে, কাজ বন্ধ করতে হবে।

চিৎকার করে উঠল কুঁজো, 'এ তোর কীর্তি!' আক্রোশে দিদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে তার লম্বা লম্বা সবল হাতদুটো দিয়ে গলা চেপে ধরল ওর। কিন্তু কোথা থেকে যেন লোকজন এসে ওকে ছাড়িয়ে দিল।

দিদি বললে, 'দেখুন, আপনারা, সত্যিই সত্যিই ও বিকৃত মস্তিষ্ক! ওর দরকার অভিভাবকের অধীনে থাকা। ব্যাপারটা শুরু হয় বাবা মারা যাবার পরেই, বাবাকে ও ভয়ানক ভালোবাসত। বাড়ির চাকর-নাকরদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, ওরা সকলেই ওর রোগের কথা

জানে। এ নিয়ে ওরা কখনো কিছু বলে নি, তার কারণ ওরা হল ভালোমানুষ লোক, এ বাড়িতে ওদের অনেকেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ, তাই এ বাড়ির মান ওরা নষ্ট করতে চায় নি। আমাদের দুর্ভাগ্যের কথাটা আমিও চেপে রেখেছিলাম, কেননা ভাইটি উন্মাদ, এ কথা তো আর বড়ো গলা করে জাহির করার নয়...'

এ কথা শুনে মুখ নীল হয়ে গেল কুঁজোটার, কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল চোখদুটোর। বোবা হয়ে গেল সে, শুধু যারা ওকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়াবার চেষ্টা করতে লাগল নিঃশব্দে। দিদি বলে চলল:

'সর্বনেশে এই বাড়ি তোলার কথাই ধরুন না কেন, বাড়িখানাকে আমি শহরকে দিয়ে দিতে চাই বাবার নামে একটা মানসিক রোগের হাসপাতাল করার জন্যে...'

এই পর্যন্ত শুনে একটা বিকট চিৎকার করে কুঁজোটা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। লোকজন ওকে নিয়ে গেল ধরাধরি করে।

যত তাড়াতাড়ি ও শুরু করেছিল, তত তাড়াতাড়ি বাড়িখানাকে শেষ করে ফেললে দিদি। বাড়িখানা যখন সম্পূর্ণ হল, তখন প্রথম রোগী হিশেবে ঢুকল তার ভাই। সাত বছর সে ওখানে ছিল — জড়ভরত হয়ে পড়ার পক্ষে সময়টা যথেষ্ট। সেখানে তার মানসিক আতঙ্কের ব্যাধি দেখা দিল। ওদিকে দিদিরও বয়স পেরিয়ে গিয়েছিল, মা হওয়ার আর কোন আশা রইল না তার। এবং তারপর দিদি যখন দেখলে যে তার শত্রু খতম হয়েছে আর কখনো সে ভালো হবে না, তখন ভাইটিকে সে নিয়ে এল নিজের তত্ত্বাবধানে।

আর তাই ওরা ফিরছে বিশ্বভ্রমণ করে, দৃষ্টিহীন পাখির মতো ঠেকছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, সবকিছুর দিকেই তাকাচ্ছে এক চিন্তাহীন নিরানন্দ চোখ মেলে, কিন্তু নিজেদের ছাড়া কোথাও কিছুই ওদের চোখে পড়ার নয়।

বুদ্ধিজীবী

তেলের মতো ঘন নীল জল। তার ভেতর মসৃণভাবে ঘুরছে জাহাজের প্রপেলার। তা থেকে শব্দ প্রায় উঠছেই না। পায়ের নিচে পাটাতনে কোন কাঁপন নেই, শুধু মেঘশূন্য আকাশের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠে গিয়ে তির তির করে কাঁপছে মাস্তুল। মাস্তুলের দড়াদড়িগুলো বেহালার তারের মতো টানটান, মৃদু গান উঠছে তা থেকে। কিন্তু সে কাঁপন সকলের এত সয়ে গেছে যে প্রায় নজরেই পড়ে না। মনে হয় জাহাজটা যেন বা দাঁড়িয়েই আছে স্থির হয়ে, মসৃণ জলের ওপর শাদা সুঠাম একটি রাজহাঁসের মতো। জাহাজটা চলছে তা ঠাহর পেতে হলে তাকাতে হবে রেলিং-এর ওপাশে, শাদা জাহাজখানার দুপাশ থেকে সবুজ রঙের তরঙ্গ সরে যাচ্ছে বেঁকে গিয়ে, তারপর চওড়া নরম ভাঁজে আকুঞ্চিত হয়ে তা ছুটে পালাচ্ছে পারার মতো একটা ঝিলিক আর নিদ্রাতুর একটু কল্লোল বয়ে।

ভোরবেলা। সমুদ্র পুরোপুরি জেগে ওঠে নি তখনো, সূর্যোদয়ের অরুণাভা তখনো মিলিয়ে যায় নি আকাশে। গরুগনা দ্বীপটা পার

হয়ে চলে এসেছে জাহাজে, বনে ছাওয়া দ্বীপটা নিঃসঙ্গ, গোমড়া একটা পাথর, তার মাথায় একটা ধূসর গোল মিনার আর ঘুমন্ত সাগরের তীরের কাছে গাদাগাদি করে আছে কয়েকটা শাদা শাদা ছোটো ছোটো বাড়ি। খানিক আগে তীরবেগে পেরিয়ে গেল কয়েকটা ডিঙ্গি-নৌকো, ওই দ্বীপটা থেকে ওরা বেরিয়েছে সার্ডিন মাছ ধরতে। ওদের লম্বা লম্বা দাঁড় ফেলার ছপছপ শব্দ আর যেন সূর্যকে অভিবাদন করার ভঙ্গিতে নৌকোর ওপর দাঁড়ানো মাঝিদের পাতলা মূর্তিগুলোর দুলুনির একটু স্মৃতি পড়ে রইল শুধু।

জাহাজের পেছনে সবুজ মতো ফেনার একটা চওড়া ফালি, সিন্ধু-চিলেরা তার ওপর চক্কর দিয়ে চলেছে আলস্যে। কে জানে কোথা থেকে ভেসে উঠছে এক-একটা সামুদ্রিক সাপ, চুরুটের মতো সিধে হয়ে নিঃশব্দে সাঁতরে চলেছে জলের ওপর, তারপর হঠাৎ তীরের মতো জল ফুঁড়ে ডুব মারছে অতলে।

দূরে মেঘের মতো ভেসে উঠল লিগুরিয়ান উপকূলের লাইলাক পাহাড়গুলো। আর ঘণ্টা দুই-তিনের মধ্যেই মর্মরনগরী জেনোয়ার ভীড়াক্রান্ত বন্দরে ঢুকবে জাহাজ।

ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগল সূর্য, বোঝা গেল দিনটা বেশ গরম হবে।

ডেকের ওপর ছুটে এল দুটি পরিচারক -- একজন নেপ্‌ল্‌স্‌-এর লোক, অল্প বয়স, একহারা চেহারা, চটপটে স্বভাব, চঞ্চল মুখের ভাবখানা ঠিক কি ধরা যায় না — অন্যজন মাঝারি বয়সের লোক, পাকা মোচ, কালো ভুরু, গোল মাথার ওপর খোঁচা খোঁচা রুপোলী চুল, বাঁকা নাকে আর গম্ভীর বুদ্ধিমান একজোড়া চোখ। পরস্পর হাসি-তামাসা করতে করতে ওরা চটপট কফির জন্য টেবিল সাজিয়ে চলে গেল। কিছু পরেই কেবিন থেকে এক এক করে বেরিয়ে আসতে লাগল যাত্রীরা — এলো একটি মোটাসোটা বিষণ্ণ ভদ্রলোক, মাথাখানা

ছোটো, ফোলা ফোলা মুখ, লালচে গাল, আলতা রঙের ফুলো ফুলো ঠোঁট বিষাদ আর ক্লান্তিতে ঝুলে আছে। এল ধূসর জুলপিওয়ালা আর একজন, লম্বা, ফিটফাট, চোখদুটো নজরে পড়ে না, চ্যাপ্টা হলদে মুখের ওপর বোতামের মতো একটু নাক। তার পেছনে পেতলের বাঁধানো চৌকাটে হোঁচট খেয়ে লাফিয়ে এল একটি গোলগাল ভুঁড়িওয়ালা লোক, পাটকিলে চুল, পাকানো জঙ্গী মোচ, গায়ে একটা পাহাড়ে পোশাক, টুপিতে সবুজ পালক গোঁজা। তিনজনেই চলে গেল জাহাজের রেলিংটার কাছে। মোটা লোকটা চোখ কুঁচকে মনমরার মতো বললে:

'কী চুপচাপ, তাই না?'

জুলপিওয়ালা লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে এমনভাবে দাঁড়াল যে তাকে দেখাল একটা হাঁ-করা কাঁচির মতো। পাটকিলে-চুলো লোকটা বার করল একটা সোনার ঘড়ি — দেয়াল-ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো প্রকান্ড। ঘড়িটার দিকে চাইল একবার তারপর তাকাল আকাশের দিকে, ডেকের দিকে, এবং পায়ে তাল ঠুকে ঘড়িটা দোলাতে দোলাতে শিস দিতে লাগল।

দেখা দিল দুটি মহিলা, একটি অল্পবয়সী, পুরুষ্টু, মুখখানা চীনেমাটির মতো শাদা, দুধ-নীল সোহাগী চোখ, কালো ভুরুদুটো মনে হয় যেন আঁকা, একটা ভুরু আর একটার চেয়ে একটু উঁচুতে। অন্য জন বয়স্ক, চোখা নাক, রঙচটা চুলে ফলাও কবরী, বাঁ গালের ওপর একটা মস্তো কালো তিল, গলায় দুটো সোনার চেন, ছাই রঙের গাউনের ওপর কোমরের কাছে কিছু অলঙ্কার আর একটা লরনেট্ ঝুলছে।

কফি পরিবেশন করা হল। কোন কথা না বলে অল্পবয়সী মেয়েটি টেবিলে বসে কনুই পর্যন্ত নগ্ন হাত দুখানার একটা অদ্ভুত গোলালো ভঙ্গি করে ঢালতে শুরু করলে কালো রঙের পানীয়টা।

পুরুষেরা টেবিলের কাছে এসে নীরবে আসন নিলে। একটা কাপ টেনে নিয়ে মোটা লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে:

'গরম পড়বে আজ...'

বয়স্ক মহিলাটি বললে, 'কোলের ওপর কফি পড়ছে তোমার।'

মাথা নিচু করলে লোকটা। তাতে ওর চোয়ালটা নিচু হয়ে থুতনিটা ঠেকল বুকের কাছে। টেবিলে কাপটা নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে প্রথমে ধূসর ট্রাউজারের ওপর থেকে কফির ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেললে, তারপর ঘর্মাক্ত মুখটা মুছে নিল।

হঠাৎ কেমন একটা চড়া গলায় পাদুটো গুটিয়ে এনে পাটকিলে-চুলো লোকটা বলে উঠল, 'হ্যাঁ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, বামপন্থীরাও যখন গুণ্ডামির অভিযোগ করতে শুরু করেছে, তখন...'

বয়স্ক মহিলাটি তাকে থামিয়ে দিলে, 'আহ্, আর বোকো না, ইভান। লিজা আসবে না?'

'লিজার শরীর ভালো নয়' — ঝংকৃত গলায় বললে তরুণীটি।

'কিন্তু সমুদ্র তো একেবারে শান্ত...'

'আহ্, একটা মেয়ের পক্ষে ওই রকম অবস্থায়...'

মোটা লোকটা হেসে চোখ বন্ধ করলে মাধুর্যে।

জাহাজের কাছে মসৃণ জলের ওপর একদল শুশুকের হুটোপুটি একমনে দেখছিল জুলপিওয়ালা লোকটা। বললে:

'শুশুকগুলো দেখতে ঠিক শুয়োরের মতো।'

জবাবে পাটকিলে-চুলো লোকটা বললে:

'মোটের ওপর এখানে সবেতেই শুয়োরের ভাবটা বেশি।'

রংচটা চুল মহিলাটি নাকের কাছে কাপটা তুলে গন্ধ শুঁকে বিস্বাদের মুখভঙ্গি করল:

'অখাদ্য!'

'হ্যাঁ। আর দুঃখের কথা বলতে হলে সেটা, এ্যাঁ?' মোটা লোকটা আতঙ্কের ভাব করে চোখ মটকাল।

চীনেমাটি রঙের মেয়েটি পোঁ ধরলে, 'সবকিছুই নোংরা! কী নোংরা! লোকগুলোও একেবারে ইহুদীদের মতো দেখতে...'

পাটকিলে-চুলো লোকটা জুলপিওয়ালার কানের কাছে মুখ নিয়ে হড়বড়িয়ে কী যেন বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন গর্ব করে মুখস্থ করা একটা পাঠ আওড়াচ্ছে শিক্ষকের কাছে। অন্য জন শুনছিল একটা সুড়সুড়ি মেশা ঔৎসুক্য নিয়ে, অল্প অল্প মাথা নেড়ে। চ্যাপ্টা মুখের ওপর তার হাঁ-মুখটা দেখাচ্ছিল যেন শুকিয়ে ওঠা কাঠে একটা ফাটল। মাঝে মাঝে ওকে থামিয়ে দিয়ে একটা অদ্ভুত শ্যাওলাটে স্বরে বলার চেষ্টা করছিল ও, 'মানে, আমার নিজের সুবায়...'

কিন্তু তার বেশি কিছু আর না বলে, মাথা হেলিয়ে ফের সে মন দিয়ে কান পেতে থাকছিল পাটকিলে-চুলো লোকটার মোচের দিকে।

মোটা লোকটা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে:

'কী ঘ্যানর ঘ্যানর করতেই না পারো তুমি, ইভান...'

'কিন্তু আমার কফিটা দিন!'

শব্দ করে ও চেয়ারটা ক্যাঁচকোঁচিয়ে টেনে আনল টেবিলের কাছে আর তার সঙ্গী বেশ অর্থময়ভাবে ঘোষণা করলে:

'ইভানের মাথা আছে।'

বয়স্ক মেয়েটি তার লরনেট্ চশমা দিয়ে জুলপিওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভালো ঘুম হয় নি তোমার।' লোকটা মুখের ওপর একবার হাত বুলিয়ে তালুর দিকে তাকাল:

'মনে হচ্ছে মুখে কে যেন পাউডার লাগিয়ে দিয়েছে, তোমার মনে হচ্ছে না?'

তরুণীটি চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, কাকু! এ হল ইতালির আবহাওয়ার জন্যে! এখানে ভয়ানক শুকিয়ে যায় চামড়া!'

'দেখেছিস লিদিয়া, এদের চিনিগুলো কী খারাপ!' জিগ্যেস করলে বয়স্ক মহিলাটি।

এই সময় ডেকে এসে দাঁড়াল একটি বিপুলায়তন লোক, ঘন কোঁকড়া পাকা পাকা চুল, প্রকান্ড নাক, ফুর্তিবাজ চোখ, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। রেলিঙের পাশে দাঁড়ানো পরিচারকগুলো সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালে তার দিকে।

অমায়িকভাবে তাদের দিকে মাথা দুলিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললে লোকটা, 'শুভদিন হে, শুভদিন!'

রুশীরা চুপ করে গিয়ে চোরা চোখে তাকালে ওর দিকে। গুপো ইভান নিচু গলায় সকলকে বললে:

'দেখেই বোঝা যায় সৈন্যদলে ছিল, এখন অবসর নিয়েছে...'

ওরা তাকিয়ে আছে দেখে পাকাচুলো লোকটা মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে ভদ্র অভিবাদন করল রুশীদের। বয়স্ক মহিলাটি মাথা তুলে তার লরনেটের মধ্যে দিয়ে উদ্ধতভাবে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। গুপো কেন জানি থতমত খেয়ে দ্রুত মুখ ফেরালে অন্য দিকে এবং পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে দোলাতে শুরু করল আবার। অভিবাদনের জবাব দিলে শুধু মোটা লোকটা, থুতনিটা বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে। এতে ইতালিয়ানটা কেমন হকচকিয়ে গিয়ে ফের চুরুটটা তুলে নিল ঠোঁটের কোণে। বয়স্ক পরিচারকটিকে জিগ্যেস করলে নিচু গলায়:

'রুশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন রুশী লাট আর তাঁর পরিবার পরিজন...'

'রুশদের মুখে সব সময়ই কেমন দয়ামায়ার একটা ছাপ থাকে...'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভারি ভালো লোক...'

'স্লাভ জাতগুলোর মধ্যে ওরাই সবচেয়ে ভালো বৈকি...'

'তবে একটুখানি হেলাফেলা গোছের আর কি...'

'হেলাফেলা? সত্যি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়, অন্যদের সম্পর্কে ওদের তাচ্ছিল্য আছে।'

মুটকো রুশীটা লাল হয়ে উঠল। আকর্ণ হাসি হেসে অনুচ্চ স্বরে বললে:

'ওরা আমাদের নিয়েই আলাপ করছে...'

বিরক্ত হয়ে মুখ কুঁচকে বয়স্কা জিগ্যেস করলে, 'এ্যাঁ? কি বলছে?'

খুক খুক করে হেসে জবাব দিলে মুটকো, 'বলছে স্লাভদের মধ্যে আমরাই সেরা।'

মহিলাটি ঘোষণা করলে, 'ওরা তোষামুদে।' এবং পাটকিলে-চুলো ইভান তার ঘড়িটা পকেটে রেখে দুই হাতে মোচ পাকাতে পাকাতে অবজ্ঞাভরে জানাল:

'সবাই ওরা আমাদের সম্পর্কে আশ্চর্য অজ্ঞান...'

মুটকো বললে, 'এই দ্যাখো, কোথায় ওরা প্রশংসা করছে, আর তুমি বলে বসলে, ওরা কিছুই জানে না বলেই...'

'যত বাজে কথা! আমি ওটা বলছিলাম সাধারণভাবে... আমরা যে সেরা সে তো আমি জানি।'

জুলপিওয়ালা মন দিয়ে শুশুকের খেলা দেখেই যাচ্ছিল সারাটা সময়। নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথা দুলিয়ে বললে:

'কী বোকা মাছগুলো!'

পাকাচুলো ইতালিয়ানটার সঙ্গে এসে জুটেছিল আরো দু'জন: একজন বুড়ো, চোখে চশমা, গায়ে কালো ফ্রক-কোট। অন্য জন তরুণ, লম্বা লম্বা চুল, ফ্যাকাশে মুখ, চওড়া কপাল আর মোটা ভুরু। রুশীদের কাছ থেকে পাঁচ পা দূরে ওরা তিনজনেই দাঁড়িয়ে রইল রেলিংটার কাছে।

কাঁচাপাকা চুলো লোকটা নিচু গলায় বললে:

'রুশদের দেখলেই আমার মনে পড়ে মেসিনা শহরে ভূমিকম্পের কথা...'

'মনে আছে, নেপ্‌ল্‌স্‌-এ সেই যে রুশ নাবিকেরা এসেছিল, তাদের কী রকম স্বাগত করা হয়েছিল?' বললে তরুণ।

'ঠিকই, নিজের দেশের বনে-জঙ্গলে ফিরে গেলেও সে অভ্যর্থনার কথাটা ওদের মনে থাকবে!'

'ওদের সম্মানে যে পদকটা তৈরি হয়েছিল, দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম। তার কাজটা অবশ্য আমার ভালো লাগে নি।'

'মেসিনা সম্পর্কে আলাপ করছে ওরা' — মুটকো জানাল তার সঙ্গীদের।

'অথচ হাসাহাসি করছে! আশ্চর্য!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল তরুণী।

সিন্ধু-চিলগুলো উড়ে এসে নাগাল ধরল জাহাজের। সজোরে বাঁকা বাঁকা ডানা নেড়ে একটা চিল উড়তে লাগল জাহাজের ডেকের ওপর। তরুণীটি বিস্কুট ছুড়ে দিতে লাগল ওদের। ঠোঁট দিয়ে টুকরোগুলো লুফে নিয়ে পাখিগুলো জাহাজের পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর ফের লোভীর মতো তীক্ষ্ন চীৎকার করতে করতে উঠে গেল সমুদ্রের ওপরকার নীল শূন্যে। ইতালিয়ানদের জন্য কফি পরিবেশন করা হয়েছিল। তারাও বিস্কুট ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগল পাখিগুলোকে। বয়স্কা কড়া ভ্রুকুটি করে বললে:

'হনুমান যত সব!'

ইতালিয়ানদের উচ্ছল আলাপ-আলোচনা শুনছিল মুটকোটা। ফের সে জানাল:

'লোকটা সৈনিক নয়, ব্যবসায়ী। আমাদের সঙ্গে গম নিয়ে ব্যবসার

কথা কইছে। বলছে, আমাদের দেশ থেকে কেরোসিন কাঠ আর কয়লাও ওরা কিনতে পারে।'

'আমি দেখেই বুঝেছিলাম ও সৈনিক হতে পারে না' — কবুল করলে বয়স্কা।

পাটকিলে-চুলো লোকটা জুলপিওয়ালার সঙ্গে কী নিয়ে যেন কানে কানে সেই ফিসফিস কথা শুরু করেছিল আবার। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মুখ টান করে শুনছিল জুলপিওয়ালা। তরুণ ইতালিয়ানটি রুশীদের দিকে মাঝে মাঝে আড়চোখে চাইছিল আর বলছিল:

'কী আফ্‌সোস, ফিকে নীল চোখ আর দশাসই চেহারার এই লোকগুলোর দেশ সম্পর্কে আমরা জানি কত কম!'

ইতিমধ্যে সূর্য উঁচুতে উঠে গিয়েছিল অনেকখানি, গরম লাগছিল অসহ্য। চোখ ধাঁধানো ঝিলিক দিচ্ছিল সমুদ্র। আর দূরে, ডান দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল সমুদ্র থেকে মাথা তুলেছে পাহাড় অথবা মেঘ।

'আমেত, শোনো, শোনো' — জুলপিওয়ালা বললে আকর্ণবিস্তৃত হাসি নিয়ে, 'এই মজাদার জান কী বলছে, শোনো। গাঁয়ের ঐ সব বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার একটা ভারি বুদ্ধি বার করেছে ও!'

চেয়ারে দুলতে দুলতে ও ধীর একঘেয়ে গলায় এমনভাবে কথা বলছিল যেন মনে হবে কোন একটা বিদেশী ভাষা থেকে ও বুঝি অনুবাদ করছে:

'ও বলছে, গাঁয়ের মেলার আর পালাপার্বণের দিনে এলাকার ভূমি-দপ্তর থেকে সরকারী খরচায় প্রচুর লাঠিসোঁটা আর ইঁটপাথরের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। তারপর সরকারী খরচায় যেমন যেমন লোক সেই অনুসারে দশ, কুড়ি, কি পঞ্চাশ বালতি ভোদকা বিলোতে হবে চাষাভুষোদের মধ্যে। তাহলেই কাম ফতে!'

বয়স্কা বললে, 'বুঝতে পারছি না, তামাসা করছ নাকি?'

'না, না, সত্যি করেই বলছি!' প্যার্টকিলে-চুলো তাকে অবিলম্বে আশ্বস্ত করতে চাইল, 'ভেবে দেখুন খুড়ি...'

চোখ বিস্ফারিত করে তরুণী তার কাঁধ কোঁচকালে।

'কী আজগুবি কান্ড! ওরা ভোদকা গিলবে কিনা সরকারী খরচে, অথচ এমনিতেই...'

চেয়ারের ওপর লাফিয়ে উঠে প্যার্টকিলে-চুলো চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে না লিদিয়া, দেখো না কী হয়!' জুলপিওয়ালা এপাশে-ওপাশে দুলে মুখ হাঁ করে হেসেই চলল নিঃশব্দে।

'ভেবে দ্যাখো, গুন্ডাদের মধ্যে যারা মদ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে না পড়বে, তারা ওই লাঠিসোঁটা আর ইঁটপাথর দিয়ে নিজেরা মারামারি করে মরবে, বুঝেছ?'

'নিজেরা মারামারি করবে কেন?' জিগ্যেস করলে মুটকো।

বয়স্কা ফের বললে, 'এটা কি রসিকতা?'

প্যার্টকিলে-চুলো তার খাটো বাহু মসৃণভাবে বিস্তার করে উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, 'কর্তৃপক্ষ যখন ওদের দমন করে তখন বামপন্থীরা চিৎকার লাগায় অত্যাচার হচ্ছে, পাশবিকতা হচ্ছে। তাই ওরা নিজেরাই যাতে নিজেদের দমন করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক কিনা?'

হঠাৎ দুলে উঠল জাহাজটা। আতঙ্কে টেবিল আঁকড়ে ধরল পুরুষ্টু মহিলা, ঝন ঝন করে উঠল ডিশগুলো, আর বয়স্কা চেপে ধরল মুটকো লোকটার কাঁধ। কঠোর স্বরে সে জিগ্যেস করলে:

'কী ব্যাপার?'

'জাহাজটা বাঁক নিচ্ছে...'

তটরেখা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল বাগিচায় ঢাকা কুয়াশাচ্ছন্ন টিলা আর পাহাড়; আঙুর-বাগিচার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে ঘুঘু-রঙা পাথর, ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে

লুকিয়েছে শাদা শাদা ঘরবাড়ি, রোদ্দুরে ঝিলিক দিচ্ছে জানলার শার্সি। ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছে জবলজবলে ছোপ; জলের ঠিক কিনারে শিলা স্তূপগুলোর মধ্যে দেখা গেল সমুদ্রের দিকে মুখ করা একটা ছোটো বাড়ি, তার সামনেটা লালচে বেগুনি ফুলের ঘন আবরণে ঢাকা, ওপরে থাক থাক পাথর থেকে ফুটে উঠেছে রাশি রাশি রক্তিম জিরেনিয়াম। রঙগুলো উচ্ছল, উপকূলটা মনে হচ্ছিল সোহাগী, অতিথিবৎসল, পর্বতের কোমল ডৌল ডাক দিচ্ছে সেখানে, যেন বাগিচার ছায়ায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুটকো বললে, 'সবকিছুই এখানে কী ভীষণ ঘিঞ্জি।' নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বয়স্কা তাকিয়ে দেখল ওকে, তারপর পাতলা ঠোঁট চেপে মাথা উঁচু করে লরনেট্ দিয়ে নজর করে দেখতে লাগল তটভূমি।

ডেকে ইতিমধ্যে হালকা স্যুট-পরা গাঢ় রঙের অনেকগুলি মানুষ এসে হাজির হয়েছিল, কথা কইছিল কোলাহল করে। রুশ মহিলারা তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে উদ্ধত অবজ্ঞায় যেন রাণী দেখছে প্রজাদের।

তরুণী মন্তব্য করলে, 'কথা কইবার সময় কিরকম অঙ্গভঙ্গি করে ওরা।' মুটকো বুঝিয়ে দিলে:

'ওটা হল ওদের ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য, সে ভাষায় এত দৈন্য যে অঙ্গভঙ্গি করে না বোঝালে চলে না...'

গভীর শ্বাস ফেলে বয়স্কা বললে, 'মাগো!' তারপর একটুখানি থেমে জিগ্যেস করলে:

'জেনোয়াতেও কি মিউজিয়ম অনেকগুলো?'

'আমার ধারণা, মাত্র তিনটে'—জবাব দিলে মুটকো।

'আর সেই সমাধিক্ষেত্র?' জিগ্যেস করলে তরুণী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাম্পো সাণ্টো। গির্জাও আছে অবিশ্যি।'

'আর কোচোয়ানেরাও কি নেপ্‌ল্‌স্‌-এর কোচোয়ানদের মতোই হতচ্ছাড়া?'

পার্টকিলে-চুলো আর জুলপিওয়ালা দুজনে উঠে চলে গেল রেলিং-এর কাছে, গেল চিন্তিতভাবে পরস্পরকে বাধা দিয়ে আলাপ করতে করতে।

ফলাও খোঁপা ঠিক করতে করতে মহিলা জিগ্যেস করলে, 'কী বলছে ওই ইতালিয়ানটা?' মহিলার কনুই হাড় খোঁচা; বড়ো বড়ো কানদুটোকে মনে হয় গাছের দুটো নেতিয়ে পড়া পাতা। মুটকো তৎক্ষণাৎ বাধ্যের মতো কোঁকড়া চুল ইতালিয়ানটার সোৎসাহ কথাবার্তা শুনতে লাগল কান পেতে।

'ওদের নিশ্চয়ই একটা আইন আছে সিনোর, আইনটা বহু আগেকার, তাতে ইহুদীদের মস্কো আসা নিষিদ্ধ — বোঝাই যায় আইনটা স্বৈরাচারী আমলের, সেই ভয়ঙ্কর ইভানের সময়কার জের আর কি! এমন কি ইংলণ্ডেও আজো পর্যন্ত অনেক সেকেলে আইন চালু আছে। কিন্তু এই ইহুদীটা হয়ত আমাকে ধাঁধায় ফেলছিল, যাই হোক, মোটের ওপর জারদের প্রাচীন নগর পুণ্যধাম মস্কো যাবার অধিকার যে কোন কারণেই হোক তার ছিল না...'

'আর আমাদের এই রোমে, মস্কোর চেয়ে যা অনেক বেশি প্রাচীন, অনেক বেশি পুণ্যস্থান, এখানে মেয়র হল একজন ইহুদী' — হেসে বললে তরুণটি।

'দর্জি পোপকে* সে খাশা টিট করছে!' হাততালি দিয়ে ফোড়ন কাটল এক চশমা পরা বুড়ো।

লরনেট্‌ নামিয়ে মহিলা জিগ্যেস করল, 'বুড়ো মানুষটা চ্যাঁচাচ্ছে কেন?'

---

* কথার খেলা — পোপের নাম ছিল 'সার্তো', ইতালীয় ভাষায় এর অর্থ দর্জি।

'কোন একটা বাজে ব্যাপার নিশ্চয়ই। ওরা কথা কইছে নেপ্‌ল্‌স্‌-এর উপভাষায়...'

'ইহুদীটা মস্কো গিয়েছিল, কিন্তু থাকবে কোথায়? তাই একটা বেশ্যার ঘরে গিয়ে উঠেছিল, সিনোর। বলছিল, আর কোথাও নাকি যাবার জায়গা ছিল না...'

'স্রেফ্‌ গাঁজাখুরী গল্প!' যে-লোকটা গল্প বলছিল হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ে ঘোষণা করলে বুড়োটা।

'সত্যি বলতে কি, আমার নিজেরও তাই ধারণা।'

'কিন্তু তারপর কী হল?' জিগ্যেস করলে তরুণ।

'বেশ্যাটা ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিল। কিন্তু তার আগে অবশ্য টাকাটা নিয়ে নিয়েছিল, যেন সে তাকে ভোগ করেছে...'

বুড়োটা বললে, 'যত বদমাইশি! লোকটার কল্পনা-শক্তিটা বেশ নোংরা, এই হল কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু রুশের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। চমৎকার লোক তারা...'

ঘর্মাক্ত মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে মুটকো রুশ ভদ্রলোক অলস নির্বিকার সুরে মহিলাদের বললে:

'ও একটা ইহুদীর চুটকি গল্প বলছে।'

'তাই নিয়ে এত উৎসাহ!' তরুণী বাঁকা হাসি হাসল, আর বয়স্কা মন্তব্য করলে:

'কি জানিস, অঙ্গভঙ্গি করে চিৎকার করে কথা বলিয়ে এই সব লোকগুলো কিন্তু কেন জানি ভারি একঘেয়ে...'

তটভূমিতে চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠছিল শহরটা; পাহাড়ের পেছন থেকে আত্মপ্রকাশ করল ঘরবাড়ি। ক্রমেই পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করে গড়ে তুলল দালানকোঠার নীরেট রেখা। মনে হচ্ছিল যেন সব আইভরি থেকে খোদাই করা আর রোদ প্রতিফলিত করছে।

তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ঠিক ইয়াল্‌তার মতো দেখতে। যাই, লিজার কাছে চললাম।'

ডেকের ওপর দিয়ে অল্প অল্প দুলতে দুলতে হে'টে গেল সে, বিপুল দেহটা ফিকে নীল পোশাকে ঢাকা। ইতালিয়ানদের দঙ্গলটার পাশ দিয়ে যাবার সময় পাকাচুলো লোকটা তাদের আলাপ থামিয়ে নিচু গলায় বললে:

'চোখদুটো কী সুন্দর!'

'হ্যাঁ'—মাথা নেড়ে বললে চশমা-পরা বুড়ো, 'বাসিলিডাও বোধ হয় এই রকমই দেখতে ছিল!'

'কিন্তু বাসিলিডা তো বাইজানটাইনের লোক, তাই নয়?'

'আমার কল্পনায় সে স্লাভ...'

'ওরা লিদিয়া সম্পর্কে কথা কইছে' — বললে মুটকো।

'কী বলছে?' জিগ্যেস করল মহিলা, 'নিশ্চয়ই অপমানকর কিছু?'

'না, বলছে ওর চোখ সম্পর্কে। প্রশংসা করছে...'

মহিলা মুখ বাঁকাল।

পেতলের কাজগুলো ঝকমক করছিল স্টিমারের, তীরের দিকে দ্রুত মসৃণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল স্টিমারটা। জাহাজঘাটার কালো দেয়ালের ওপাশে মাস্তুলের অরণ্য। এখানে-ওখানে উজ্জ্বল নিশান ঝুলে আছে স্থির হয়ে। বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে কালো ধোঁয়া। তেল, কয়লাগুঁড়োর গন্ধ, পোতাশ্রয়ে কাজের শব্দ আর মহানগরের বিচিত্র গোলমাল এসে পেঁছিল জাহাজে।

মুটকো লোকটা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

বিবর্ণ ধূসর চোখ কুঁচকে মহিলা জিগ্যেস করলে, 'হাসির কী হল?'

'জার্মানরা ওদের দফা সারবে, ভগবানের দিব্যি, দেখে নেবেন!'

'তাতে খুশির কী আছে তোমার?'

'এমনি...'

জুলপিওয়ালা তার পায়ের দিকে তাকিয়ে জোর গলায় নিখুঁত ব্যাকরণ সম্মত উচ্চারণ করে পার্টকিলে-চুলোকে জিগ্যেস করল:

'এই সব চমকে তোমার বেশ ভালো লাগবে, নাকি লাগবে না?'

পার্টকিলে-চুলো ক্ষিপ্তের মতো মোচ পাকাল, উত্তর দিলে না।

গতি থেমে এল স্টিমারের। মর্মর সৌধ, উঁচু উঁচু মিনার অথবা নীলাভ গাড়ি বারান্দার কোন ছায়া নেই সমুদ্রের ঘোলা সবুজ জলের ওপর। সে জল যেন অভিযোগে ফেটে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে আছড়ে পড়ছে জাহাজের শাদা গায়ে। উন্মুক্ত হল নানা রকমের নৌকো-জাহাজে ঠাসা বন্দরের অন্ধকার মুখগহ্বর।

আলাপ

...রেস্তোরাঁর দরজার কাছে লোহার একটি টেবিলের পাশে এসে বসল একটি লোক। পরনে হালকা রঙের স্যুট, দেখতে আমেরিকানদের মতো একহারা, দাড়ি মোচ কামানো। বসে অলস সুরে লোকটা হাঁক দিলে:

'গা-আ-গসন্...'

চারিদিকে ঘন শাদায় ফুটে উঠেছে রাশি রাশি একেসিয়া, রোদের ছোঁয়ায় সর্বত্র ঝক ঝক করছে ঠিক সোনার মতো, আকাশে মাটিতে বসন্তের কোমল পুলক। খুরের খুট খুট শব্দ করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে লোমশ কানওয়ালা ছোটো ছোটো গাধা, টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে ভারি ভারি মালটানা ঘোড়া, লোকগুলো পর্যন্ত হাঁটছে বিনা ব্যস্ততায়, বেশ বোঝা যায় যে প্রাণীমাত্রেই যতক্ষণ পারে থাকতে চায় রোদ্দুরে, ফুলের মধুগন্ধে ভরা বাতাসে।

ঝলক দিয়ে যাচ্ছে শিশুরা, বসন্তের অগ্রদূত তারা। সূর্য তাদের গায়ের পোশাক রাঙিয়ে তুলেছে উজ্জ্বল রঙে। হেলে দুলে ভেসে চলেছে রঙচঙে পোশাক পরা নারী — রোদের দিনে এরাও তেমনি প্রয়োজন, রাতে যেমন নক্ষত্র।

হালকা পোশাকের লোকটাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত: মনে হয় সে নোংরা হয়ে ছিল, কেবল আজই তা সাফ করা হয়েছে, কিন্তু এমন আগ্রহে যে তার ফলে লোকটার সমস্ত ঔজ্জ্বল্যও ঘষে ঘষে উঠে গেছে চিরকালের জন্য। বিবর্ণ চোখে লোকটা তাকাচ্ছিল তার চারপাশে, যেন বসে বসে গুণছিল রোদ্দুরের কতগুলো ঝলক পড়েছে ঘরের দেয়ালে, ছায়াচ্ছন্ন রাস্তায় আর বুলভারের চওড়া শানের ওপর দিয়ে যা-কিছু এগিয়ে যাচ্ছে তাদের ওপর। বিবশ ঠোঁটদুটো সে করে তুলেছে ফুলের মতো, মৃদু একাগ্র সুরে শীস দিয়ে সে গাইছিল একটি বিচিত্র বিষণ্ণ গৎ আর ধবধবে শাদা হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে টোকা দিচ্ছিল টেবিলের ধ্বনিত কিনারায়, মিট মিট করে নখগুলোয় ঝলক, অন্য হাতে হলুদ রঙের একটা দস্তানা, তা দিয়ে সে তাল দিচ্ছিল হাঁটুর ওপর। বুদ্ধিমান দৃঢ়চেতা একটা মানুষের মতো তার মুখ। আফসোস হয় সে মুখ অমন স্থূলভাবে ঘষে সাফ করা হয়েছে বলে।

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে পরিচারক টেবিলের ওপর সাজিয়ে দিল এক কাপ কফি, সবুজ লিকারের একটা ছোটো বোতল, আর কিছু বিস্কুট। এই সময় পাশের টেবিলে এসে বসল একটি বলিষ্ঠ চেহারার লোক, আগেট পাথরের মতো চোখ, গালে হাতে ঘাড়ে ধোঁয়ার ঝুলকালি ছোপ, সারা চেহারাটাই বদখত, ইস্পাতের মতো শক্ত, যেন প্রকাণ্ড কোন মেশিনেরই একটা অঙ্গ।

ফিটফাট লোকটার ক্লান্ত দৃষ্টি পড়ল ওর ওপর। তাতে ও একটু উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে টুপি ছুঁয়ে ঘন মোচের মধ্যে দিয়ে বললে:

'নমস্কার, ইঞ্জিনিয়ার সায়েব!'

'ও হো, আবার আপনি নাকি, ট্রামা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই...'

'তাহলে এবার কিছু একটা শুরু হবে নাকি হে?'

'আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'প্রশ্ন দিয়েই কি আর আলাপ চালানো যায়, হে বন্ধু?..' পাতলা ঠোঁটের ওপর আবছা একটু হাসি এনে বললে ইঞ্জিনিয়ার।

আর মাথার টুপিটা কানের এক পাশে ঠেলে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল টমা। হাসতে হাসতেই বললে:

'ঠিক বলেছেন! কিন্তু সত্যি বড় ইচ্ছে সব খবর জানার...'

শাদা-কালো খড়খড়ে লোমের একটা গাধা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল কয়লা বোঝাই গাড়ি। থেমে গিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে একটা মর্মাহত ডাক ছাড়ল। কিন্তু সেদিন নিজের গলার স্বর তার খুব পছন্দ হল না বোধ হয়, উঁচু পর্দায় গলা তুলেই হঠাৎ থতোমতো খেয়ে থেমে গিয়ে লোমশ কানদুটো ঝাঁকিয়ে মাথা নিচু করে আবার খুরের শব্দ তুলে এগিয়ে যেতে লাগল গাধাটা।

'নতুন একটা বই থেকে নতুন কিছু শেখার মতো মুখিয়ে আছি আপনার সেই মেশিনটার জন্যে...'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ইঞ্জিনিয়ার বললে:

'উপমাটা ঠিক বুঝলাম না...'

'ভালো বই থেকে মানুষের চৈতন্য যেমন ছাড়া পায় মেশিন থেকে মানুষের দৈহিক উদ্যমও তেমনি ছাড়া পায় এ কথা কি আপনি মানেন না?'

'ও, এই কথা!' মাথা উঁচু করে বললে ইঞ্জিনিয়ার, 'বটে!'

তারপর খালি কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে জিগ্যেস করলে:

'এখন দেখছি আপনারা প্রচার শুরু করবেন তো আবার?'

'আগে আগেই তা শুরু করে দিয়েছি...'

'ফের আবার সেই ধর্মঘট আর হাঙ্গামা, এ্যাঁ?'

অন্য জন মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ালে।

'এগুলোর দরকার না পড়লে তো কথাই ছিল না...'

কালো পোশাক-পরা সন্ন্যাসিনীর মতো শুকনো চেহারার একটা বুড়ি নীরবে এক গোছা ভায়োলেট ফুল এগিয়ে দিল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে। দুটি ফুলের তোড়া কিনে ইঞ্জিনিয়ার একটি দিল তার সঙ্গীকে। তারপর চিন্তিতভাবে বললে:

'আপনার মাথাটা ভারি ভালো ট্রামো, কিন্তু সত্যি, আদর্শবাদী হয়ে বসেছেন, সেটা ভারি আফ্‌সোসের কথা...'

'ফুল আর এই প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ। বলছেন, আফ্‌সোসের কথা?'

'হ্যাঁ, আসলে আপনি কবি, শিক্ষা পেলে একটা ভালো ইঞ্জিনিয়ারও আপনি হতে পারবেন...'

ট্রামো মৃদু হাসল, দেখা গেল ওর শাদা শাদা দাঁত। বললে:

'হ্যাঁ, এ কথাটা আপনার ঠিকই। ইঞ্জিনিয়ার আসলে হল কবি। আপনার সঙ্গে কাজ করতে করতে সেটা আমি বুঝেছি...'

'আপনি সৌজন্যশীল লোক...'

'আমার কথা হল ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ও কেন সোশ্যালিস্ট হবেন না? সোশ্যালিস্টকেও তো কবি, কবি হতে হয়...'

একই রকম চতুর দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ওরা, হেসে উঠল আশ্চর্য বিপরীত চেহারার দুটি লোক — এক জন শুকনো, স্নায়ুনির্ভর ঘষা মাঝা চেহারা, রঙ ওঠা চোখ; আর অন্য জন যেন সবে কালকেই কামারশাল থেকে গড়ে পিটে এসেছে, এখনো প্যালিশ পর্যন্ত করা হয় নি।

'না, ট্রামো। আমি চাই নিজেরই একটা কর্মশালা আর আপনার মতো কয়েক ডজন বাহাদুর ছোকরা, তাহলে কিছু একটা করে দেখাতে পারতাম...'

আস্তে করে টেবিলে টোকা দিল সে। তারপর বোতামের ঘরে ফুল গংজতে গংজতে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ট্রামা, 'ধ্যুত্তোরি সব! বেঁচে থেকে কাজ করার পথে যতসব বাজে বাধা...'

'মানুষের ইতিহাসকে তাহলে একটা বাজে ব্যাপার বলতে চান, মাস্টার মেকানিক ট্রামা?' ইঞ্জিনিয়ার জিগ্যেস করলে মিহি একটু হাসি নিয়ে। মজুরটা তার টুপি খুলে নাড়তে নাড়তে উত্তেজিতভাবে বললে:

'এহ, আমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাসটা আসলে কী?'

'আপনার পূর্বপুরুষ?' প্রথম শব্দটার ওপর জোর দিয়ে আরো একটু বাঁকা হেসে জিগ্যেস করলে ইঞ্জিনিয়ার।

'হ্যাঁ, আমার পূর্বপুরুষ! বলবেন বোধ হয় ঔদ্ধত্য! ঔদ্ধত্যই হোক! কিন্তু জিয়োর্দানো ব্রুনো, ভিকো, আর মাৎসিনি — এঁরা আমার পূর্বপুরুষ কেন নন? আমি কি এঁদের দুনিয়াতেই বাস করছি না? এঁদের বড়ো বড়ো মেধা আমার চারপাশে যা বুনে গেছে তার ফল ভোগ করছি না?'

'ও, এই অর্থে!'

'পৃথিবী থেকে যারা চলে গেলেন তাঁরা পৃথিবীকে যা-কিছু দিয়ে গেছেন তা দিয়েছেন আমাকেও!'

গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকে ইঞ্জিনিয়ার বললে, 'তা ঠিক।'

'আর আমার আগে, আমাদের আগে যা-কিছু করা হয়েছে, তা সবই হল সেই খনিজ লোহা যা থেকে বানাতে হবে ইস্পাত, নয় কিনা বলুন?'

'কেন নয়? সে কথা আর বলতে!'

'যেমন আমরা মজুররা, তেমনি আপনারা শিক্ষিতেরা তো বেঁচে আছেন অতীতের মনীষীদের কর্মফলের ওপর।'

'সে কথা আমি অস্বীকার করছি না' — বলে মাথা নিচু করলেন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল ধূসর ন্যাতাকানি পরা একটা ছেলে, যেন খেলে খেলে জীর্ণ একটা বল; ছোটো ছোটো থাবার মতো নোংরা হাতে এক গোছা ক্রোকাস্ ফুল নিয়ে পীড়াপীড়ি করছিল:

'আমার ফুল কিনুন না সিনোর, ফুল কিনুন...'

'ফুল আছে আমার...'

'বেশি ফুলে কখনো দোষ হয় না, সিনোর...'

ট্রামা বললে, 'ঠিক বলেছিস বাচ্চা, সাবাস্! দে আমাকে দুটো...'

বাচ্চাটার কাছ থেকে ফুল নিয়ে ট্রামা টুপি উ'চু করে এক গোছা এগিয়ে দিল ইঞ্জিনিয়ারের দিকে:

'চলবে কি?'

'ধন্যবাদ!'

'দিনটা চমৎকার, তাই না?'

'হুঁ, আমার পঞ্চাশ বছরেও তা বেশ টের পাচ্ছি...'

চোখ কু'চকে ইঞ্জিনিয়ার তার চারপাশে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে।

'আমার যা ধারণা শিরায় শিরায় আপনি যে বসন্ত সূর্যের খেলা অমন তীব্রভাবে টের পান, তার কারণ শুধু এই নয় যে আপনি জোয়ান। আমার বিশ্বাস, তার কারণ দুনিয়াটা আমার চোখে যেমন লাগে তা থেকে একেবারে অন্যরকম লাগে আপনার চোখে। তাই না?'

মৃদু হেসে ও উত্তর দিলে, 'জানি না। কিন্তু জীবন সুন্দর জিনিস!'

'সে জীবন ভবিষ্যতে কিছু দেবে এই আশার জন্যে কি?' অবিশ্বাসের সুরে জিগ্যেস করলে ইঞ্জিনিয়ার। প্রশ্নটা তার সঙ্গীকে

বিঁধল বোধ হয়, কেননা টুপিটা মাথায় পরে নিয়ে ট্রামা দ্রুত বলে গেল:

'জীবন সুন্দর সেই সবকিছুর জন্যে যা এ জীবনে আমি ভালোবাসি! বুঝেছেন বন্ধু! শব্দ আমার কাছে — দূর ছাই — শুধু কতকগুলো অক্ষর আর ধ্বনি নয়; যখন বই পড়ি, কি ছবি দেখি, কিংবা ভালো কিছু দেখে মুগ্ধ হই, তখন মনে হয় যেন এ সবকিছু আমিই তৈরি করেছি নিজের হাতে!'

এ কথায় হেসে উঠল দু'জনেই, একজন হাসল অকপট দরাজ গলায় পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে, চওড়া বুকখানা চিতিয়ে এমনভাবে যেন ভালো করে হাসতে পারার ক্ষমতায় সে গর্বিত; আর অন্য জন হাসলে প্রায় নিঃশব্দে, দম আটকে, সোনা বাঁধানো দাঁত অনাবৃত করে, তা দেখে মনে হয় বুঝি লোকটা সোনা চিবিয়েছিল, তারপর ভুলে গেছে দাঁতের সবজেটে হাড় মাজতে।

ইঞ্জিনিয়ার বললে, 'আপনি বেশ খাসা লোক হে ট্রামো, বেশ আনন্দ হয় আপনাকে দেখলে।' তারপর চোখ মটকে যোগ করলে, 'শুধু যদি হাঙ্গামা না বাধাতেন...'

'ও, হাঙ্গামা আমি সব সময়েই বাধাই...'

তারপর তার অতলস্পর্শ কালো চোখদুটো কুঁচকে একটা কপট গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে জিগ্যেস করলে:

'আমার বিশ্বাস, সে বার ঠিকভাবে চলেছিলাম, তাই না?'

ইঞ্জিনিয়ার তার কাঁধ কুঁচকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'তা বটে, খুবই ঠিক হয়েছিল। সে এক তুমুল কাণ্ড জানেন তো, ও ব্যাপারে আমাদের কারখানার খরচ হয়েছিল প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার লিরা...'

'টাকাটা মজুরি হিসেবে বাড়তি দিলে বেশি বুদ্ধির কাজ হত...'

'উহ্ু, ওটা আপনার ভুল। বেশি বুদ্ধি। কিন্তু যেমন জানোয়ার, তেমনি তো তার বুদ্ধি।'

শুকনো হলদেটে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে সে। তারপর মজুরটার সঙ্গে করমর্দন করে বললে:

'আমার কিন্তু এখনো ধারণা, আপনার পড়াশুনা চালানো উচিত এবং বেশ ভালো রকম চালানো উচিত...'

'প্রত্যেক মুহূর্তেই আমি কিছু-না-কিছু শিখি...'

'বেশ কল্পনা প্রতিভা আছে এমন একজন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতেন।'

'ওহ্, কল্পনাশক্তি এখনই আমার দিন কাটাতে বাধা হচ্ছে না...'

'বেশ, তাহলে আসি, একগুঁয়ে বন্ধুটি আমার...'

একেসিয়ার তল দিয়ে রোদ্দুরের ঝিলিমিলির মধ্যে হেঁটে গেল ইঞ্জিনিয়ার, বড়ো বড়ো ক্ষেপে শুকনো ঢেঙা ঢেঙা পা ফেলে ধীরে ধীরে, ডান হাতের লম্বা সরু আঙুলগুলো সতর্কভাবে দস্তানার মধ্যে ঢুকাতে ঢুকাতে। রেস্তোরাঁর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল ময়লা রঙের ছোটোখাটো চেহারার পরিচারকটি। দরজা থেকে সরে এসে সে মজুরটিকে বললে:

'আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সায়েব বেশ বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন...'

মজুরটা তার টাকার ব্যাগের মধ্যে পয়সা খুঁজছিল। কথাটা শুনে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানাল:

'না, না, এখনো সে দিব্যি চালিয়ে যেতে পারে! মাথাখানায় ঢের আগুন আছে লোকটার...'

'পরের বার বক্তৃতা দেবেন কোন্ জায়গায়?'

'ঐ একই জায়গায়, লেবার এক্সচেঞ্জে। আমার বক্তৃতা শুনেছেন কখনো?'

'তিন বার শুনেছি কমরেড...'

সজোরে করমর্দন করে ওরা হেসে বিদায় নিলে। ইঞ্জিনিয়ার যে পথে অদৃশ্য হয়েছে তার উল্টো পথ ধরে হে'টে গেল একজন। অন্য জন কী ভাবতে ভাবতে গুনগুনিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল।

রাস্তার মাঝখান দিয়ে হে'টে গেল শাদা এপ্রণ-পরা এক দল স্কুলের ছেলেমেয়ে, চারিদিকে তারা ছড়িয়ে দিলে কলরব আর হাসির ফুলকি। সামনের সারিতে যে দুটিতে যাচ্ছিল, কাগজের ভে'পুতে তারা ফু' দিলে সজোরে, আর ওদের ওপর ঝরে ঝরে পড়ল একেসিয়া গাছ থেকে শাদা শাদা পাপড়ির তুষারকণা। যখনই, বিশেষ করে বসন্তকালে, ছেলেদের দেখি তখনই ইচ্ছে হয় উচ্ছল গলায় চে'চিয়ে ডেকে বলি:

'ওরে ও বাচ্চারা, জয় হোক তোদের ভবিষ্যতের!'

প্রতিহিংসা

পিতৃপুরুষের হাড় দিয়ে যে মাটি উর্বর তা থেকে মানুষ যখন এক টুকরো রুটিও না পায়, আর তা না পেয়ে অভাবের তাড়নায় যদি মানুষকে অনিচ্ছায় স্বদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় দক্ষিণ আমেরিকায়, আর সে যাত্রাও আবার বাড়ি থেকে তিরিশ দিন ব্যাপী এক যাত্রা — জীবন যদি এমনি হয়ে ওঠে, তাহলে কি করার থাকে মানুষের?

লোকটা যেই হোক না কেন কিছু এসে যায় না, মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় যেন মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে আনা শিশু। বিদেশ বিভুঁয়ের মদ তার কাছে লাগে তেতো, তাতে আনন্দ না জেগে বিষিয়ে ওঠে যত মন-পোড়ানিতে, স্পঞ্জের মতো সে হয়ে ওঠে ভঙ্গুর আর মাতৃভূমির বুক থেকে ছিঁড়ে আনা তার হৃদয় তৃষিতের মতো আকর্ষণ করে নেয় যত কিছু কু, ঠিক যেমন করে স্পঞ্জ টেনে নেয় জল, জন্ম নেয় অন্ধকার সব আবেগ।

ঘর ছেড়ে কালাপানি পার হবার আগে কালাব্রিয়ায় আমাদের জোয়ান ছেলেরা সাধারণত বিয়ে করে যায়; হয়ত তাদের ধারণা যে একটা মেয়ের জন্য ভালোবাসা থাকলে দেশের জন্য ভালোবাসাও বেড়ে

যাবে, কেননা একটা মরদকে দেশ যেমন টানে, তেমনি টানে তার মেয়েমানুষ; প্রেম ছাড়া বিদেশে বিভুঁয়ে আর কিছুই তাকে রক্ষা করে না: সে প্রেম তাকে ডাক দেয় তার আপন মাটির কোলে, তার প্রিয়তমার বুকে।

কিন্তু অভাবের তাড়নায় বিতাড়নে বাধ্য এই বিয়েগুলি প্রায়ই হয়ে দাঁড়ায় নিয়তি প্রতিহিংসা আর রক্তপাতের এক ভয়ংকর নাটকের প্রস্তাবনা মাত্র। সেই ব্যাপারই ঘটেছিল কিছু দিন আগে সেনার্কিয়ায়, আপেনাইন পর্বতের এলাকায় যে একটা সম্প্রদায় বাস করে, তাদের মধ্যে।

সে কাহিনী যেমন সরল তেমনি ভয়ংকর, যেন বাইবেলের একটা ঘটনা। কিন্তু শুরু করতে হলে আমাদের দিন আর কাহিনীর অবসানের দিন থেকে পেছিয়ে যেতে হবে পাঁচ বছর। পাঁচ বছর আগে পর্বতের ওপর দিকে ছোট্ট গ্রাম সারাসেনায় বাস করত একটি রূপসী যুবতী, নাম তার এমিলিয়া ব্লাঙ্কো। স্বামী তার চলে গিয়েছিল আমেরিকায়, মেয়েটি থাকত শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে। বেশ সুস্থ-সবল মেয়ে ছিল সে, কাজকর্মে পটু, মিষ্টি গলার স্বর, হাসিখুশি স্বভাব, — ভালোবাসত হাসতে, ঠাট্টা-তামাসা করতে। নিজের রূপ নিয়ে একটু লীলাও করত, তাতে গাঁয়ের ছোকরাগুলো আর পাহাড়ী বন-রক্ষীদের মনে তীব্র কামনা জাগিয়ে তুলত সে, কিন্তু নিপুণ বাক্যবাণে সে তার সতীত্ব বাঁচিয়ে চলত ঠিকই। তার উচ্ছল হাসিতে যত মধুর কামনাই আলোড়িত হয়ে উঠুক, তাকে জয় করেছে এমন বড়াই কেউ কখনো করতে পারে নি।

তবে জানেন তো, দুনিয়ায় শয়তান আর বুড়ি মেয়েদের বুক ঈর্ষায় যেমন জ্বলে তেমন আর কারো নয়। এমিলিয়া থাকত তার শাশুড়ীর সঙ্গে আর কুকাজ করার সুযোগ পেলে শয়তান কি আর হাজির না হয়ে পারে?

বুড়িটা কেবলি বলত, 'সোয়ামী ঘরে নেই, কিন্তু তোমার বাছা হাসিখুশি যে আর ধরে না। ব্যাটার কাছে লিখে জানাব। সামলে চলো বাছা, কী করো সব আমি নজর রাখছি। মনে রেখো, তোমার মান — আমাদের মান...'

প্রথম প্রথম এমিলিয়া শান্তভাবে তার শাশুড়ীকে বোঝাত, তার ব্যাটাকে সে ভালোবাসে, দোষের কাজ সে কিছুই করে নি। কিন্তু বুড়িটা তার সন্দেহ নিয়ে বৌকে ক্রমাগত বেশি করে অপমান করে চলল, আর শয়তানের প্ররোচনায় গুজব ছড়াতে লাগল যে বৌ তার লাজ-লজ্জা সব খুইয়েছে।

এ কথা কানে যেতে মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল। বুড়ি ডাইনীটাকে সে অনুনয়-বিনয় করে বললে, গুজব ছড়িয়ে সে যেন তার সর্বনাশ না করে; স্বামীর কাছে তার কোন দোষ নেই। এমন কি স্বপ্নেও কখনো স্বামীকে প্রতারণার লোভ হয় নি তার। বুড়ির কিন্তু বিশ্বাস হল না।

বললে, 'জানি, জানি বাছা, এসব শপথের দাম কী তা জানা আছে! কম বয়স তো এক কালে আমারও ছিল বাছা, জানি। ও চলবে না, আমি ওকে আগেই লিখে দিয়েছি, অবিলম্বে চলে এসে মান খোয়ানোর শোধ নিক!'

মৃদুস্বরে জিগ্যেস করলে এমিলিয়া, 'চিঠি লিখে দিয়েছ তুমি?'

'দিয়েছি।'

'বেশ...'

আমাদের এদিককার লোকগুলো ঠিক আরবদের মতোই। স্বামী ফিরলে তার কপালে কী আছে এমিলিয়া জানত।

পরের দিন শুকনো কাঠ কুড়োতে শাশুড়ী বনে গেলে এমিলিয়া তার স্কার্টের নিচে একটা কুড়ুল লুকিয়ে নিয়ে গেল শাশুড়ীর পেছু পেছু। পরে নিজেই সে সেপাইদের কাছে গিয়ে বললে, শাশুড়ীকে সে খুন করেছে।

বললে, 'বিনা দোষে কুলটা বলে লোকে ছি ছি করবে, তার চেয়ে খুনী হওয়াও ভালো।'

বিচারে মেয়েটিরই জিত হচ্ছিল। সেনার্কিয়া গাঁয়ের প্রায় সমস্ত লোকেই গিয়ে ওর পক্ষে সাক্ষী দিয়ে এল, অনেকে কাঁদতে কাঁদতে জজের কাছে অনুনয় করে বললে:

'মেয়েটি নির্দোষ, মিছেমিছি ওর সর্বনাশ করা হয়েছে!'

হতভাগিনী মেয়েটির বিরুদ্ধে কথা বললেন শুধু মহামান্য আর্কবিশপ কোস্তিজ। মেয়েটির দোষ নেই সে কথা তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। জানালেন প্রাচীন রীতিনীতি মান্য করে চলা প্রয়োজন। লোকদের হুঁশিয়ার করে তিনি বললেন, অসচ্চরিত্রা ফ্রিনে-র রূপে ভুলে তাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে গ্রীকেরা যে ভুল করেছিল সে ভুল যেন না করা হয়। যা বলবার তা সবই তিনি বললেন এবং বোধ হয় তাঁর জন্যই এমিলিয়ার সাজা হয়ে গেল বিনা শ্রমে চার বছর।

একই গাঁয়ের লোক দোনাতো গুয়ার্নাচিয়া, সেও গিয়েছিল এমিলিয়ার স্বামীর মতো কালাপানির পারে, তরুণী স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে গিয়েছিল দুঃখী পেনিলোপির অবস্থায়, জীবন বাদ দিয়ে জীবনের স্বপ্ন নিয়ে সুতো কাটা।

তিন বছর আগে দোনাতো তার মায়ের কাছ থেকে চিঠি পেলে, তার বৌ তেরেসা আত্মদান করেছে তার বাপের কাছে, অর্থাৎ পত্রলেখিকার স্বামীর কাছে, এবং তার সঙ্গেই বাস করছে। আবার সেই বুড়ি মেয়ে আর শয়তানের ব্যাপার আর কি!

নেপ্‌ল্‌স্‌ যাবার পয়লা স্টিমারের টিকিট কাটল দোনাতো গুয়ার্নাচিয়া এবং হঠাৎ যেন ভুঁই ফুঁড়ে উদয় হল তার বাড়িতে।

বৌ আর বাপ অবাক হবার ভান করলে। দোনাতো বেশ গোঁয়ার

গোছের সন্দিগ্ধ ছোকরা, প্রথমটা সে শান্ত হয়েই রইল। যে খবর পেয়েছিল তার সত্যাসত্য পরখ করে দেখবে ঠিক করলে, কেননা এমিলিয়া ব্রাঙ্কোর কাহিনী তার শোনা ছিল। বৌকে সে খুব সোহাগ আদর করলে, মনে হল কিছু কালের জন্য ওদের দু'জনের আবার মধুযামিনী শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে যৌবনের উদগ্র উৎসব।

মা তার কানে বিষ ঢালার চেষ্টা করত, কিন্তু ও থামিয়ে দিত। মাকে বলত:

'হয়েছে! হয়েছে! নিজেই বিচার করে দেখব তোমার কথা কতটা সত্যি, বাধা দিও না আমায়।'

ওর জানা ছিল, যে ঘা খেয়েছে আপন মা হলেও তাকে বিশ্বাস করতে নেই।

এমনি করে গ্রীষ্মের প্রায় অর্ধেক কেটে গেল সুখে শান্তিতে, সারা জীবনও বোধ হয় তাই কাটত, কিন্তু অল্প কিছু দিনের জন্য ছেলে বাইরে চলে যেতে বাপ তার ফের পেছনে লাগল পুত্রবধূর। বুড়ো কামুকটার জ্বালাতন কিন্তু এবার প্রতিরোধ করতে শুরু করল বৌ। তাতে ক্ষেপে গেল বুড়োটা — কাঁচা একটা নারী দেহের উপভোগ বড়ো হঠাৎ করে মাটি হয়ে গেল। বুড়ো ঠিক করলে, প্রতিশোধ নেবে।

'তোর কপালে মরণ আছে' — বলে বুড়োটা ভয় দেখালে বৌকে।

বৌও জবাব দিল, 'তোর কপালেও!'

আমরা হলাম অল্প কথার মানুষ।

পরের দিন বুড়ো তার ছেলেকে বললে:

'তোর বউ যে অসতী তা তুই জানিস?'

ছেলে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে সোজা বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলে:

'তার প্রমাণ আছে কিছু?'

'যারা তোর বউয়ের আদর পেয়েছে তারা আমায় বলেছে, ওর তলপেটের দিকে একটা মস্ত তিল আছে, ঠিক কিনা?'

দোনাতো বললে, 'বেশ, বাপ হয়ে আপনি যখন বলছেন, ও অসতী, তাহলে ওকে মরতেই হবে!'

নির্লজ্জের মতো মাথা নাড়লে বাপ।

'নিশ্চয়ই, চরিত্রহীন নারীর জান নিতেই হবে।'

'চরিত্রহীন পুরুষদেরও' — বলে চলে গেল দোনাতো।

বৌয়ের কাছে গিয়ে দোনাতো তার ভারি ভারি হাত দুখানা দিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরে বললে:

'শোনো, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করেছ। বেইমানি করার আগে এবং পরে আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা ছিল, তার দোহাই দিয়ে জিগ্যেস করছি, বলো, লোকটা কে?'

ও চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার মুখপোড়া বাপই কেবল জানে। কেবল সেই...'

'তাহলে, আমার বাপই?' জিগ্যেস করলে চাষী, রক্তে লাল হয়ে উঠল ওর চোখ।

'জোর করে, ভয় দেখিয়ে ও আমাকে নিয়েছিল। কিন্তু সব সত্যি কথাটুকু আগে শোনো শেষ পর্যন্ত...'

দম ফুরিয়ে এসেছিল ওর। বৌকে ঝাঁকুনি দিলে স্বামী:

'বলো!'

হতাশায় ফিস ফিস করে বৌ বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আর আমি — স্বামীস্ত্রীর মতো আমরা শুয়েছি তিরিশ বার, চল্লিশ বার...'

দোনাতো বাড়ির ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে ছুটে গেল মাঠে, যেখানে গিয়েছিল ওর বাপ। তারপর এই রকম মুহূর্তে মরদ মরদকে যা বলতে পারে সেই সব কথা বলে দুটি গুলিতে ও বাপের জান শেষ করে দিল। লাসটার ওপর থুতু ফেললে ও, রাইফেলের কুঁদো

দিয়ে চুরমার করে দিলে মাথার খুলি। লোকে বলে লাসটা নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে নাস্তানাবুদ করেছিল, পিঠের ওপর নাকি লাফিয়ে উঠে নাচতে শুরু করেছিল প্রতিশোধের নাচ।

তারপর বন্দুকে গুলি ভরে ও গেল তার বৌয়ের কাছে। বললে: 'চার পা পেছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে শেষ প্রার্থনা করে নাও...'

ও কাঁদতে কাঁদতে প্রাণভিক্ষা করলে।

স্বামী বললে, 'না। যা ন্যায্য তা আমাকে করতেই হবে, আমি যদি দোষ করতাম, তাহলে তুমিও যা করতে, তাই আমি করব...'

পাখি মারার মতো করে ও বৌকে খুন করে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলে কর্তৃপক্ষের কাছে। গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ও যখন হেঁটে গেল তখন লোকে ওর জন্য পথ ছেড়ে দিচ্ছিল। অনেকে বললে:

'ইমানদার মরদের মতো কাজ করেছ তুমি, দোনাতো...'

বিচারের সময় সে আত্মসমর্থন করলে এক ভয়ংকর তেজে, আদিম প্রাণের স্থূল বাগিতায়।

'যদি আমি কোন মেয়েকে নিই, তো নেব এই জন্যে যে আমাদের ভালোবাসা থেকে জন্ম নেবে শিশু, তার মধ্যে সে আর আমি — আমরা দু'জনেই বেঁচে থাকব! মানুষ যখন ভালোবাসে তখন কে তার বাপ, কে তার মা? থাকে শুধু ভালোবাসা, আর থাকে চিরকাল! আর সে ভালোবাসাকে যারা নোংরা করে, সে নারী হোক কি পুরুষ হোক, অভিশাপ লাগুক তাদের ওপর। বন্ধ্যা হোক তারা, নপুংসক হয়ে যাক, ভয়ংকর রোগে পড়ুক, মরুক যন্ত্রণায় ছটফট করে...'

ওর পক্ষের উকিল দাবি করেছিল, জুরি যেন এই রায় দেয় যে উত্তেজনায় রাগের বশে খুন হয়ে গেছে। জুরি কিন্তু জনগণের তুমুল উল্লাসের মধ্যে দোনাতোকে একেবারেই খালাস দিয়ে দিলে। বিজয়ী বীরের মতো দোনাতো ফিরে এল সেনার্কিয়ায়। ইজ্জত নষ্টের

জবাবে রক্তাক্ত প্রতিহিংসার প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের কঠিন অনুগামী হিশেবে অভিনন্দিত হল দোনাতো।

দোনাতোর মুক্তির কিছু পরে জেল থেকে ছাড়া পেল তার দেশোয়ালী এমিলিয়া ব্রাক্কো। মনমরা শীতকাল তখন। খ্রীস্ট জন্মের উৎসব এগিয়ে আসছিল, সে সময় লোকের খুব ইচ্ছে হয় নিজেদের আত্মপরিজনের মধ্যে, নিজেদের গরম ভিটেটিতে থাকতে। কিন্তু এমিলিয়া আর দোনাতো রইল নিঃসঙ্গ, কেননা তাদের খ্যাতিটা এমন নয় যে তাতে লোকের শ্রদ্ধা হবে — যতই হোক না কেন, যে খুন করেছে সে খুনীই। লোককে সে চমৎকৃত করে দিতে পারে, কিন্তু ঐটুকুই, তাকে সমর্থন করাও সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা যাবে কেমন করে? এদের দু'জনের হাতই রক্তমাখা, দু'জনের মনই ভাঙা, আদালতের রূঢ় নাটকের মধ্যে দিয়ে এরা এসেছে দু'জনেই। তাই ভাগ্য-বিড়ম্বিত এই দুটো মানুষ যে পরস্পরের কাছাকাছি হবে, দু'জনের ভাঙা জীবন আলো করে তুলতে চাইবে দু'জনে, তাতে সেনার্কিয়ার লোকেদের কাছে অবাক লাগে নি; ওদের দু'জনেরই বয়স কম — দু'জনেরই মন কাঁদে সোহাগ আদরের জন্য।

'অতীতের এই সব কষ্টকর স্মৃতির মাঝখানে থেকে এখানে কি করব আমরা?' প্রথম চুম্বন বিনিময়ের পর দোনাতো বললে এমিলিয়াকে।

এমিলিয়া বললে, 'আমার স্বামী ফিরলে নির্ঘাৎ সে আমার প্রাণ নেবে, কেননা মনে মনে এখন আমি সত্যি করেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছি তার প্রতি।'

ওরা ঠিক করলে যাবার মতো টাকা জমাতে পারা মাত্রই ওরা সমুদ্র পাড়ি দেবে, হয়ত পৃথিবীর কোথাও কিছু সুখ আর শান্তি

ঘেরা একটু ঘর তারা পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু যে-লোকগুলোর মধ্যে তারা বাস করছিল, তারা বলাবলি করলে:

'রাগের বশে খুন করে বসা আমরা ক্ষমা করতে পারি। ইজ্জত রক্ষার জন্যে যে অপরাধ, তাতে আমরা হাততালি দিয়েছি। কিন্তু এ দুটি লোক কি ঠিক সেই ঐতিহ্যকেই পায়ে দলছে না, যার নামে অত রক্ত ঝরল?'

এই রূঢ় নির্মম বিচার — কঠোর কোন প্রাচীন যুগের এই প্রতিধ্বনি ক্রমেই উঁচু হতে হতে শেষ পর্যন্ত কানে গেল এমিলিয়ার মা, সেরাফিনা আমাতোর। গর্বময়ী সবলা এক নারী ছিল সেরাফিনা, পঞ্চাশ বছর বয়স সত্ত্বেও পাহাড়ী রূপ তার নষ্ট হয় নি।

তার মানহানি হচ্ছে যে-গুজবটায় প্রথম প্রথম সেটা সে বিশ্বাস করে নি। বললে:

'নেহাৎ কুৎসা। মান বাঁচাবার জন্যে আমার মেয়ে কী কষ্ট পেয়েছিল তা তোমরা ভুলে গেছ?'

লোকে বললে, 'আমরা ভুলি নি, ভুলেছে সেই।'

সেরাফিনা বাস করত অন্য গাঁয়ে। গাঁ থেকে একদিন সে তাই এল মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। বললে:

'লোকে তোর নামে নানা কথা বলতে শুরু করেছে, সেটা আমি চাই না। অতীতে যা করেছিলি, রক্তারক্তি সত্ত্বেও সে ছিল এক নিষ্পাপ নারীর ইজ্জতের কাজ — লোকেদের শিক্ষার জন্যে সেটাকে তাই রাখতে হবে!'

মেয়ে তার কাঁদতে শুরু করলে:

'লোকেদের জন্যে পৃথিবী, কিন্তু কিসের জন্যে লোকেরা যদি নিজের জন্যে নিজে তারা না বাঁচতে পারে?..'

মা বললে, 'এর জবাব জানিস না এমন বোকাই যদি হোস তো জিগ্যেস কর গে পুরুতকে।'

মা তারপর গেল দোনাতোর কাছে, কড়া করে তাকে হুঁশিয়ার করে দিলে:

'আমার মেয়েকে শান্তিতে থাকতে দাও, নইলে পরে পস্তাবে।'

জোয়ান লোকটা মিনতি করে বললে, 'কথা শোনো, চিরকালের জন্যে এই নারীকে আমি ভালোবেসেছি। যেমন হতভাগ্য আমি, তেমনি সে! অনুমতি দাও, ওকে নিয়ে অন্য দেশে চলে যাই, তাতে সব দিক থেকেই মঙ্গল!'

তাতে কিন্তু আগুনে ঘি পড়ল।

আক্রোশে হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল সেরাফিনা, 'পালিয়ে যেতে চাও তোমরা? কখনই তা চলবে না!'

যে যার ওরা চলে গেল জন্তুর মতো গজরাতে গজরাতে, আপোসহীন শত্রুর মতো আগুনে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে।

শিকারী কুকুর যেমন করে শিকারের পেছু নেয়, সেদিন থেকে সেরাফিনাও তেমনি করে নজর রাখতে শুরু করল প্রেমিক যুগলের পেছনে। তবে তাতে ওদের গোপন রাত্রির মিলনে বাধা হল না, কেননা প্রেমও জন্তুর মতোই চতুর আর সেয়ানা।

কিন্তু একদিন সেরাফিনার কানে গেল, গুয়ার্নাচিয়া আর তার মেয়ে পালাবার মতলব ভাঁজছে। শুনেই সেই অশুভ মুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক কান্ড করার সিদ্ধান্ত নিলে সেরাফিনা।

রবিবারে লোকেরা গির্জায় জড়ো হয়েছে খ্রীস্টীয় ভজন শোনবার জন্য। সামনের দিকে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা, পরনে তাদের পরবের দিনের রংচঙা স্কার্ট আর শাল। তাদের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসেছে পুরুষেরা। আমাদের প্রেমিক যুগলও এসেছিল মাডোনার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে।

সেরাফিনা আমাতো গির্জায় এল অন্য সকলের চেয়ে দেরি করে।

তারও পরনে পরব দিনের পোশাক। স্কার্টের ওপর চওড়া নক্সা তোলা একটা এপ্রণ, আর সেই এপ্রণের নীচে কুড়ুল।

মুখে প্রার্থনা নিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল সেনার্কিয়ার কুলদেবতা আর্কএঞ্জেল মিখাইলের প্রতিমূর্তির দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে প্রতিমূর্তির হাত আর নিজের ঠোঁট। তারপর চুপি চুপি এগিয়ে গেল তার মেয়ের প্ররোচকের কাছে — অন্য সকলের সঙ্গে সেও বসে ছিল হাঁটু গেড়ে। তারপর মাথার ওপর দুটি আঘাতে গর্ত করে প্রতিহিংসার প্রতীক হিসেবে এঁকে দিলে রোমান সংখ্যা বা অক্ষর — 'পাঁচ' অর্থাৎ ভেন্‌দেত্তা।

আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। চেঁচামেচি করে লোকে ছুটল বাইরে যাবার দরজার দিকে। টালি বাঁধানো মেঝের ওপর অনেকে লুটিয়ে পড়ল অজ্ঞান হয়ে, অনেকে কাঁদতে লাগল ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু সরলমতি মানুষের কাছে অন্যায়ের প্রতিশোধের দেবী গ্রাম্য নেমেসিসের মতো সেরাফিনা দাঁড়িয়ে রইল বেচারী দোনাতো আর তার জ্ঞানহীন মেয়ের ওপর কুড়ুলখানা তুলে।

বহুক্ষণ অমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর লোকেদের যখন সম্বিত ফিরল, এসে ধরল তাকে, তখন সে তার বন্য আনন্দে জ্বলে-ওঠা চোখ দুখানা আকাশের দিকে তুলে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে শুরু করলে:

'মহাত্মা মিখাইল, আমার কৃতজ্ঞতা নাও! এক নারীর, আমার মেয়ের লাঞ্ছিত সম্মান বাঁচাবার জন্যে প্রতিহিংসা নেবার শক্তি তুমিই দিয়েছ আমায়!'

ও যখন শুনলে, গুয়ার্নাচিয়া বেঁচে আছে, তাকে বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তার মারাত্মক জখমগুলো ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন ভয়ানক কাঁপুনি ধরল তার; আতঙ্কিত উন্মাদ চোখদুটো ঘোরাতে ঘোরাতে সে বললে:

মা তারপর গেল দোনাতোর কাছে, কড়া করে তাকে হুঁশিয়ার করে দিলে :

'আমার মেয়েকে শান্তিতে থাকতে দাও, নইলে পরে পস্তাবে।'

জোয়ান লোকটা মিনতি করে বললে, 'কথা শোনো, চিরকালের জন্যে এই নারীকে আমি ভালোবেসেছি। যেমন হতভাগ্য আমি, তেমনি সে! অনুমতি দাও, ওকে নিয়ে অন্য দেশে চলে যাই, তাতে সব দিক থেকেই মঙ্গল!'

তাতে কিন্তু আগুনে ঘি পড়ল।

আক্রোশে হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল সেরাফিনা, 'পালিয়ে যেতে চাও তোমরা? কখনই তা চলবে না!'

যে যার ওরা চলে গেল জন্তুর মতো গজরাতে গজরাতে, আপোসহীন শত্রুর মতো আগুনে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতে তাকাতে।

শিকারী কুকুর যেমন করে শিকারের পেছু নেয়, সেদিন থেকে সেরাফিনাও তেমনি করে নজর রাখতে শুরু করল প্রেমিক যুগলের পেছনে। তবে তাতে ওদের গোপন রাত্রির মিলনে বাধা হল না, কেননা প্রেমও জন্তুর মতোই চতুর আর সেয়ানা।

কিন্তু একদিন সেরাফিনার কানে গেল, গুয়ার্নাচিয়া আর তার মেয়ে পালাবার মতলব ভাঁজছে। শুনেই সেই অশুভ মুহূর্তে ভয়ংকর এক কাণ্ড করার সিদ্ধান্ত নিলে সেরাফিনা।

রবিবারে লোকেরা গির্জায় জড়ো হয়েছে খ্রীস্টীয় ভজন শোনবার জন্য। সামনের দিকে দাঁড়িয়েছে মেয়েরা, পরনে তাদের পরবের দিনের রংচঙা স্কার্ট আর শাল। তাদের পেছনে হাঁটু গেড়ে বসেছে পুরুষেরা। আমাদের প্রেমিক যুগলও এসেছিল মাডোনার কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে।

সেরাফিনা আমাতো গির্জায় এল অন্য সকলের চেয়ে দেরি করে।

তারও পরনে পরব দিনের পোশাক। স্কার্টের ওপর চওড়া নক্সা তোলা একটা এপ্রণ, আর সেই এপ্রণের নীচে কুড়ুল।

মুখে প্রার্থনা নিয়ে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে গেল সেনার্কিয়ার কুলদেবতা আর্কএঞ্জেল মিখাইলের প্রতিমূর্তির দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে প্রতিমূর্তির হাত আর নিজের ঠোঁট। তারপর চুপি চুপি এগিয়ে গেল তার মেয়ের প্ররোচকের কাছে — অন্য সকলের সঙ্গে সেও বসে ছিল হাঁটু গেড়ে। তারপর মাথার ওপর দুটি আঘাতে গর্ত করে প্রতিহিংসার প্রতীক হিসেবে এঁকে দিলে রোমান সংখ্যা বা অক্ষর — 'পাঁচ' অর্থাৎ ভেন্‌দেত্তা।

আতঙ্কের ঝড় বয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। চেঁচামেচি করে লোকে ছুটল বাইরে যাবার দরজার দিকে। টালি বাঁধানো মেঝের ওপর অনেকে লুটিয়ে পড়ল অজ্ঞান হয়ে, অনেকে কাঁদতে লাগল ছেলেমানুষের মতো। কিন্তু সরলমতি মানুষের কাছে অন্যায়ের প্রতিশোধের দেবী গ্রাম্য নেমেসিসের মতো সেরাফিনা দাঁড়িয়ে রইল বেচারী দোনাতো আর তার জ্ঞানহীন মেয়ের ওপর কুড়ুলখানা তুলে।

বহুক্ষণ অমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর লোকেদের যখন সম্বিত ফিরল, এসে ধরল তাকে, তখন সে তার বন্য আনন্দে জ্বলে-ওঠা চোখ দুখানা আকাশের দিকে তুলে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনা করতে শুরু করলে:

'মহাত্মা মিখাইল, আমার কৃতজ্ঞতা নাও! এক নারীর, আমার মেয়ের লাঞ্ছিত সম্মান বাঁচাবার জন্যে প্রতিহিংসা নেবার শক্তি তুমিই দিয়েছ আমায়!'

ও যখন শুনলে, গুয়ার্নাচিয়া বেঁচে আছে, তাকে বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তার মারাত্মক জখমগুলো ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হচ্ছে, তখন ভয়ানক কাঁপুনি ধরল তার; আতঙ্কিত উন্মাদ চোখদুটো ঘোরাতে ঘোরাতে সে বললে:

'না, না, হতে পারে না, ভগবানে বিশ্বাস আছে আমার, ও লোকটা মরতে বাধ্য! দু-দুটো মারাত্মক জখম করেছি আমি — নিজের হাতেই তা আমি টের পেয়েছিলাম — ভগবান অন্যায় করেন না কখনো, ও লোকটাকে মরতে হবেই!..'

শীগগিরই অবশ্য বিচার হবে মেয়েটার। কঠিন সাজাও তাকে দেবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে, অন্যকে ঘা মারার, জখম করার অধিকার তার আছে, সাজা দিয়ে কী শিক্ষা হবে তার? পিটিয়ে পিটিয়ে কি লোহাকে কখনো নরম করা যায়?

বিচারক মানুষকে বলে:

'তুমি দোষী!'

মানুষ জবাব দেয় 'হ্যাঁ' কিংবা 'না', আর সবই থেকে যায় আগের মতোই।

আর শেষ কথা সিনোর, সে হল এই যে, ভগবান মানুষকে যে-দেশে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছে, যে-দেশের মাটি তাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে নারী, সেই দেশেই সে বাড়ুক, সেইখানেই তার বংশবৃদ্ধি হতে থাক...

জিয়োভান্নি তুবা

সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে বুড়ো জিয়োভান্নি তুবার মন কেড়েছে ডাঙার বদলে সমুদ্র—মন কেড়েছে সেই অসীম নীল, কিশোরী মেয়ের চাউনির মতো যা কখনো শান্ত সোহাগী, কখনো-বা কামনাচ্ছন্ন নারী হৃদয়ের মতো ঝোড়ো, সেই আদিগন্ত মরুভূমি, মাছেদের কাছে নিষ্প্রয়োজন সূর্যকিরণ যা শুষে নেয়, আর সোনালী রোদের সঙ্গে শোভা আর চোখ ধাঁধানো ঝলক ছাড়া অন্য কিছুর জন্ম দেয় না, সেই কুটিল সমুদ্র, চিরকাল কী যেন সে গান গায়, মনের মধ্যে অদম্য বাসনা জেগে ওঠে ভেসে যাই তার দূর থেকে সুদূরে। মাটি—সে তো বোবা, পাথর ভরা, আকাশ থেকে কত জল ঝরিয়েই না তাকে ভিজকে হবে, লোকেদের কাছ থেকে কত মেহনতই না সে দাবি করে, অথচ দেয় কত অল্পই না সুখ, বড়ো অল্প! সেই মাটি থেকে কত মানুষকেই না টেনে নিয়ে গেছে সমুদ্র!

সেই ছেলেবেলায় তুবা যখন কাজ করত আঙুর-বাগিচায় — পাহাড়ের গা বেয়ে ধূসর পাথরের দেয়াল তোলা থাকে-থাকে গাঁথা সেই আঙুর-বাগিচার ভেতর, ধাতুর পাতের মতো পাতাওয়ালা ঝাঁকড়া

ঝাঁকড়া ডুমুর আর জলপাই গাছগুলোর মধ্যে, কমলা লেবুর ঘনসবুজ গাছ আর ডালিম গাছের জটপাকানো ডালের নিচে, জ্বলজ্বলে রোদে, আতপ্ত মাটির ওপর, চারিপাশে ফুলের গন্ধের মধ্যে, সেই তখন থেকেই তুবা নাসারন্ধ্র স্ফীত করে তাকিয়ে থাকত সমুদ্রের নীল চোখের দিকে, তার চাউনি এমন যাতে মনে হত বুঝি ওর পায়ের নিচে মাটি শক্ত নয়, দুলছে, গলে যাচ্ছে, ভাসছে। তাকিয়েই থাকত সে, নোনা বাতাস আকণ্ঠ পান করে, উঠত মাতাল হয়ে, আনমনা, অলস, অবাধ্য — সমুদ্র যাদের যাদু করে, ডাকে, সমুদ্রের প্রেমে যারা পড়ে, তাদের এমনিই হয় চিরকাল...

আর ছুটির দিনের সেই ভোরবেলায়, সূর্য যখন পাহাড়ের পেছন থেকে সবে উঠেছে সরেণ্টোর ওপর, আকাশ গোলাপী যেন খুবানী ফুল দিয়ে বোনা, তখন পাহাড় বেয়ে নেমে আসত বাচ্চা তুবা, রাখালিয়া কুকুরের মতো ঝাঁকড়া-চুলো, কাঁধের ওপর মাছ-ধরা ছিপ, লাফাত পাথর থেকে পাথরে, মনে হত ওর শরীরে যেন হাড় নেই — আছে শুধু স্থিতিস্থাপক এক দলা পেশী; তারপর দৌড়ে নামত সমুদ্রের দিকে, চুলি ভরা পাটকিলে মুখটায় দরাজ হাসি ফুটিয়ে সে দিকে তাকাত আর জেগে ওঠা ফুলের মিঠে শ্বাস চাপা দিয়ে ভোরের ঝাঁঝালো সমুদ্রগন্ধ আর তরঙ্গের শান্ত মর্মর বাতাসে ভেসে আসত, অনেক নিচে পাথরের ওপর গড়িয়ে পড়া সে তরঙ্গ মেয়ের মতো তাকে ডাকত কাছে...

সেখানে ঝুলিয়ে ব্রোঞ্জরঙা পা গোলাপী-ধূসর একটা পাথরের ওপর স্থির হয়ে বসত সে, জামের মতো বড়ো কালো কালো দুই চোখের দৃষ্টি তলিয়ে যেত স্বচ্ছসবুজ জলে — সমস্ত রূপকথার চেয়েও মোহময় এক আশ্চর্য জগতের সন্ধান পেত সেই তরল কাচের মতো জলের নিচে: সমুদ্রের তলে গালিচায় ঢাকা পাথরের পাশে দুলত পাটকিলে-সোনালী সমুদ্র গুল্ম; সে গুল্মের ঘনবন থেকে ভেসে

উঠত সমুদ্রের জীবন্ত ফুল — রঙচঙে 'ভায়োলা', মাতালের মতো বেরিয়ে আসত 'পার্চে' — ঝাপসা চোখ, ডোরা-কাটা নাক, আর পেটের ওপর নীল নীল ফুটকি, ঝলক দিত সোনালী রঙের 'সার্পে', বেপরোয়া ডোরা-কাটা 'কেনি', ফুর্তিবাজ বিচ্ছুর মতো ছিটকে যাওয়া কালো কালো 'গুয়ারাসিনি', রুপোর চাকতির মতো চক্‌চকে 'স্পারাগালিয়োনি', 'আকিয়েট' এবং আরো কত সুন্দর সুন্দর মাছ!— এমন ধূর্ত সবাই যে গোল গোল মুখ দিয়ে বড়শির টোপ গভীরে গেলবার আগে ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁত দিয়ে তা দেখে নেবে ঠুকরে ঠুকরে — সেয়ানা সব মাছ!..

শান্ত মধুর এই জলের মধ্যে বাতাসে ভাসা পাখির মতো ভেসে বেড়াত গুঁপো চিংড়ি মাছ; গুহাবাসী কাঁকড়ারা তাদের অলংকৃত খোলসগুলো টানতে টানতে হেঁটে যেত জলের নিচেকার পাথর নুড়ির ওপর দিয়ে; রক্তের মতো লাল 'তারা' মাছগুলো ধীরে ধীরে জল কেটে এগুত; বেগুনী জেলি মাছগুলো দুলত নিঃশব্দে; ধারালো দাঁতওয়ালা মুরায়েনাগুলো হঠাৎ বেরিয়ে আসত পাথরের তল থেকে, লাল লাল ফোঁটা দেওয়া সর্পিল দেহখানা মোচড় খেত এদিক-ওদিক, দেখাত ঠিক যেন সেই রূপকথার ডাইনীর মতো শুধু তার চেয়েও আরো কুৎসিত, আরো ভয়ংকর। তারপর হঠাৎ এক নোংরা একটুকরো ন্যাকড়ার মতো ধূসর অক্টোপাস শিকারী পাখির মতো ছোঁ মারত কোথায়। খানিক পরেই হয়ত দেখা যেত একটা গলদা চিংড়ি, কঞ্চির ছিপের মতো লম্বা লম্বা মোচ, তাড়াহুড়ো না করে যেতে যেতে ছটকিয়ে উঠছে। এই সব এবং এমনি আরো অসংখ্য জীব বাস করত সেই স্বচ্ছ জলের মধ্যে, আকাশের তলায়, সে আকাশ সমুদ্রের মতোই পরিষ্কার তবে সমুদ্রের চেয়ে অনেক বেশি নির্জন।

আর নিঃশ্বাস নিত সমুদ্র, ধীরে ধীরে ফুলে উঠত তার নীল বুক। তুবা যে পাথরটার ওপর বসে থাকত তার গায়ে এসে ভেঙে পড়ত

দুধে-সবুজ তরঙ্গ -- খেলত তারা, পাথরে আছড়াত, ঝঙ্কার তুলে সে তরঙ্গ চেষ্টা করত তুবার পা পর্যন্ত পেঁছতে, কখনো কখনো পেঁছতও আর চমকে উঠে হেসে ফেলত তুবা, ঢেউগুলোও হাসত খুশিতে, পাথরটা থেকে ছুটে পালাত পেছনে, যেন ভয় পেয়ে, তারপর ফের এসে আছড়ে পড়ত পাথরের ওপর। এক রোদ এসে পেঁছত সে জলের নিচে, ঢেউয়ের বুকে তা বিঁধে থাকত সস্নেহে, গড়ে উঠত জ্বলজ্বলে রঙের এক চোঙা। আর তুবার মন হারিয়ে যেত মধুর তন্দ্রায়, কিছু সে ভাবত না, কিছু বুঝতে চাইত না, শুধু চোখে যা পড়েছে তারই এক নীরব উপভোগেই সে তৃপ্ত। সমস্ত সত্তাতেও তার নিঃশব্দে বয়ে যেত উজ্জ্বল তরঙ্গভঙ্গ, মন তার পাখা মেলত সমুদ্রের মতোই এক অসীম মুক্তিতে।

এই করেই ছুটির দিন কেটেছে তুবার, এর কিছু কাল পরে শুধু ছুটির দিনে নয় — কাজের দিনেও ডাক পাঠাতে শুরু করলে সমুদ্র, কেননা সমুদ্র যখন কোন মানুষের মন কেড়ে নেয়, তখন সে লোকটাও হয়ে পড়ে সমুদ্রেরই তেমনি একটা আপন অংশ, জীবন্ত মানুষের কাছে যেমন অংশ তার হৃদয়। তাই তুবা তার জমিটুকু ভাইয়ের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সিসিলির উপকূলে প্রবাল ধরার জন্য, দলে রইল তারই মতো আরো সব লোক, যারা বিস্তৃতির ভক্ত। প্রবাল ধরার কাজটা কঠিন, কিন্তু সুন্দর কাজ। ডুবে মরার মুখোমুখি হতে হত দিনের মধ্যে বার দশেক করে, কিন্তু যখন নীল জলের মধ্যে থেকে টেনে টেনে তোলা হত লোহার দাঁত লাগানো অর্ধবৃত্তাকার জালখানা তখন কত আশ্চর্য জিনিসই না দেখেছে তুবা, মাথার মধ্যে যেমন ঘুর ঘুর করে ভাবনা, জালের মধ্যে তেমনি কত রঙের, কত রকমেরই না প্রাণী — তার ঠিক মাঝখানে, দামী দামী প্রবালের সেই গোলাপী ঝাড়, মানুষের জন্য যা সমুদ্রের উপহার!

আর তাই সমুদ্রের মায়ায় বাঁধা পড়া এই লোকটা চিরকালের মতো খসে গেল মাটি থেকে। মেয়েদেরকেও ভালোবাসল সে, কিন্তু সে যেন শুধু এক স্বপ্নের মধ্যে, অল্প একটুখানির জন্য, নীরবে — বলবার মতো কথা তার ছিল শুধু সেই নিয়ে, যা সে জানত — সেই মাছ আর প্রবাল, সেই ঢেউয়ের লীলা খেলা, বাতাসের খেয়ালিপনা, অজানা সাগর পাড়ি দেওয়া বড়ো বড়ো জাহাজের কথা। ডাঙ্গায় সে ছিল ভীরু, মাটির ওপর দিয়ে হাঁটত সতর্ক হয়ে, সন্দিগ্ধের মতো, লোকের সঙ্গে মেলামেশায় ছিল মাছের মতো মুখচোরা, বেইমান সমুদ্রকে বিশ্বাস না করে তার গভীর তলদেশ সন্ধান করতে যারা অভ্যস্ত, তাদের মতো তীক্ষ্ন চোখ মেলে কী খুঁজত লোকেদের দিকে চেয়ে। কিন্তু সমুদ্রে এক শান্ত সুখে ভরে উঠত ওর মন, সঙ্গী-সাথীদের দিকে মনোযোগ দিত, হাবভাব হয়ে উঠত শুশুকের মতো ক্ষিপ্র।

কিন্তু যতই ভালো জীবন মানুষ খুঁজে পাক না কেন, কয়েক ডজন বছরের বেশি তো আর তার মেয়াদ নয়। সমুদ্রের জলে পোড় খেয়ে খেয়ে বুড়োটা যখন আশী বছর বয়সে পৌঁছল, তখন বাতে পঙ্গু হাতদুটো তার আর কাজ করতে চাইলে না — ঢের খেটেছে তারা! বেঁকে যাওয়া পায়ের ওপরে নুয়ে পড়া দেহখানাকে ঠেকা দিয়ে রাখাও ভার হল। তাই সমস্ত ঝড়-জল খাওয়া তুবা বিমর্ষ মনে এসে উঠল এই দ্বীপখানায়, পাহাড় বেয়ে বেয়ে উঠে গেল তার ভাইয়ের কুঁড়েয়, তার ভাইয়ের ছেলেপুলে নাতিপুতির কাছে। এরা এত বেশি গরিব যে দয়ামায়া থাকা সম্ভব নয়, আর বৃদ্ধ তুবাও আর আগের মতো গাদা গাদা সুস্বাদু মাছ নিয়ে আসতে পারে না।

এ সংসারের লোকগুলোর মধ্যে তুবার দিন কাটত কষ্টে, বাঁকাচোরা কালচে বুড়ো হাত দিয়ে রুটির যে টুকরো সে তুলত তার দন্তহীন মুখের ভেতর, তার দিকে বড়ো বেশি নজর রাখত সবাই। শিগগিরই তুবা টের পেলে, এদের মধ্যে সে অতিরিক্ত। মন তার আঁধার হয়ে

এল, বুক মোচড়াত দুঃখে, রোদ-পোড়া চামড়ার ওপর গভীর হয়ে ফুটল বলিরেখা আর বুড়ো হাড়গুলোয় নতুন একটা ব্যথা শুরু হল। কুঁড়ের দোরগোড়ায় পাথরের ওপর সে বসে থাকত সকাল থেকে সন্ধে, বুড়ো চোখে চেয়ে দেখত উজ্জ্বল সমুদ্রের দিকে, যেখানে উজাড় করে দিয়েছে তার জীবন, এই নীলিমায় রোদ্দুরের ঝলকে স্বপ্নের মতো সুন্দর সমুদ্রে।

সমুদ্র তার কাছ থেকে এখন অনেক দূরে, তার কূল পর্যন্ত পৌঁছনো বুড়োর পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু মন ঠিক করে ফেললে তুবা, তারপর এক শান্ত সন্ধ্যায় দলিত টিকটিকির মতো খোঁচা খোঁচা পাথরগুলোর ওপর ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে নামতে শুরু করলে পাহাড় থেকে। ঢেউগুলোর কাছাকাছি পৌঁছতেই তারা সেই পরিচিত কল্লোল তুলে পৃথিবীর মরা পাথরগুলোয় আছাড় খেয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাকে — মানুষের কণ্ঠস্বরের চেয়ে সে কল্লোল ঢের কোমল। হাঁটু গেড়ে বসেছিল বুড়ো — পরে লোকেদের তাই ধারণা হয়েছিল, — আকাশের দিকে আর বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে একটু প্রার্থনা করেছিল সমস্ত মানুষের জন্য, যারা তার কাছে সমান অনাত্মীয়ের মতো; তারপর যেসব ন্যাতাকানি দিয়ে তার বুড়ো হাড় কখনো ঢাকা ছিল, গায়ের চামড়ার মতো সেই পুরনো জিনিসগুলোকে — তারই-তবু-তার নয় সেই জিনিসগুলোকে পাথরের ওপর রেখে নেমে গিয়েছিল জলে। শাদা মাথাখানা হেলিয়ে, আকাশের দিকে মুখ করে চিত হয়ে তুবা সাঁতার কেটে যায় সেই দূরে যেখানে আকাশের ঘন নীলিমা তার মখমলের কিনারা দিয়ে স্পর্শ করেছে ঢেউগুলোকে, যেখানে তারারা সমুদ্রের এত কাছে যে মনে হয় হাত বাড়ালেই ধরা যাবে যেন।

গ্রীষ্মের চুপচাপ রাতগুলোয় সমুদ্র শান্ত যেন সারা দিনের খেলা শেষ করার পর ক্লান্ত এক শিশুর মন। দুলছে সমুদ্র, আবছা নিঃশ্বাস পড়ছে তার, নিশ্চয়ই জ্বলজ্বলে স্বপ্ন দেখছে কোন। তার ঘন

উষ্ণ জলে রাত্রে সাঁতার কেটে গেলে হাতের নিচে জ্বলে উঠবে নীল নীল ফুলকি, শরীর ঘিরে ঝিলমিল করবে নীল শিখা, আর মায়ের মুখে শোনা গল্পের মতো সোহাগী সে আগুনে ধীরে ধীরে গলে যাবে প্রাণ।

বুড়ো চেঙ্কো

পূত স্তব্ধতায় সূর্য ওঠে, দ্বীপের পাথরগুলো থেকে সোনালী ফার্জ লতার সুগন্ধে ভারাক্রান্ত একটা ঘুঘুরঙা কুয়াশা উঠে ভেসে যায় আকাশের দিকে।

নিদ্রালু কালো জল চারিদিকে, ওপরে আকাশের বিবর্ণ গম্বুজ — দ্বীপটাকে মনে হয় যেন সূর্যদেবের সম্মুখে বলিদানের বেদী।

সবে মিলিয়ে গেছে তারা, কিন্তু পালকের মতো স্বচ্ছ এক মেঘরেখার ওপরে ঘোলাটে আকাশের তুহিন উচ্চতায় একই রকম মিলিয়ে গিয়ে তখনো ঝক ঝক করছে শুধু শাদা শুকতারা; আবছা গোলাপী রঙ লেগেছে মেঘে, প্রথম রোদের কিরণে ওরা মৃদুমন্দ পুড়ছে। সমুদ্রের শান্ত বুকে তাদের ছায়া যেন অতল নীল থেকে ভেসে ওঠা শুক্তি।

রুপোলী শিশিরসিক্ত ঘাসের শিষে আর ফুলের পাপড়িগুলো টান টান হয়ে উঠছে সূর্যের দিকে। উষ্ণ ঘুমের মধ্যে ঘামে নেয়ে উঠেছে মাটি, ঘাসপাতার ডগায় এসে জমা ঝকমকে শিশির বিন্দুগুলো বড়ো হতে হতে সেই মাটির ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। ইচ্ছে হয় যেন এই

ঝরে পড়ার শান্ত নিক্কণ শুনতে পাই, আর কষ্ট লাগে শোনা যায় না বলে।

পাখিরা জেগে উঠে জলপাই গাছের পাতার ফাঁকে লাফালাফি করে, গান গাইছে, আর নিচে থেকে আসে রোদ্দুরে ঘুম-ভাঙা সমুদ্রের গাঢ় নিঃশ্বাস।

তবু, সবকিছুই চুপচাপ, কেননা লোকজন এখনো জাগে নি। ভোরের তাজা আমেজে ঘাস আর ফুলের গন্ধ শব্দের চেয়েও জোরালো।

শাদা ছোট্ট বাড়িখানা আঙুরলতায় এমন ছাওয়া যেন মনে হয় সবুজ ঢেউয়ের কোলে একটি নৌকো। সে বাড়ির দরজা থেকে বুড়ো এস্তোরে চেক্কো বেরিয়ে আসে সূর্য দেখবার জন্য। নিঃসঙ্গ ছোটোখাটো চেহারার এক বুড়ো সে, হনুমানের মতো লম্বা লম্বা হাত, প্রাজ্ঞের মতো নগ্ন করোটি, বয়সের ছাপে মুখখানা এমন তোবড়ানো, যে চোখ দুখানা তার লোল বলিরেখায় প্রায় ঢাকা।

কালোমতো রোমশ হাতখানা ধীরে ধীরে কপালের কাছে তুলে বুড়ো তাকায় গোলাপী আকাশের দিকে, তারপর চারিপাশে: ধূসর-বেগুনি পাথরের পৃষ্ঠপটে শ্যাম-সোনালীর সমারোহ, জ্বল জ্বল করে লাল গোলাপী আর হলুদরঙা ফুল। গাঢ় রঙের মুখখানা তার কেঁপে ওঠে এক ভালোমানুষী মুচকি হাসিতে, ভারি গোল মাথাখানা নাড়ে যেন তারিফ করে।

দাঁড়ায় এমনভাবে যেন ভারি একটা বোঝা বইতে হচ্ছে ওকে — পিঠটা বেঁকে থাকে একটু, পাদুটো অনেকখানি ফাঁক করে দাঁড়ানো, আর তখন তার চারপাশে ফোটে অরুণ দিনের হাসিখুশি লীলা, আঙুরগাছের সবুজ জ্বলে প্রখরতর দীপ্তিতে, আরো জোরে বেজে ওঠে হলুদমণি পাখির কাকলী; কালজাম, আর স্পার্জ ঝাড়ের মধ্যে

ঝটপট করে ওঠে ভারুই পাখি, আর কোথায় এক বুলবুলি ওঠে শীস দিয়ে, নেপ্‌ল্‌সের ফুলবাবুর মতোই পাখিটার চিন্তাভাবনার বালাই নেই।

মাথার ওপর অবসন্ন লম্বা হাতদুটো উঁচু করে এমনভাবে আড়িমুড়ি ভাঙে বুড়ো চেক্কো যেন এক্ষুনি সে উড়ে যাবে নিচে, সমুদ্রে — পাত্রে রাখা সুরার মতোই সে সমুদ্র শান্ত।

বুড়ো হাড়গুলোর জড়তা ভেঙে দরজার কাছে এক পাথরের ওপর বসে চেক্কো, জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পোস্ট্‌-কার্ড বার করে আনে, তারপর দূরে ধরে চোখ কুঁচকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকে পোস্ট্‌-কার্ডটার দিকে, ঠোঁটদুটো নড়তে থাকে নিঃশব্দে। খোঁচা খোঁচা রুপোলী দাড়ি-ভরা ওর মস্ত মুখখানা নতুন করে হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠে — সে হাসিতে ভালোবাসা আর কষ্ট আর গর্ব মিশেছে বিচিত্রভাবে।

সামনে ওর এক টুকরো পেস্টবোর্ডের ওপর নীল রঙে চওড়া কাঁধদুটো ছোঁড়ার ছবি আঁকা — দুই তরুণ জোয়ান, পাশাপাশি বসে খুশিতে হাসছে, বুড়ো চেক্কোর মতোই মাথাদুটো তাদের বড়ো বড়ো, কোঁকড়া চুল। কার্ডখানার ওপরে পরিষ্কার বড় বড় হরফে ছাপা আছে:

‘আরতুরো এবং এন্‌রিকো চেক্কো

শ্রেণী স্বার্থের দুই বীর যোদ্ধা। হপ্তায় ছ ডলার মজুরির প্রতিবাদে ২৫০০০ সুতাকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার অপরাধে তাদের কারাদণ্ড হয়েছে।

‘সামাজিক ন্যায় ব্যবস্থার যোদ্ধারা দীর্ঘজীবী হোক!’

বুড়ো চেক্কো পড়তে জানে না, তাছাড়া কথাগুলো আবার লেখা আছে এক বিদেশী ভাষায়; কিন্তু সে জানে এই কথাই লেখা আছে

পাতে, এর প্রত্যেকটি শব্দই তার জানা, প্রত্যেকটা শব্দই চিৎকার করে, ঝংকার দেয় রামশিঙার মতো।

নীল পোস্ট্-কার্ডখানা পেয়ে ব্‌ড়োর দ্‌শ্চিন্তা আর ঝামেলার শেষ ছিল না। দ্‌মাস আগে চিঠিটা এসেছিল; বাপের মন তখ্‌নি টের পেয়েছিল কিছ্‌ একটা গোলমাল হয়েছে; আইন না ভাঙলে তো আর গরিব মান্‌ষের ছবি ছাপা হয় না!

কাগজখানা সে ল্‌কিয়ে রেখেছিল পকেটের মধ্যে, কিন্তু পাথরের মতো সেটা ভারি হয়ে বসল তার ব্‌কে, দিন দিন সে ভার বাড়তেই থাকল। অনেকবার তার ইচ্ছে হয়েছিল চিঠিটা গিয়ে প্‌র্‌তকে দেখায়, কিন্তু দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা থেকে তার জানা ছিল, লোকে যা বলে সেটা সত্যি: 'মান্‌ষ সম্পর্কে সত্যি কথা প্‌র্‌ত বললেও বলতে পারে ভগবানের কাছে, মান্‌ষের কাছে সত্যি কথা কদাচ নয়।'

প্রথম যে লোকটার কাছে চেক্কো জিগ্যেস করেছিল ঐ রহস্যময় পোস্ট্-কার্ডটার মানে কী, সে লোকটা ছিল একজন বিদেশী শিল্পী, পাটকিলে চুল, ঢেঙা মতো দেখতে, রোগা, চেক্কোর বাড়িতে সে আসত প্রায়ই। ছবি আঁকার ইজেলখানাকে সে স্‌বিধামতো ঘ্‌রিয়ে রেখে পাশে শ্‌য়ে পড়ে ঘ্‌মত, অসমাপ্ত ছবিটার, চৌকো ছায়ার মধ্যে মাথা দিয়ে।

চেক্কো ওকে জিগ্যেস করলে, 'সিনোর, এই লোকদ্‌টো কী করেছে, দেখ্‌ন তো?'

ছেলেদ্‌টোর হাসিখ্‌শি ম্‌খের দিকে তাকিয়ে শিল্পী বলেছিল: 'নিশ্চয়ই খ্‌ব একটা মজার কাজ করেছে...'

'কিন্তু ওদের সম্পর্কে কী লেখা আছে এখানে?'

'লেখাটা ইংরেজিতে। ইংরেজ ছাড়া এ ভাষা বোঝেন শ্‌ধ্‌ ভগবান আর সম্ভবত বোঝে আমার স্ত্রী, যদি অবিশ্যি এক্ষেত্রে সে মিছে কথা না বলে থাকে। আর অন্য কোন ক্ষেত্রেই সে সত্যি কথা বলে না...'

শিল্পী ছিল ছাতার পাখির মতো বকবকে, বোঝাই যাচ্ছিল যে কোন কিছু গুরুত্ব দিয়ে বলার ক্ষমতা ওর নেই। মুখ ভার করে বুড়ো চলে এসেছিল ওর কাছ থেকে। পরের দিন গিয়েছিল শিল্পীর স্ত্রী, স্থূলকায়া মহিলাটির কাছে। উনি তখন বাগানে ছিলেন, স্বচ্ছ শাদা একটা ঢালাও গাউন পরে মহিলাটি ঝুলন-শয্যায় শুয়ে গরমে ঘামছিলেন, আর নীল আকাশের দিকে নীল চোখদুটো তুলে রেখেছিলেন সরোষে।

ভাঙা ভাঙা ইতালিয়ানে তিনি জানালেন, 'এদের জেল হয়েছে।'

চেক্কোর পাদুটো কেঁপে উঠল যেন ঘা খেয়ে নড়ে উঠেছে গোটা দ্বীপটা। তবু শক্তি সাহস সঞ্চয় করে জিগ্যেস করলে চেক্কো:

'ওরা কি চুরি করেছে কিছু, কিংবা খুন-খারাপি করেছে?'

'না, ওসব কিছু না। ওরা হল গিয়ে সোশ্যালিস্ট।'

'সোশ্যালিস্ট সে কী ব্যাপার?'

'ওসব হল গিয়ে রাজনীতি, বুঝেছ?' ম্রিয়মাণ গলায় কথা কয়টি বলে মহিলাটি চোখ বুজলেন।

চেক্কো জানত, বিদেশী লোকগুলো ভারি মাথামোটা, কালাব্রিয়ানদের চেয়েও বোকা, কিন্তু তার ছেলেদুটির কী হল সে কথাটা তাকে যে জানতেই হবে। তাই মহিলাটির পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করলে, কখন উনি তাঁর আলস্যে ভরা বড়ো বড়ো চোখদুটি মেলে তাকাবেন। এবং অবশেষে যখন তিনি তাকালেন তখন আঙুল দিয়ে পোস্ট্-কার্ডটা দেখিয়ে চেক্কো জিগ্যেস করলে:

'এটা কি সৎ ব্যাপার?'

বিরক্ত হয়ে উনি বললেন, 'জানি না। বললামই তো ও হল গে রাজনীতি, বুঝেছ?'

না, বুঝতে সে পারে নি। রাজনীতি করে রোমের মন্ত্রী আর

ধনী ব্যক্তিরা গরিবদের ওপর বেশি কর চাপাবার জন্য। আর ওর ছেলেরা শ্রমিক, থাকে আমেরিকায়, ছেলে হিশেবেও খাসা। রাজনীতি করার কী দায় পড়ল তাদের?

ছেলেদুটির ছবি হাতে নিয়ে সারা রাত বসে রইল সে — চাঁদের আলোয় ছবিখানা দেখাচ্ছিল কালো, আর তার চেয়েও কালো হয়ে উঠেছিল বুড়ো মানুষটার ভাবনা।

সকালে সে ঠিক করলে পুরুতকেই জিগ্যেস করবে। কালো আলখাল্লা-পরা লোকটা কড়া করে সংক্ষেপে বললে:

'ঈশ্বরের ইচ্ছা যারা অমান্য করে, তারাই হল সোশ্যালিস্ট। এইটুকু জানলেই তোমার যথেষ্ট।'

তারপর বুড়ো যেতে না যেতেই পুরুত আরো কড়া করে বললে:

'এতখানা বয়স হল, এখন এই সব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়া তোমার পক্ষে লজ্জারই কথা!..'

চেক্কো ভাবলে, 'ভাগ্যিস ছবিখানা ওকে দেখাই নি।'

গেল আরো তিন দিন। বুড়ো গেল একদিন নাপিতের কাছে — লোকটা বাবু গোছের, মাথায় কিছু নেই, জোয়ান গাধার মতো তাগড়াই। লোকে বলত, বয়স হয়ে যাওয়া যেসব মার্কিনী মাগীরা মুখে বলত সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখতে এসেছে অথচ আসলে চাইত গরিব ঘরের ছোকরাদের সঙ্গে মজা লুটতে, তাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ও ভালোবাসা বিলোয়।

ছবির ওপরকার লেখাগুলো পড়ে বদ লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ভগবান, ভগবান!' খুশিতে লাল হয়ে উঠল ওর গালদুটো। বললে, 'আরতুরো আর এন্‌রিকো, আমার বন্ধু! দিল খুলে তোমায় অভিনন্দন এত্তোরে বাবা, তোমাকে আর আমাকে! আমার দেশোয়ালী আরো দুটো ছেলে নাম করলে তাহলে! গর্ব হবে না, বলো?'

বুড়ো ধমক দিলে, 'বাজে বকিস না তো!'

কিন্তু নাপিত তার হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'চমৎকার ব্যাপার!'

'কী লিখেছে ওদের সম্পর্কে?'

'পড়তে আমি পারছি না, কিন্তু দেখে নিয়ো, সত্যি কথাই লিখেছে। গরিবদের সম্পর্কে যখন শেষ পর্যন্ত সত্যি কথা লিখেছে, তখন, নিশ্চয় তারা খুব একটা বীরত্বের কাজ করেছে!'

'দোহাই বাপু, বকবকানি থামা!' বলে রেগেমেগে পাথরের ওপর কাঠের জুতো ঠুক ঠুক করে চলে গেল চেক্কো।

গেল সেই রুশ ভদ্রলোকের কাছে। লোকে বলে মানুষটা নাকি সৎ আর দয়ালু। যে খাটিয়ার ওপর মানুষটা শুয়ে শুয়ে মরণ গুণছিল, সেই খাটিয়ার কাছে এসে বসল চেক্কো। জিগ্যেস করলে:

'এই লোকদুটো সম্পর্কে কী লিখেছে এখানে?'

রুশ ভদ্রলোক তার রোগপাণ্ডুর বিষণ্ণ চোখদুটো কুঁচকে কাহিল গলায় লেখাটা পড়ল, বুড়োর উদ্দেশে প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল তার মুখচোখ।

বুড়ো চেক্কো বললে, 'দেখুন সিনোর, ঢের বয়স হয়েছে আমার, শীগগিরই আমার ভগবানের কাছে যেতে হবে। মাডোনা যখন জিগ্যেস করবেন, ছেলেদের নিয়ে তুই কী করেছিস, তখন এই সত্যি কথাটা সব খুলে বলতে হবে তো। কিন্তু ছবিতে এই আমার দুটি ছেলে — কিন্তু তারা কী করল, কেনই বা জেলে গেল তার কিছুই যে আমি জানি না?'

রুশ ভদ্রলোক তখন গুরুত্বসহকারে তাকে সহজ পরামর্শ দিলে:

'মাডোনাকে বলবেন, তাঁর পুত্রের প্রধান অনুজ্ঞা আপনার ছেলেরা খুব ভালো করেই বুঝেছে: সত্যি করেই ওরা মানুষকে ভালোবেসেছে বুক ভরে...'

বুড়ো লোকটা বিশ্বাস করলে রুশ ভদ্রলোকের কথা, কেননা সহজ

ভাষায় কখনো মিছে কথা বলা সম্ভব নয়, তার জন্য চাই গালভরা শব্দ, সাজানো-গোছানো বুলি। রুগ্ন লোকটার ছোটো ছোটো যে হাত কখনো মেহনত জানে নি সেই হাতে প্রবল চাপ দিয়ে বুড়ো বললে:

'তাহলে জেলে যাওয়া ওদের পক্ষে সরমের কথা কিছু নয়?'

রুশ বললে, 'না। জানেন তো, বড়োলোকেরা জেলে যায় শুধু তখনই যখন তারা বড়ো বেশি কুকাজ করে, তা আর লুকতে পারে না। আর গরিবেরা জেলে যায় যেই তারা একটুখানি মঙ্গলের জন্যে চেষ্টা করে। আমি বলছি শুনুন, ছেলের দিক থেকে আপনি ভাগ্যবান পিতা!'

চেক্কোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সে কথা কইলে, ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বললে, গরিবি আর বোকামি দূর করার জন্য, গরিবি আর বোকামি থেকে যেসব অমঙ্গল আর জঘন্য জিনিস জন্মায় তা দূর করার জন্য দুনিয়ার ভালো মানুষেরা কী কী করছে...

আগুনের ফুলের মতো আকাশে জ্বলে সূর্য, ধূসর পাথরগুলোর ওপরে ঝরে ঝরে পড়ে সূর্যকিরণের স্বর্ণ ধূলিকণা, আর পাথরের প্রত্যেকটা ফাটল থেকে সূর্যের দিকে মাথা তোলে উদগ্র জীবন — মাথা তোলে শ্যামমরকত ঘাস আর আকাশের মতোই নীল নীল ফুল। স্ফটিকের মতো পূর্ণ শিশির বিন্দুর ওপর রোদ্দুরের সোনালী ফুলকি ঝিলিক দিয়ে উঠেই নিবে যায়।

বুড়োর চারপাশে রোদের সঞ্জীবনী শক্তি পান ক'রে আলোয় নেয়ে উঠছে সবকিছু, তাড়াহুড়ো করে বাসা বানাতে বানাতে গান গাইছে পাখিগুলো — চারিপাশের এই সবকিছু দেখে বুড়োটা আর ভাবে তার ছেলেদের কথা, কালাপানির ওপারে মস্ত এক শহরের জেলখানায় তারা বসে আছে। এটা ওদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, হ্যাঁ, খারাপই...

কিন্তু ওরা জেলে গেছে, কেননা সাঁচ্চা জোয়ান হয়ে উঠেছে তারা,

সারা জীবন ধরে যেমন সাচ্চা থেকেছে তাদের বাপ — আর এটা ওদের পক্ষে, তার নিজের প্রাণের পক্ষে ভালোই। ব্রোঞ্জ রঙের মুখখানা তার ঠিক যেন গলে যায় গর্বের এক হাসিতে।

'ধনসম্পদে ভরা পৃথিবী, লোকেরা গরিব, সূর্য দয়ালু, কিন্তু মানুষ হিংস্র। এই সব কথা আমি ভেবে মরেছি সারা জীবন, আর সে কথা ওদের না বললেও ওরা টের পেয়েছে বাপের ভাবনা। হপ্তায় ছ ডলার, তার মানে চল্লিশ লিরা। বাপরে! কিন্তু ওরা ভাবল, ভারি কম মজুরি, আর ওদের মতো পঁচিশ হাজার আরো লোক, তারাও সেই কথা ভাবল — মানুষের পক্ষে ভালো করে বাঁচতে হলে এ মজুরিতে চলে না...'

ওর দৃঢ় বিশ্বাস, যেসব ভাবনা লুকিয়ে ছিল ওর নিজের মনের মধ্যে, তাই বেড়ে উঠেছে ওর ছেলেদের ভেতরে, আর তাতে ওর গর্বের সীমা নেই। কিন্তু এও জানে ও, দিনের পর দিন লোকেরা নিজেরা যেসব রূপকথা বুনেছে নিজেরাই তা বড় একটা বিশ্বাস করতে পারে না। তাই সে চুপ করে থাকে।

তবু মাঝে মাঝে ওর বিপুল প্রাচীন হৃদয় ভরে ওঠে তার ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে, জীর্ণ শিরদাঁড়াটাকে সে তখন সোজা করে দাঁড়ায়, বুক টান করে, শরীরের শেষ শক্তির সবখানি জড়ো করে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে সমুদ্রের দিকে চেয়ে, সেই দিকে চেয়ে যেদিকে আছে তার ছেলেরা:

'ভালি-ও-ও!..'*

আর সমুদ্রের ঘন কোমল জলের ওপর উঁচু থেকে আরো উঁচুতে ওঠে সূর্য আর হাসে, আর আঙুর-বাগিচার লোকজনদের কাছ থেকে ফিরে আসে বুড়ো লোকটার ডাকের জবাব:

'ও-ও!..'

---

* এক্ষেত্রে অর্থ: মাভৈঃ!

খ্রীস্টের জন্ম

রাত বারোটা বাজল বলে।

কাপ্রির ছোট্ট স্কোয়ারটার ওপরে নীল আকাশে ভেসে যায় নিচু নিচু মেঘ। ঝিকমিক করে তারার উজ্জ্বল আলপনা, নীল লুব্ধক নক্ষত্র এক-একবার জ্বলে ওঠে, এক-একবার নেভে। গির্জার খোলা দরজা দিয়ে গাঢ় স্রোতে ভেসে আসে অর্গানের জলদমন্দ্র স্বর। আর এই মেঘের ধাবন, তারার কাঁপন, দালানকোঠার দেয়াল আর স্কোয়ারের পাথরের ওপর ছায়ার সঞ্চরণ — এই সবকিছুও লাগে এক শান্ত সঙ্গীতের মতো।

সে সঙ্গীতের ভাবগম্ভীর ছন্দে দুলে ওঠে সারা স্কোয়ারটা — মনে হয় যেন নাটকের এক মঞ্চ, কখনো তা অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে, দেখাচ্ছে অপরিসর, কখন বিস্তীর্ণ হয়ে ভরে উঠছে ভুতুড়ে আলোয়।

মণ্টে-সোলিয়ারোর ওপরে জেগে আছে অপরূপ কালপুরুষ। পাহাড়ের চুড়োয় শাদা মেঘের ফল্যাও মুকুট। দেয়ালের মতো তার খাড়া গায়ে সারি সারি ফাটল যেন অন্ধকার, প্রাচীন, পৃথিবী আর মানুষ নিয়ে মহতী ভাবনায় আর্ত এক মুখচ্ছবি।

ওখানে, ছয়শো মিটার ওপরে আছে একটা পরিত্যক্ত ছোটো মঠ আর কবরখানা, সেটাও ছোটো, সমাধিগুলো উঁচু উঁচু ফুল-ভুঁইয়ের মতো, সংখ্যায় বেশি নয়, সেখানে, ফুলের তলে মঠের সব সাধুরা। এ মঠ এখন মেঘে ঢাকা। মেঘের ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যায় মঠের ধূসর দেয়াল উঁকি দিচ্ছে, যেন শুনতে চাইছে কী চলেছে নিচে।

হৈচৈ করে বাচ্চার দল ছুটে বেড়ায় স্কোয়ারে, বাজি পোড়ায়। আগুনে সাপগুলো পাথরে ফটাস করে লাফিয়ে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে লাল ফুলকি। মাঝে মাঝে সাহস করে বাজিতে আগুন দিয়েই কেউ কেউ তা ছুড়ে দেয় উঁচুতে, ভয় পাওয়া বাদুড়ের মতো বাজিটা হিস্‌হিসিয়ে ছটফট করতে থাকে বাতাসে। ছোটো ছোটো কালো কালো চটপটে যত মূর্তি হাসিহল্লায় ছুটে বেড়ায় চারিদিকে, সজোরে একটা বাজি ফাটে কোথায়, ঝলসানির আলোয় মুহূর্তের জন্য আলো হয়ে ওঠে ছেলেগুলোর কোণে কোণে গুড়ি মেরে থাকা মূর্তিগুলো, অন্ধকারের মধ্যে ফুর্তিতে চক চক করে ওঠে তাদের দুরন্ত চোখগুলো।

বাজি ফাটার শব্দে যেন ছেদ নেই। হাসিহল্লা, ভয়-পাওয়া চিৎকার আর গমগমে লাভার ওপর কাঠের জুতোর খটখট আওয়াজ — সবকিছু ডুবে যায় তাতে। ছায়া নাচে, কাঁপে, ওপরে উঠে গিয়ে মেঘে জ্বলতে থাকে লাল আলোর ছটা, আর ঘরবাড়ির সাবেকী দেয়ালগুলো বুঝি হাসে — আজ যারা বুড়ো, এ দেয়ালগুলো তাদের দেখেছে বাচ্চা বয়সে, খ্রীস্ট জন্মের এই রাতে ছেলেদের এই মুখর আর ঈষৎ বিপজ্জনক ফুর্তি তারা দেখেছে কতবার।

এর মধ্যে যদি মুহূর্তের জন্যও কখনো একটু গোলমাল থামে অমনি শোনা যায় অর্গানের ভাবগম্ভীর প্রার্থনাধ্বনি আর নিচ থেকে তার জবাবে ভেসে আসে সমুদ্রের সঙ্গত — শিলাতটের ওপর ভেঙে

পড়া তরঙ্গের চাপা গর্জন আর নুড়িপাথরের মধ্যে তাদের রেশমী খসখসানি।

উপসাগরটা যেন পানপাত্র, ভরে উঠেছে ফেনিল গাঢ় সুরায় আর সে সুরার পাত্রের কিনারা ঘিরে ঝিকমিকিয়ে আছে শহরের আলোগুলো — উপসাগরের গলায় দামী জড়োয়া হারের মতো।

নেপ্‌ল্‌সের ওপরকার আকাশে বহুবর্ণ ঘোলাটে আভা, দপ দপ করছে মেরুজ্যোতির মতো, গণ্ডা গণ্ডা হাউই আর আতসবাজি আকাশে ফুঁসে উঠে, জ্বলজ্বলে আগুনের আলোর তোড়া হয়ে ফুটে উঠেছে, থরোথরো আলোর মেঘে মুহূর্তের জন্য ভেসে থেকে নিবে যাচ্ছে, ভেসে আসছে ভারি শব্দ।

উপসাগরের গোটা অর্ধবৃত্ত জুড়ে চলেছে আগুনের মোহন আলাপ: নেপ্‌ল্‌স্‌ বন্দরের শাদা আলোকস্তম্ভটা জ্বলছে শান্তভাবে, ঝিকিয়ে উঠছে কাপো-দি-মিসেনারে লাল চোখ। আর ইস্‌কিয়ার পাদদেশ আর প্রোচিদায় আলোরে মালা দেখে মনে হয় যেন তমসার নরম মখমলের ওপর মস্ত মস্ত হীরের পাঁতি গাঁথা।

উপসাগর জুড়ে চরে বেড়ায় শ্বেতশীর্ষ ঊর্মির পাল। তাদের সুরেলা তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে নরম হয়ে ভেসে আসে আতসবাজির বিস্ফোরণের সুদূর শব্দ। অর্গানে চলতেই থাকে ঝঙ্কার, হাসতেই থাকে ছেলেপিলেরা। হঠাৎ সাড়ম্বরে মিনারের ওপরকার ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ করে প্রথমে চারটে পরে বারোটা বেজে ওঠে।

শেষ হয়ে যায় উপাসনা। রঙীন এক স্রোতের মতো গির্জার দরজা দিয়ে ভিড় করে বেরিয়ে আসে লোকজন, সিঁড়ির চওড়া চওড়া ধাপ বেয়ে নেমে আসে নিচে যেখানে লাল লাল সাপবাজি এঁকেবেঁকে যায় তাদের দিকে, আঁৎকে চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েরা আর খুশিতে হাসে বাচ্চাগুলো; আজ তাদের পরবের দিন, লাল আগুন নিয়ে আজ তাদের খেলায় মানা করবে কে?

পরবের পোশাক-পরা ধীরস্থির গোছের মানুষটাকে খানিকটা ভয় পাইয়ে দিয়ে কী মজাই না জমে! গোমড়ামুখোটা লাফালাফি শুরু করে দেবে স্কোয়ারের মধ্যে, সজোরে হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে বাজিটা তাড়া করবে তাকে, ফুলকি ঝরাবে তার বুট জুতোর উপর। আর এ মজা তো শুধু বছরে একবার...

যে-শিশু খ্রীস্ট ওদের ভালোবেসেছিল তার জন্মের এই পূর্বলগ্নে ছেলেদের মনে হয় তারা রাজা, জীবনের তারা মালিক, বছর ধরে বড়োদের একঘেয়ে প্রভুত্বের শোধ তুলতে তারা কসুর করবে না এই কয়েক মিনিটের ফুর্তির চূড়ান্ত করে। বড়োরা আনাড়ীর মতো লাফালাফি করে আগুন থেকে পালাবার চেষ্টা করবে, রাগ না করে অনুনয়-বিনয় করে রেহাই চাইবে:

'খুব হয়েছে! আরে এই, এই প্যাজিগুলো, — খুব হয়েছে!'

এর পর তাড়াতাড়ি করে আসে জাম্পোনিয়ারের দল, আব্রুজ্জার পাহাড়ী মেষপালক ওরা, গায়ে খাটো নীল আলখাল্লা, চওড়া কানাওয়ালা টুপি, সুগঠিত পা ঢেকে পশমের শাদা মোজা, তার ওপর ক্রুশাকারে জড়ানো কালো কালো ফিতে। ওদের দু'জনের আলখাল্লার নিচে দুটো ব্যাগপাইপ, চার জনের হাতে চড়া সুরের কাঠের শিঙা।

প্রতি বছর এরা দেখা দেয় এখানে, থাকে গোটা মাসটা, ওদের আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীতে প্রতিদিন জয়গান করে যিশু খ্রীস্ট আর মেরি মাতার।

ভোরবেলায় ওরা যখন মাথার টুপিগুলো পায়ের কাছে ফেলে মাডোনার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মায়ের কোমল মুখের দিকে, তাঁর নামে বাজায় সেই অনির্বচনীয় সুর, একদা যথার্থই যার নামকরণ হয়েছিল, 'ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভব' তখন ওদের দেখে বুক দুলে ওঠে।

মেষপালকের দলটা এখন চলেছে বুড়ো ছুতোর পাওলিনোর

বাড়িতে, সেখান থেকে, ঘোড়ার দানা দেবার ডাবা থেকে শিশুকে তুলে নিয়ে যাবে সেণ্ট তেরেসা গির্জায়।

ছেলেরা ছোটে ওদের পেছন পেছন। কালো কালো মূর্তিগুলোকে গ্রাস করে নেয় সংকীর্ণ রাস্তাটা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে যায় স্কোয়ার, শুধু অল্প কিছু লোক ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে গির্জার সিঁড়ির ওপর, অপেক্ষা করে শোভাযাত্রার; আর থাকে শুধু মেঘের উষ্ণ ছায়াগুলো, ঘরবাড়ির দেয়াল আর লোকের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে সে ছায়া সরে যায় যেন আদর জানিয়ে।

নিঃশ্বাস ফেলে সমুদ্র। অনেক দূরে দ্বীপের যোজক-ভূমির ওপর অন্ধকারে দেখা যায় একটা ইতালীয় পাইন গাছ, মনে হয় যেন সরু পায়ার ওপর মস্ত একটা ফুলদানি। চোখ ধাঁধিয়ে জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ, মণ্টে-সোলিয়ারোর মাথার ওপর থেকে সরে গেছে মেঘটা। খাদের খাড়াইয়ের ধার ঘেঁষে অনাথের মতো ছোটো মঠখানা আর মঠের সামনে প্রহরীর মতো একক গাছটা পরিষ্কার দেখা যায় এখন।

রাস্তার খিলানটা যেন এক রামশিঙা, সেখান থেকে উজ্জ্বল কলস্রোতে আনন্দে ভেসে আসে মেষপালকদের গান। খোলা মাথা, বাঁকা নাক, আর আলখাল্লায় ওদের দেখায় অতিকায় সব পাখির মতো — ওরা আসে বাজাতে বাজাতে, আর ওদের ঘিরে লম্বা লম্বা ডাণ্ডার ডগায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে ঝাঁক বেঁধে বাচ্চারা। বাতাসে দোলে লণ্ঠনের শিখাগুলো, বুড়ো পাওলিনোর বেঁটে গোলগাল শরীর আর রুপোলী মাথাখানার ওপর আলো এসে পড়ে, আলো ওঠে পড়ে তার হাতে ধরা ফুলে ভরা ডাবাটা, আর ডাবার মধ্যে হাস্যময় শিশু খ্রীস্টের গোলাপী দেহ, আশীর্বাদ দেবার জন্য ছোট্টো ছোট্টো হাতদুটি উঁচুতে তুলেছে সে।

পোড়া মাটির এই পুতুলটার দিকে বুড়ো মানুষটা এমন ভক্তিভরে তাকিয়ে থাকে যেন সত্যিই এ শিশু তার কাছে জীবন্ত, যেন নিঃশ্বাস

পড়ছে ওর, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ও 'শান্তি এনে দেবে পৃথিবীতে, মানুষকে দেবে বরাভয়'।

ডাবাটার দিকে চারিদিক থেকে ঝুঁকে আসে যত টুপি খোলা, চুলপাকা মাথা, গম্ভীর কঠোর মুখ, স্নেহকোমল চোখ। জ্বলে ওঠে ফুলঝুরি, স্কোয়ার থেকে অন্ধকার পালায় যেন হঠাৎ ভোর হয়ে গেছে। গান গায় ছেলেপিলেরা, চেঁচায়, হাসে, বড়োদের মুখেও কোমল হাসি, মনে হয় ওরাও লাফালাফি হৈচৈ করতে চায়, তবে ভয় পাচ্ছে ছেলেদের কাছে গুরুগাম্ভীর্য খাটো হবে।

ভিড়ের মাথার ওপর সোনালী দেয়ালী পোকার মতো তির তির করে মোমবাতির হলুদ শিখা। আর তারও ওপরে আকাশের নীল-কৃষ্ণে নানা রঙে জ্বলে তারা। অন্য একটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে আসে আর একটা শোভাযাত্রা, মাডোনার মূর্তি বয়ে আনছে ছোটো ছোটো মেয়েরা। সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি বাজনা, আরো আলো, আনন্দের হল্লা, শিশুদের হাস্যরোল। প্রাণ ভরে যায় উৎসবের শুভজন্মে।

শিশু খ্রীস্টকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পুরনো গির্জায়। তার জীর্ণ দশার জন্য বহুকাল উপাসনা বন্ধ হয়ে গেছে এখানে, সারা বছর গির্জাটা খাঁখাঁ করে। আজ কিন্তু এর প্রাচীন দেয়াল সাজিয়ে তোলা হয়েছে ফুল আর পাম পাতা, সোনালী লেবু আর কমলা লেবু দিয়ে, আর ভেতরের সবখানি জুড়ে টাঙানো হয়েছে নিপুণ একখানা পট — খ্রীস্টের জন্ম।

বড়ো বড়ো শোলার টুকরো দিয়ে বানানো হয়েছে পাহাড়-পর্বত, গুহা, বেথেল্‌হেম্‌, আর পাহাড়ের চুড়োয় অদ্ভুত-দর্শন সব কেল্লা। সাপের মতো এঁকেবেঁকে নেমেছে একটা রাস্তা; ছাগল ভেড়া চরছে মাঠে। কাচের টুকরো দিয়ে বানানো জলপ্রপাত ঝলমল করছে, একদল মেষপালক তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, সেখানে জ্বলছে একটি সোনালী তারা; আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে দেবদূতেরা, এক হাত দিয়ে

তারা দেখাচ্ছে বেথেলহেমের তারা, অন্য হাতে গুহাটার দিকে — সেখানে আশ্রয় নিয়েছে ঈশ্বরী মাতা, জোসেফ, আকাশের দিকে হাত উঁচু করে শুয়ে আছে শিশু। জ্ঞানীপুরুষ আর রাজন্যবর্গের চিত্রবিচিত্র মিছিল চলেছে গুহাটার দিকে, তাদের ওপরে রুপোলী সুতোয় দুলছে দেবদূতেরা, হাতে পাম পাতা আর গোলাপ। চলেছে উটের পিঠে পূর্বী পুরোহিতের দল — লম্বা দাড়ি, পরনে ঝকমকে রেশমী পোশাক, ঘোড়ার পিঠে পাংশুকেশ রাজন্যবর্গ, দামী কিংখাপের সাজ, কোঁকড়া চুল নুমিদিয়ান, আর আরব, আর ইহুদী, আর হরেক রকমের সব রঙচঙে, উদ্ভট পরিচ্ছদে মাটির পুতুল।

ডাবার চারপাশে শাদা আলখাল্লা-পরা আরব সদাগররা কিন্তু ইতিমধ্যেই দোকান খুলে বসে গেছে। হাতিয়ারপত্র, রেশমী কাপড় আর মোমের তৈরি মিষ্টি খাবার বিক্রি করছে তারা; এখানেই কোন এক অজানা জাতের লোকে বিক্রি করছে মদ, কাঁধের ওপর কলস নিয়ে মেয়েরা জল আনতে চলেছে উৎসের দিকে, জ্বালানি-কাঠ বোঝাই এক গাধাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে চাষি, আর একদল লোক হাঁটু গেড়ে বসেছে শিশুর চারপাশে; আর চারিদিকে খেলা করছে ছেলেপিলেরা।

গোটা এই দৃশ্যটা এমন নিপুণ করে গড়ে তোলা, রঙ করা, পোশাক পরানো হয়েছে যে মনে হয় সবটাই জীবন্ত, কোলাহল করছে।

এই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চারা দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ওদের ছোট্টো ছোট্টো সতর্ক তীক্ষ্ম চোখে ঠিক ধরা পড়ে যায় গত বছর থেকে এ বছর নতুন কতটুকু কী যোগ হয়েছে। যা যা আবিষ্কার করে, তৎক্ষণাৎ তা জানিয়ে দেয় পরস্পরকে, তর্ক বাধায়, হাসে, আর চেঁচায়। ওদিকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে এ দৃশ্যের রচয়িতারা, খুশি হয়েই তারা শোনে কচি সমঝদারদের প্রশংসা।

সন্দেহ নেই, তারা বয়স্ক লোক, পরিবারের ভার-ভারিক্কি কর্তা,

খেলনাপাতি নিয়ে মেতে ওঠার কথা নয় তাদের। ভাব দেখায় যেন এ সবকিছুতে তাদের এসে যায় না কিছুই। কিন্তু বড়োদের চেয়ে ছেলেরা প্রায়ই বেশি বোঝে, অনেক বেশি তারা অকপট। তারা জানে, বুড়ো হলেও প্রশংসা শুনতে চায় মানুষ, তাই ঢালাও তারিফ করে চলে তারা, আর তৃপ্তি ও খুশির হাসিটুকু চাপা দেবার জন্য দাড়ি মোচে হাত বুলোতে থাকে শিল্পীরা।

তারপর এখানে-ওখানে গোল হয়ে উৎসুক জটলা শুরু হয়ে যায় ছেলেদের মধ্যে; দল বাঁধছে তারা, নববর্ষের পূর্বসায়াহ্নে ওরা সারা দ্বীপটা ঘুরবে ফার গাছ আর তারা নিয়ে, এখানকার স্থানীয় কবিরা এই উপলক্ষে প্রতি বছর যে এক পৌত্তলিক ছড়া বাঁধে, সেই আনন্দের ছড়া ওরা গাইবে এক আদ্যিকালের বাদ্যযন্ত্র থেকে কানে তালা ধরানো ঝনঝন ঝঙ্কারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে:

সুখের বছর আইল
শোনোগো পুরবাসী,
সুখের কথা কইতে
ছেলেরা মোরা আসি!

মনের কপাট খোলো,
খোলো টাকার থলি
আজকে প্রভুর পরব,
আনন্দে আজ চলি!

মুক্তিদাতা গরিব —
কী দিয়ে ঢাকি ছেলে?
শীত তাড়াল বৃষ
গরম শ্বাস ফেলে।

মরণ মেনে মোদের
দুঃখ করেন ত্রাণ,
দুখীর তরে প্রভু
করেন জীবন দান।

জয় জয় দাও প্রভুর
নামগানে তাঁর মাতি,
আনন্দে দাও ভরে
তাঁর এই জন্মতিথি!..

আর, এক দল যখন এই পৌত্তলিক ছড়ার তালে তালে নাচে আর গায়, অন্য দল তখন তার শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে সোল্লাসে গেয়ে ওঠে:

ভুলো না সেই কথা
রাজা, রাখাল, ডান্
প্রভুর ডাবাখানা
প্রণাম করে যান!

গম্ গম্ করে বেজে ওঠে ঢাক, আর ছেলেদের গানের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে নলখাগড়ার কোন একটা সরু বাঁশি হাস্যকরভাবে শিস দিয়ে ওঠে আহত সুরে...

দুষ্ট রাজা হেরড
শিশুরে ভয় পায়,
রাজ্যের সব শিশুর
প্রাণ হরিলেন হায়!

কবেকার সে কথা
আমরা আজ বেঁচে, আর হেরড গেছে মারা;
প্রাণ যায় না কারো
হাঁস মুরগী ছাড়া!

গানের দুরন্ত ছন্দে আর চুপ করে থাকতে পারে না বড়োরাও; মোটা গাড়োয়ান কার্লো বাম্বোলা হেলেদুলে এগিয়ে যায় ছেলেদের দিকে, তারপর ছেলেদের গলা ডুবিয়ে গেয়ে ওঠে চিৎকার করে; আর লাল টক্‌টকে হয়ে ওঠে ওর মুখখানা:

দুঃখ ভোলো সবে,
ভাবনা আর নাই —
মারী মড়ক কিছু
আর হবে না ভাই!

দেখো আকাশখানা
সূর্যের রোদে ভরা,
হোক আমাদের জীবন
তেমনি উজল করা!..

ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেয়েদের গাঢ় চোখগুলো ঝিক ঝিক করে স্বপ্নাতুরের মতো; বেড়ে ওঠে ফুর্তি, জ্বল জ্বল করে মুখ চোখ; বাহারে পোশাক-পরা তরুণীরা তরুণদের দিকে চেয়ে ধূর্তের মতো হাসে। আকাশে মিলিয়ে আসে তারা। আর ওপরের কোন একটা জায়গা — ছাতে কি কোন একটা জানলা থেকে ভেসে আসে এক সপ্তমে ধরা অদৃশ্য সুরের ঝঙ্কার:

চাই আনন্দ, স্বাস্থ্য,
তা হলেই সব ভালো!

পৃথিবীর সেরা গান হল শিশুর হাসি, সেই হাসিতে ক্রমেই উচ্ছল হয়ে ওঠে প্রাচীন গির্জাটা। ফিকে হয়ে আসে দ্বীপের ওপরকার আকাশ, ভোর হয়-হয়। আকাশের নীল অতলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকে তারা।

দ্বীপটার শ্যামলকৃষ্ণ বাগিচার মধ্যে ঝলক দিয়ে ওঠে সোনালী কমলা, অতিকায় এক পেচকের চোখের মতো অন্ধকার থেকে উঁকি দিতে থাকে হলুদ লেবুগুলো। কমলা গাছের শিখরে শিখরে হলুদে-সবুজ কচি কচি কোরকগুলো আলো হয়ে ওঠে। রুপোর মতো মিট মিট করে জলপাই গাছের পাতা, আর আঙুরগাছে নম্র লতাগুলো কাঁপে।

উজ্জ্বল গোলাপী কর্ণেশন ফুল আর সেজের লাল লাল শাখাগুচ্ছ হেসে ওঠে ঊষার দিকে চেয়ে। প্রত্যুষের তাজা হাওয়ায় সমুদ্রের লোনা ঝাপটার সঙ্গে মিশে ভেসে যায় নার্সিসাসে ফুলের মদির সৌরভ।

ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ বেড়ে ওঠে ক্রমশ; এ ঢেউ এখন স্বচ্ছ, ফেনা তাদের ধব ধব করে নীহারের মতো।

নুনছো

সত্যি করেই সন্ত জিয়াকমো মহল্লার গর্বের জিনিস তার ফোয়ারাটা। এরই পাশে খোস গল্প জমাতে ভালোবাসতেন অমর জিয়োভান্নি বোক্কাচিয়ো। বৃহদাকার ক্যানভাসে সে ফোয়ারার ছবিটা আঁকাও হয়েছে একাধিকবার, এঁকেছেন মহা সাল্‌ভাতোর রোজা, যাঁর বন্ধু হলেন তোমাজো আনিয়েল্লো — গরিব লোকেরা যাঁকে ডাকত মাজানিয়েল্লো বলে, গরিবদের স্বাধীনতার জন্য তিনি লড়েছেন ও প্রাণপাত করেছেন। মাজানিয়েল্লো নিজেও জন্মেছিলেন আমাদেরই এই মহল্লায়।

বলতে কি, অনেক বিখ্যাত লোকেই এই মহল্লায় জন্মেছেন, বাস করেছেন। এখানকার চেয়ে আগের কালে বিখ্যাত লোকেদের জন্ম হত বেশি, আর তাদের চেনাও যেত সহজে। আজকাল যখন লোকে জ্যাকেট পরে রাজনীতি করছে, তখন আরো দশটা লোকের চেয়ে মাথায় উঁচু হয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে বৈকি, তাছাড়া খবরের কাগজে জড়ানো থাকলে মনটাও বাড়ে কষ্টেসৃষ্টে।

গত গ্রীষ্মকালের আগে পর্যন্ত নুনুচাও ছিল আমাদের মহল্লার একটা গৌরব। নুনুচা শব্জীউলী, দুনিয়ার সবচেয়ে ফুর্তিবাজ মানুষ আর আমাদের এলাকার সেরা রূপসী — শহরের অন্যান্য এলাকার চেয়ে আমাদের এলাকাতেই সূর্যের রোদ থাকে একটু বেশিক্ষণ। ফোয়ারাটা অবশ্য যা ছিল তাই-ই আছে; যত দিন যাচ্ছে তত একটু করে হলদে হয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওটা এখনো তার সৌন্দর্যে বিদেশীদের তাক লাগিয়ে যাবে — মর্মর শিশুগুলি তো আর না হবে পুরনো, না থামাবে তাদের খেলা।

কিন্তু মিষ্টি মেয়ে নুনুচা মারা গেছে গত গ্রীষ্মে। মারা গেছে রাস্তার মধ্যে নাচতে নাচতে, আর অমন করে মরা বড়ো একটা তো দেখা যায় না, তাই তার কাহিনীটা শোনানোর মতো বৈকি।

এত হাসিখুশি, দরদী মন ছিল নুনুচার যে স্বামী নিয়ে শান্তিতে ঘর করা তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। এ কথাটা ওর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে বুঝে উঠতে পারে নি — গালাগালি দিয়ে হল্লা করে, ভগবানের নাম করে হাত পা নেড়ে, ছুরি উঁচিয়ে সে লোককে হুমকি দিয়ে বেড়াত; একদিন সে ছুরি কাজেও লাগালে, বসিয়ে দিলে একটা লোকের গায়ে। কিন্তু এসব তামাসা পুলিশের ঠিক পছন্দ হয় না। কিছু দিন জেল খেটে স্তেফানো চলে গেল আর্জেন্টিনায় — মাথাগরম লোকের পক্ষে হাওয়া বদল করা ভালোই।

তাই তেইশ বছর বয়স থেকে নুনুচা বিধবা, কোলে পাঁচ বছরের মেয়ে, রইল এক জোড়া গাধা, শব্জীবাগান একটা আর ছোটো একটা গাড়ি; ফুর্তিবাজ লোকের বেশি কিছু তো আর লাগে না, এই তার পক্ষে যথেষ্ট। কাজ করতে সে পারত ভালোই, তাছাড়া ওকে সাহায্য করার মতো উৎসুক লোকের অভাব ছিল না। মেহনতের মজুরি দেবার মতো পয়সা না থাকলে দাম শোধ করত হাসি দিয়ে, কি গান দিয়ে, অথবা অন্যান্য এমন কিছু দিয়ে যার দাম টাকার চেয়ে বেশি।

সব মেয়েই যে তার ধরনধারন পছন্দ করত তা অবশ্য না, সব পুরুষেও তা করত না, কিন্তু মনটা তার সত্যি করে সাঁচ্চা ছিল বলে সে বিবাহিত লোকদের শুধু ঘাঁটাত না তাই নয়, বৌয়ের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিতেও সাহায্য করত প্রায়ই। বলত:

'নারীর জন্যে যে মরদের ভালোবাসা ফুরিয়ে যায় সে আসলে কখনো ভালোইবাসে নি...'

আরতুরো লানো, সেই জেলেটা, অল্প বয়সে যে চতুষ্পাঠীতে পড়ত, পুরুত হবার জন্য শিক্ষা নিয়েছিল, কিন্তু তারপর ধর্ম আর স্বর্গের পথ থেকে বিপথে গিয়ে পড়েছে সমুদ্র আর সরাইখানা আর এমনি যত সব ফুর্তির জায়গায়, সেই লানো একদিন তাকে বললে:

'মনে হয়, তুমি ভাবছ প্রেম জিনিসটা প্রায় ধর্মতত্ত্বের মতো একটা জটিল শাস্ত্র!'

অশ্লীল গানের কলি বানাতে লানো ছিল ভারি ওস্তাদ।

নুনচা জবাব দিয়ে বলেছিল:

'শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু আমার জানা নেই, কিন্তু তোমার গানগুলো আমি সবই জানি।'

এই বলে পিপের মতো মুটকো আরতুরোকে সে গান গেয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল:

এই ঘটে গো, এমনি রীতি,
তাই পাওয়া যায় শুনতে,
মেরী মাতাও পোয়াতি হন
নবীন বসন্তে।

আরতুরো অবিশ্যি হেসে উঠেছিল হো হো করে, ওর ধূর্ত কুতকুতে চোখদুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল তার লালচে গালের আড়ালে।

এমনি ভাবেই দিন কাটাত নুন্‌চা, নিজে আনন্দ করে অনেককে আনন্দ দিয়ে, ভালো লাগত তাকে; তার মেয়ে বন্ধুরা পর্যন্ত মিটমাট করে নিয়েছিল নুন্‌চার সঙ্গে, বুঝতে পেরেছিল মানুষের স্বভাব গেড়ে থাকে তার হাড়ে মজ্জায়, ভেবে দেখলে, এমন কি সাধুসন্তরাও সব সময় আত্মদমন করতে পারে নি। তাছাড়া, পুরুষ তো আর ঈশ্বর নয়, শুধু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করলেই হল...

বছর দশেক ধরে নুন্‌চা জ্বলজ্বল করলে একটা তারার মতো, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছিল মহল্লার সবচেয়ে সুন্দরী, সেরা নাচিয়ে বলে। কুমারী হলে সে যে বাজারের রানী হিসেবে নির্বাচিত হত তাতে কোন সন্দেহই নেই, আর বলতে কি প্রত্যেকটি লোকের চোখেই সে সত্যিই ছিল রানী।

বিদেশীদের কাছেও দেখানো হত তাকে; ওর সঙ্গে নিরালায় দুটো কথা বলার বড়ো ইচ্ছে ছিল তাদের অনেকেরই। কিন্তু এতে হেসে গড়িয়ে পড়ত নুন্‌চা।

'ধোপদুরস্ত বাবুটা আমার সঙ্গে কথা কইবে কোন ভাষায়?'

'ওরে মুখ্যু মেয়ে, মোহরের ভাষায়' — ওকে আশ্বাস দিত গণ্যমান্য লোকেরা। কিন্তু জবাব দিত নুন্‌চা:

'বিদেশীদের কাছে পেঁয়াজ, রশুন, বিলাতি বেগুন ছাড়া আর কিছুই আমার বেচবার নেই...'

সত্যি করেই যারা ওর ভালো চাইত, তারা মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করত:

'শুধু মাসখানেকের জন্যে নুন্‌চা, তাহলেই বড়োলোক হয়ে যাবে তুমি! ভালো করে ভেবে দ্যাখো, মনে রেখো, একটা মেয়ে আছে তোমার...'

আপত্তি করে ও বলত, 'না। আমার দেহখানাকে আমি ভালোবাসি, তার অপমান করতে আমি পারি না! অনিচ্ছায় একবার যদি কিছু

একটা করে বসি, তাহলেই চিরকালের মতো আমার আত্মসম্মান যাবে, তা জানি...'

'কিন্তু অন্যদের বেলায় তো তুমি না করো না?'

'না করি না শুধু আমাদের আপনার লোকেদের কাছে, তাও যখন ইচ্ছে হয় শুধু তখন...'

'আপনার লোক মানে?'

সেটা সে জানত:

'যেসব লোকেদের মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছি, যারা আমার প্রাণটা বোঝে।'

তা সত্ত্বেও কিন্তু ও একবার নটঘট বাধিয়েছিল এক বিদেশীর সঙ্গে, লোকটা ছিল ইংরেজ, অদ্ভুত তার ধরনধারন; আমাদের ভাষা ভালোই জানত বটে, কিন্তু থাকত কেমন চুপচাপ। বয়স তার বেশি ছিল না, কিন্তু চুল পেকে গিয়েছিল, মুখের আড়াআড়ি একটা কাটা দাগ, দস্যুর মতো দেখতে, আর সন্ন্যাসীর মতো চোখদুটো। কেউ কেউ বলত, লোকটা নাকি বই লেখে, কেউ বলত না জুয়াড়ী। নুন্‌চা ওর সঙ্গে চলেও গিয়েছিল কোথায় যেন সিসিলিতে, ফিরল খুব জীর্ণশীর্ণ হয়ে। লোকটা বড়োলোক ছিল না নিশ্চয়ই, কেননা নুন্‌চা না আনলে টাকা, না কোন রকম উপহার। এর পর আবার সে আপনার লোকেদের মধ্যেই থাকতে লাগল, আগের মতোই তেমনি হাসিখুশি, সবকিছু আনন্দে রাজি।

কিন্তু একদিন, এক ছুটির দিনে, লোকেরা যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন কে একজন অবাক হয়ে মন্তব্য করলে:

'দ্যাখো, দ্যাখো, ঠিক ওর মায়ের মতোই দেখতে হয়েছে নিনা!'

কথাটা সত্যি — ঠিক দিনের আলোর মতোই। সকলের অলক্ষ্যে নুন্‌চার মেয়েটি তারা হয়ে ফুটে উঠেছে, ঠিক তার মায়ের মতোই জ্বলজ্বলে। বয়স মেয়েটির সবে চোদ্দ, কিন্তু ভারি লম্বা হয়ে

উঠেছিল, মাথায় অঢেল চুল, চোখে গর্বের চাউনি, বয়স আন্দাজে অনেক বড়ো দেখাত ওকে, মনে হত নারীত্বের জন্য তৈরি।

নুন্‌চা নিজেও অবাক হয়ে যেত ওকে দেখে।

'হায় মাডোনা! তুই কি আমার চেয়ে সুন্দরী হতে চাস নাকি রে নিনা?'

ও হেসে জবাব দিত:

'তোমার চেয়ে নয়, তোমার মতো সুন্দরী হতে পারলেই আমার যথেষ্ট...'

হাসিখুশি মেয়েটির মুখে লোকেরা এই প্রথম দেখলে একটা বিষাদের ছায়া। সন্ধেবেলায় নুন্‌চা তার সখিদের বললে:

'এই হল জীবন, গেলাসের অর্ধেকটা খেলে কি না খেলে অমনি হাত বাড়াবে অন্যে...'

প্রথম দিকে অবশ্য মা মেয়ের মধ্যে রেষারেষির কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। মেয়ের চালচলন ছিল বেশ নম্র, সতর্ক, বড়ো বড়ো চোখের পাতার তল থেকে সে তাকাত পৃথিবীটার দিকে, পুরুষের সামনে মুখ প্রায় খুলতই না। আর মায়ের চোখ আরো যেন জ্বল জ্বল করত কামনায়, গলার স্বরে বেজে উঠত আরো বেশি চ্যালেঞ্জ।

সূর্যের প্রথম আলো পড়ে ভোর বেলাকার নৌকোর পাল যেমন রেঙে ওঠে, ওর কাছে তেমনি দপ করে উঠত পুরুষেরা, আর বলতে কি, অনেকের কাছেই প্রেমের দিন শুরুর প্রথম কিরণ ছিল নুন্‌চা। সে যখন তার ছোটো গাড়িখানার পাশে মাস্তুলের মতো ঋজু ঢঙে হেঁটে যেত রাস্তা দিয়ে, ঘরবাড়িগুলোর ছাতের ওপর দিয়ে ভেসে যেত ওর কথা, তখন অনেকেই নীরব কৃতজ্ঞতায় চেয়ে চেয়ে দেখত ওর দিকে। বাজারের মধ্যেও ওকে দেখাত চমৎকার, জ্বলজ্বলে নানা রঙের শব্জীর গাদার পাশে ও দাঁড়িয়ে থাকত যেন গির্জার শাদা দেয়ালের পটে ওস্তাদের হাতে আঁকা একখান ছবি, সন্ত জিয়াকমো

গির্জার পাশে ওই ছিল ওর নির্দিষ্ট জায়গা, সিঁড়ির বাঁ দিকে, আর মরলও ওরই তিন পা দূরে। সুন্দর দেখাতো ওকে, যখন দাঁড়িয়ে থাকত সেখানে সে যেন জ্বলত, ফুর্তির ফুলকি ছিটিয়ে লোকেদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেত তুখোড় তার হাসি, মস্করা, গান — এসব জানতও সে হাজার রকমের।

ভালো কাঁচের পাত্রে যেমন ফুটে ওঠে দামী মদের রূপ তেমনি কি সাজে সাজলে ওর রূপ ফুটে উঠবে তা সে জানত বেশ। কাঁচ হবে যত স্বচ্ছ, ততই ভালো ফুটে ওঠে সুরার প্রাণ, কেননা তার স্বাদ গন্ধ বেড়ে ওঠে রঙের ছোঁয়ায় — আমাদের প্রাণের মধ্যে সূর্যের একটু শোণিত লাভের জন্য যা আমরা পান করি, বিনি শব্দের সেই রঙীন গানখানা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে যাতে। মদ, হে ভগবান, মদ! হৈ-হল্লা, শশব্যস্ততায় ভরা এই দুনিয়াটার দাম একটা গাধার ক্ষুরেরও সমান হত না, যদি বেশ এক গেলাস লাল মদ দিয়ে অভাগা মনটাকে ধুয়ে তোলার শুভ সুযোগ মানুষের না থাকত, পবিত্র কারণ বারির মতো সে মদ আমাদের পাপের সমস্ত কলুষ ধুয়ে মুছে তোলে, শেখায় এমনিতেই যত কিছু জঞ্জালে ভরা এই দুনিয়াটাকে ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে... গেলাসের মধ্যে দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখুন সূর্যের দিকে, কত কাহিনীই না সুরা শোনাবে আপনাকে...

তা এমনি করেই তো নুন্চা দাঁড়িয়ে থাকত রোদ্দুরে, আশেপাশের পুরুষদের মধ্যে জাগিয়ে তুলত নানা সুখকল্পনা, ওর সুনজরে পড়ার বাসনা — সুন্দরী নারীর চোখে না পড়াটা লজ্জার কথা, সবাই চাইত কোন রকমে নিজেকে জাহির করতে। নুন্চা মঙ্গল করেছিল অনেক, অনেক ঘুমন্ত শক্তিকেই সে জাগিয়ে তুলেছিল জীবনে। যা ভালো তা থেকে সব সময় আকাংক্ষা জাগে আরো ভালোর।

তারপরে তো, প্রায়ই মেয়েকে দেখা যেত তার মায়ের পাশে, সন্ন্যাসিনীর মতো বিনয়-নম্র, কিংবা বলা যায়, খাপে ঢাকা একখান ছোরা। পুরুষেরা দেখত তাকিয়ে তাকিয়ে, মা-মেয়ের তুলনা করত। আর হয়ত তাদের কেউ কেউ টেরও পেয়েছিল, মেয়েমানুষের মাঝে মাঝে কী মনে হয়, কী বিছছিরি লাগে তার বেঁচে থাকতে।

এদিকে কাল তো বয়ে যায়, ক্রমেই বেড়ে ওঠে তার হন্তদন্ত ছোটো ছোটো পদক্ষেপ, আর কালের তুলনায় মানুষেরা যেন সূর্যের লাল রোদ্দুরে উড়ন্ত সোনালী ধূলিকণার ঝলক। নুন্‌চার ঘন ভুরু আজ কাল প্রায়ই কুঁচকে থাকে, মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে সে তাকায় তার মেয়ের দিকে, যেন এক জুয়াড়ী আর এক জুয়াড়ীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে কী তাস আছে তার হাতে...

এক বছর পেরিয়ে গেল, তারপর আরো এক বছর, মেয়ে যত মায়ের কাছে তত যেন দূরে। জোয়ান ছেলেগুলো বুঝে পেত না, কার দিকে তারা কোমল করে চাইবে, এর দিকে না ওর দিকে — সবার কাছেই তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর নুন্‌চার মেয়েবন্ধুরা — বন্ধু-বান্ধবী খুব ভালোবাসে যেখানে জ্বলুনি সেখানে খোঁচাতে — বলত:

'নুন্‌চা, তোমার মেয়ে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে নাকি রে?'

কিন্তু হেসে উত্তর দিত নুন্‌চা, 'চাঁদ উঠলেও বড়ো বড়ো তারাদের দেখা যায় আকাশে...'

মা হিশেবে মেয়ের রূপ নিয়ে গর্ব ছিল তার, কিন্তু নারী হিশেবে নিনার তারুণ্যকে সে হিংসা না করে পারে নি, — সূর্যের আলো আড়াল করে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়ে, ছায়ার মধ্যে থাকতে ক্ষোভ হচ্ছিল মায়ের।

লানো একটা নতুন গান বাঁধলে, তার প্রথম কলিটা এই রকম:

আমি রূপসীর মা,
হতাম যদি মরদ
তবে রূপসীর কোল জুড়ি
আর এক রূপসী ছুঁড়ি
না দিয়ে ছাড়তাম না।

এ গান নুনচা গাইতে চাইত না। লোকে বলত, নিনা নাকি তার মাকে অনেকবার বলেছে:

'তুমি একটু বুদ্ধি করে চললে আমরা অনেক ভালো থাকতে পারতাম।'

তারপর এল সেই দিন, মেয়ে তার মাকে বললে:

'তুমি আমাকে লোকজনের কাছ থেকে ভারি আড়াল করে রাখছ, মা। আমি তো আর এখন ছোটো খুকিটি নই, জীবনের কাছ থেকে আমিও আমার পাওনা নিতে চাই! তুমি এত কাল ফুর্তি করে কাটিয়েছ, এবার আমার পালা কি আসে নি?'

'কেন, কী ব্যাপার?' মা জিগ্যেস করলে চোখ নামিয়ে অপরাধীর মতো, কেননা কী ব্যাপার সে তো তার জানা।

সেই সময় অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছিল এন্‌রিকো বোর্‌বনে। আশ্চর্য সেই যে দেশটায় কেউ ইচ্ছে করলেই ভুরি ভুরি টাকা রোজগার করতে পারে সহজে, সেখানে সে গাছ কাটার কাজ করত। স্বদেশের রোদে শরীরটা একটু গরম করে নেবার জন্য এসেছিল, সেই দেশে ফিরে যাবার তোড়জোড় করছিল, জীবন যেখানে স্বদেশের চেয়ে অনেক বেশি মুক্ত। বয়স তার ছত্রিশ, হাসিখুশি ফুর্তিবাজ স্বভাব, দাড়ি রেখেছে, বলিষ্ঠ দেহ। ঘন বনের মধ্যে তার জীবন আর অভিজ্ঞতার নানা কাহিনী সে শোনাত চমৎকার। সকলেই ভাবত ও

বানিয়ে বলছে, কিন্তু মা আর মেয়ে সত্যি বলে বিশ্বাস করত তার কথা।

নিনা বললে, 'আমি জানি এন্‌রিকোর পছন্দ হয়েছে আমায়। কিন্তু তুমি ওর সঙ্গে ঢলাঢলি করে ওকে চপল করে তুলে আমার পথ আটকাচ্ছ।'

নুন্‌চা বললে, 'বুঝলাম। বেশ, মাডোনার কাছে তোর মার নামে নালিশ করার দরকার হবে না তোর...'

নুন্‌চা সত্যি করেই এন্‌রিকোকে ছেড়ে দিলে, সকলেই জানত নুন্‌চার কাছে ঐ লোকটাই ছিল অন্য অনেকের চেয়ে বেশি প্রিয়।

কিন্তু এ তো জানা কথা যে সহজে জিতলে বিজেতা হয়ে ওঠে উদ্ধত, বিশেষ করে বিজেতার বয়স যদি হয় কাঁচা, তাহলে ব্যাপার দাঁড়ায় খারাপ!

নিনা তার মায়ের সঙ্গে এমন সুরে কথা কইতে শুরু করলে যেটা নুন্‌চার ঠিক প্রাপ্য নয়। তারপর একদিন সন্ত জিয়াকমোর দিবসে — ওটা হল আমাদের মহল্লার পরবের দিন, সকলেই আনন্দ করছে, টারান্‌টেলা নাচ নাচলে নুন্‌চা অপূর্ব। মেয়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে:

'তুমি বড়ো বেশি নাচছ, মা। এই বয়সে এতে তোমার হার্টের পক্ষে খারাপ হবে...'

কোমল গলায় শোনানো এই বেয়াদবী কথাগুলো যারা শুনলে, তারা এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। আর সুঠাম কোমরের ওপর হাত রেখে রাগে চিৎকার করে উঠল নুন্‌চা:

'আমার হার্ট? আমার হার্ট নিয়ে তোর ভাবনা? বেশ মেয়ে, অনেক ধন্যবাদ তোকে! কিন্তু দেখা যাক, কার হার্ট শক্ত!'

তারপর এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে:

'এখান থেকে ফোয়ারাটা পর্যন্ত তিনবার না থেমে আমরা দৌড়ে যাব আসব...'

অনেকের মনে হল ব্যাপারটা নেহাৎ হাস্যকর, অনেকে এটাকে গর্হিত কেলেংকারি বলেও ভাবছিল, কিন্তু বেশির ভাগ লোকেই নুন্‌চার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার প্রস্তাব সমর্থন করলে হাসিঠাট্টার গুরুত্ব দিয়ে। জেদ ধরলে, মায়ের চ্যালেঞ্জ নিনা গ্রহণ করুক।

ঠিক করে নেওয়া হল বিচারক, দৌড়ের সীমান্ত গতিবেগ বেঁধে দেওয়া হল — ঘোড়দৌড়ের মতো দৌড়ের যা কিছু নিয়ম-কানুন মানা হল সবই। নারী-পুরুষদের অনেকেই সত্যি সত্যি চাইছিল মা জিতুক, তাকে তারা আশীর্বাদ করলে, নুন্‌চার জন্য তারা মানত করলে, মাডোনার কাছে প্রার্থনা করলে, নুন্‌চাকে যেন তিনি সাহায্য করেন, তাকে শক্তি জোগান।

তারপরে তো মা মেয়ে দাঁড়াল পাশাপাশি, কারো দিকে কেউ চাইছে না। ঝমঝমিয়ে উঠল খঞ্জনী, আর রাস্তা ধরে স্কোয়ারের দিকে ওরা ছুটে চলল শাদা রঙের প্রকাণ্ড দুটি পাখির মতো, মায়ের মাথায় লাল একটা রুমাল বাঁধা, মেয়ের মাথায় আসমানী।

দৌড়ের প্রথম থেকেই বেশ বোঝা গেল, মেয়ের চেয়ে মায়ের পা যেমন হালকা তেমনি শক্ত। নুন্‌চা দৌড়ল এমন অনায়াসে, এমন লীলাভরে যে মনে হল যেন স্বয়ং ধরিত্রী মায়ের মতো এগিয়ে দিচ্ছে তার মেয়েকে। জানলা আর ফুটপাথ থেকে লোকে রাস্তায় তার পায়ের কাছে ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিলে, চিৎকার করে হাততালি দিয়ে লাগল, তারিফ করতে লাগল তার। দ্বিতীয় চক্করটার সময় নুন্‌চা তার মেয়ের চেয়ে চার মিনিট বেশি এগিয়ে রইল, আর নিনা হার মেনে, অসাফল্যে ক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল গির্জার সিঁড়ির ওপর, দু'চোখ জলে ভরা, তৃতীয় বার দৌড়ের ক্ষমতা আর তার নেই।

আর বেড়ালের মতো চাঙ্গা নুন্‌চা অন্য সকলের সঙ্গে হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ল মেয়ের ওপর।

শক্ত হাতে মেয়ের আলুথালু চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে ও বললে, 'ওরে বাছা শোন, মজা করা, খাটাখাটুনি আর ভালোবাসার বেলায় সবচেয়ে শক্ত হার্ট হল শুধু জীবনের পোড় খাওয়া মেয়েমানুষের হার্ট — আর জীবন চেনা যায় তিরিশ পেরোবার অনেক পরে... তাই দুঃখ করিস না বাছা!..'

আর দৌড়ের পর এক মুহূর্ত না জিরিয়েই নুন্‌চা চাইলে টারান্‌টেলা নাচতে।

'কে নাচবে আমার সঙ্গে?'

এগিয়ে এল এন্‌রিকো, মাথার টুপি খুলে ধন্যা এই নারীর দিকে আভূমি কুর্ণিশ করে সসম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে রাখলে অনেকক্ষণ।

দুম করে, বোল তুলে, ঝমঝমিয়ে উঠল তাম্বুরিন, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল উদ্দাম নাচ, পুরনো গাঢ় কড়া মদের মতো সে নাচ মাতাল করে তোলে। ঘুরতে ঘুরতে পাক দিতে দিতে, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নাচ শুরু হয়ে গেল নুন্‌চার, কামনাবেগের এই নাচের তাল তার ভালোই জানা। তার অপরূপ অদম্য দেহখানার সাবলীল সে ভঙ্গিমা দেখেও আনন্দ।

অনেকক্ষণ ধরে নাচলে নুন্‌চা, নাচলে অনেকের সঙ্গে। ওর জুড়িরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কিন্তু তবু যেন আশা মিটছে না নুন্‌চার। ওদিকে দুপুর রাত তখন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নুন্‌চা:

'এসো, এন্‌রিকো, আর একবার, আর এই শেষ!' এন্‌রিকোর সঙ্গে ধীরে ধীরে নাচতে শুরু করল নুন্‌চা। বড়ো বড়ো হয়ে উঠল তার চোখ, সে চোখে সোহাগ আর অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি। কিন্তু হঠাৎ একটুখানি চিৎকার করে দু'হাত উঁচিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নুন্‌চা, যেন কে ওকে ফেলে দিলে হাঁটুর তলে ঘা মেরে।

ডাক্তার বলেছিল, ও মারা গেছে হার্ট ফেল করে।

হয়ত তাই...

কার্লোনে গালিয়ার্দি

ঘুম নেমেছে দ্বীপটায়। সমুদ্রও কঠোর নিস্তব্ধতায় নিদ্রিত, যেন মরে গেছে, মনে হয় আকাশ থেকে কে যেন বলিষ্ঠ হাতে এই কালো বিচিত্রমূর্তি শিলাটাকে সমুদ্রের বুকে আছড়ে মেরে তার ভেতর জীবন্ত সবকিছু খুন করেছে।

দূর থেকে, আকাশের সোনালী ছায়াপথ যেখানে সমুদ্রের কালো জলরাশিকে ছুঁয়েছে সেখান থেকে চাইলে দ্বীপটাকে দেখায় যেন এক ঢিপকপালে জানোয়ার: লোমশ পিঠটা বেঁকিয়ে প্রকাণ্ড মুখটা সমুদ্রে ডুবিয়ে নিঃশব্দে জল খাচ্ছে, সে জল ঘন হয়ে উঠেছে তেলের মতো।

ডিসেম্বরে এমনি ধারা মৃত্যু-স্তব্ধ কালো রাত দেখা যায় প্রায়ই। সে রাত এমন অদ্ভুত স্তব্ধ যে ফিসফিসিয়ে বা চাপা গলায় ছাড়া কথা কইবার প্রয়োজন করে না, অস্বস্তি হয় জোরে কথা কইলে রাতের আকাশের নীল মখমলের নিচে পাথুরে স্তব্ধতার মধ্যে গোপন যে একটা-কিছু ঘনিয়ে উঠছে সেটা ব্যাহত হবে।

উপকূলের এলোমেলো পাথরের মধ্যে বসে তেমনি চাপা গলায় কথা কইছে দুজন লোক। একজন শুল্ক-বিভাগের সেপাই — গায়ে

কালো সরকারি কোর্তা, তাতে হলদে পাইপিং, পিঠে ঝোলানো ছোটো রাইফেল — পাথরের ফাটলগুলোয় যে নুন জমে, তা যাতে জেলে আর চাষিরা এসে না নিয়ে যায় তাই দেখা ওর কাজ। অন্য জন হল এক বুড়ো জেলে, স্পেনীয়দের মতো দাড়ি গোঁপ কামানো, কালো মুখ, কান থেকে নাক পর্যন্ত রুপোলী জুলপি, আর মস্ত বাঁকা শুকচঞ্চু নাক।

নোনা জলে রঙচটা রুপোর মতো মনে হয় পাথরগুলোকে।

সিপাহীটি বয়সে তরুণ। এবং তরুণ বলেই সে বলে শুধু সেইটে যা তার তরুণ হৃদয়কে উদ্বেল করে। বুড়ো লোকটা আপত্তি জানায় অনিচ্ছায়, কড়া সুরেই:

'ডিসেম্বর কি পীরিত করার সময়? তখন ছেলেমেয়ে বিয়োয়...'

'কি বলছ! বয়সটা জোয়ান হলে লোকের সবুর সয় না...'

'কিন্তু সবুর করা উচিত...'

'তুমি করেছিলে?'

'আমি তো আর সিপাহী ছিলাম না ভায়া। আমি খেটে খেতাম, আর আমাদের কালে মানুষের ভাগ্যে যা-কিছু ঘটবার সবই আমাকে সইতে হয়েছে...'

'বুঝলাম না...'

'পরে বুঝবে...'

তটের অদূরে জলের ওপর লুব্ধক নক্ষত্রের নীল প্রতিবিম্ব। মিটমিটে এই ছোপটার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে তার পাশেই দেখা যাবে মানুষের মাথার মতো গোল আর একেবারে নিশ্চল একটা কর্কের ফাতনা।

'ঘুমাচ্ছ না কেন?'

বুড়ো লোকটা তার পুরনো, চটে যাওয়া, পার্টকিলে বর্ষাতিখানা মেলে কেশে জবাব দেয়:

'এখানে জাল ফেলা আছে আমাদের, ফাতনাটা দেখছ না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতক্ষণে দেখতে পেয়েছি।'

'তিন দিন আগে একটা জাল ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট হয়েছে এক দলের...'

'কিসে নষ্ট করল, শুশুকে?'

'শীতকালে শুশুক? নিশ্চয় না, হয়ত হাঙ্গর। কে জানে কিসে?'

কোন একটা জন্তুর পায়ে লেগে ছোটো একটা পাথর পাহাড়ের গা বেয়ে শুকনো ঘাসগুলোর মধ্য দিয়ে খড়খড়িয়ে নেমে সশব্দে গড়িয়ে পড়ল জলে। নীরব নিশীথ যেন সেই সংক্ষিপ্ত শব্দটুকুকে সাগ্রহে তুলে নিয়ে ভালোবেসে তাকে স্পষ্ট করে তুললে একেবারে বুকের গভীর থেকে, মনে হল যেন শব্দটা সে অনেকক্ষণ মনে রাখতে চায়।

মৃদু সুরে একটা রসের ছড়া গাইতে থাকে সিপাহী:

বলতে পারো আম্বার্তো ভায়া,
বুড়ো লোকের ঘুম কেন নেই আহা?
ঘুম নেই হায় যৌবনে যে তারা
মদ টেনেছে বেদম মাত্রা ছাড়া...

বুড়ো গজরায়, 'ও ছড়া আমার জন্যে নয়!'

জানো নাকি বার্জিতো ভায়া
আর কি কারণ, ঘুম নেই তার আহা?
ঘুম নেই হায়, বয়স ছিল যখন
প্রাণভরে প্রেম হয় নি করা তখন...

'তোফা গানখানা, তাই না, পাস্কালে খুড়ো?'

'ঘাট পেরোলে তুমি নিজেই টের পাবে, আমাকে জিগ্যেস করে কী লাভ?'

অনেকক্ষণ ধরে দুটিতে বসে থাকে চুপ করে, রাতে নির্বাক হয়ে যাওয়া এক জগতের সঙ্গে মিশে গিয়ে। বুড়ো লোকটা তার পাইপ খসিয়ে একটা পাথরের ওপর ঠোকে আর সেই ঠুকঠুক শব্দগুলোর দিকে কান পেতে বলে:

'জোয়ান ছোকরা তোমরা হাসতে পারো ভালোই, কিন্তু সেকালে লোকে যেমন করে পীরিত করতে পারত, তেমন করে পীরিত করা তোমরা জানো কিনা সন্দেহ আছে...'

'ফুঃ! সেই পুরনো গল্প... পীরিত সে তো সব কালেই এক আমার মনে হয়...'

'মনে হচ্ছে! কিন্তু জানতে হয়। ওই ওপরে পাহাড়ের পেছনে থাকে সেনৎসামানে পরিবার। দাদু কার্লোর গল্পটা বলতে বোলো ওদের। তোমার বউয়ের কাজ দেবে।'

'অচেনা লোকের কাছে গিয়ে শোনার চেয়ে ঘটনাটা তুমিই তো আমায় বলতে পারো...'

কোথায় একটা অদৃশ্য রাতচরা পাখি উড়ে যায়। পশমী কাপড় দিয়ে শুকনো পাথর ঘসার মতো একটা অদ্ভুত শব্দ ফড় ফড় করে ওঠে বাতাসে।

মাটিতে আরো ঘন হয়ে আসে অন্ধকার, আরো স্যাঁতসেঁতে, উষ্ণ, আকাশ উঠে যায় আরো ওপরে, আর ছায়াপথের রুপোলী কুহেলিতে তারাগুলো জ্বলতে থাকে আরো উজ্জ্বল হয়ে।

'আগের কালে মেয়েদের দাম ছিল অনেক বেশি...'

'তাই নাকি? জানতাম না তো।'

'পুরুষেরা প্রায়ই যেত যুদ্ধে...'

'হ্যাঁ, আর বিধবা হত এক গাদা মেয়ে...'

'প্রায়ই হানা দিত বোম্বেটে আর সেপাই। আর বছর পাঁচেক পর পরই নেপ্‌ল্‌স্‌-এ নতুন এক-একজন শাসনকর্তা দেখা দিত। মেয়েদের রাখতে হত তালাচাবি বন্ধ করে।'

'একালেও তাই করলে ভালো হত...'

'মুরগী চুরি করার মতো চুরি করা হত মেয়েদের...'

'চুরি করা হত বটে, যদিও দেখতে তাদের বরং খেঁকশিয়ালের মতো...'

বুড়ো লোকটা চুপ করে গিয়ে পাইপ ধরায়। নিশ্চল বাতাসে ভেসে থাকে এক মেঘ শাদা সুগন্ধি ধোঁয়া। পাইপে আগুন ধুঁইয়ে উঠলে চোখে পড়ে বুড়োর ময়লা রঙের বাঁকা নাকটা আর নাকের নিচে খাটো করে ছাঁটা মোচ।

ঘুম-ঘুম গলায় সিপাহী বলে, 'হ্যাঁ, তারপর?'

'শুনতে যদি চাও, তাহলে চুপ করে থাকতে হবে...'

এমন দপ দপ করে লুব্ধক নক্ষত্র যে মনে হয় বুঝি আকাশের সব গ্রহ-নক্ষত্রের ছটা ছাড়িয়ে যেতে চায় তার গর্ব। সমুদ্র ভরে উঠেছে যেন সোনার রেণুতে — আকাশের প্রায় অলক্ষ্য এই প্রতিবিম্বে সমুদ্রের কৃষ্ণ মূক বিস্তার একটু যেন সজীব হয়ে উঠে, স্বচ্ছ ঝিলিমিলি দেখা দেয়। মনে হয় যেন সমুদ্রের গভীর থেকে আকাশের দিকে চেয়ে আছে হাজারখানেক ভাস্বর চোখ...

আহতভাবে বুড়ো জেলে চুপ করে থাকে মাছের মতো। অধৈর্য হয়ে সিপাহী নীরবতা ভঙ্গ করে বলে, 'শুনছি, বলো।' আর বুড়ো লোকটা মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সেই রকম একটা কাহিনী বুনে চলে যা চিরকালই লোকে শোনে আগ্রহ নিয়ে।

'প্রায় একশ বছর আগে পাহাড়ের ওই উঁচুতে যেখানে পাইন গাছগুলোর রাজ্য সেখানে একেল্লানি নামে এক কুঁজো বুড়ো গ্রীক

বাস করত। বে-আইনী মাল পাচারের ব্যবসা করত লোকটা, তুকতাক করতে জানত। এই একেল্লানির এক ছেলে ছিল আরিস্টিডিস — সে ছিল শিকারী, সেকালে তখনো পর্যন্ত দ্বীপে বুনো ছাগল চরতে দেখা যেত। এদিকে তখন সবচেয়ে ধনী পরিবার ছিল গালিয়ার্দিরা। এখন ওরা তাদের ঠাকুর্দার নাম সেনৎসামানে — এই উপাধিতে পরিচিত। যত আঙুর-ক্ষেত তার অর্ধেকেরই মালিক ছিল ওরা, মাটির তলে মদের গুদামই ছিল আটটা, তাতে হাজারেরও বেশি পিপে। শুনেছি ফ্রান্সে নাকি এখন লোকে মদ ছাড়া আর অন্য কিছুর দাম জানে না — তা সেই ফ্রান্সেও সেকালে আমাদের শাদা মদের আদর ছিল খুব। ফরাসিরা হল সকলেই নেহাৎ মদ্যপ আর জুয়াড়ি — নিজেদের রাজার মুণ্ডুটা নিয়ে পর্যন্ত ওরা জুয়ার বাজির মতো খেলেছে...'

আস্তে করে হাসে সেপাই, আর যেন সেই হাসিরই প্রতিধ্বনি করে কোথায় ছলাৎ করে একটু শব্দ ওঠে জলের। ওরা দু'জন কান খাড়া করে চায় সমুদ্রের দিকে, সেখানে বৃত্ত রচনা করে ছোটো ছোটো লহরী ফিরে যাচ্ছে তটভূমি থেকে।

'টোপে ঠোকর মেরে দেখছে মাছ...'

'তারপর?..'

'হ্যাঁ, তা সেই গালিয়ার্দিরা ছিল তিন ভাই। আমার গল্প মেজো ভাইটাকে নিয়ে, মস্ত লম্বা আর বাজখাঁই গলা ছিল বলে সকলে ওকে ডাকত কার্লোনে বলে। ওর মন টেনেছিল কামারের গরিব মেয়ে জুলিয়া, ভারি চালাক চতুর মেয়ে সে। পালোয়ানদের তো আর বুদ্ধি হয় না। কেন জানি ওদের বিয়েটা পেছিয়ে যাচ্ছিল আর অধৈর্য হয়ে ওরা বিয়ের দিন গুণছিল। গ্রীকের ছেলেটাও ঘুমিয়ে ছিল না, তারও ভালো লেগেছিল জুলিয়াকে। তার ভালোবাসা পাবার অনেক চেষ্টা করে সফল হতে না পেরে ও ঠিক করলে, জুলিয়ার মান খোয়াবে,

আশা করলে, কার্লোনে গালিয়ার্দি তাহলে স্রষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তখন ওর পক্ষে তাকে পাওয়া সহজ হবে। সেকালে লোকেরা এখনকার চেয়ে অনেক কড়া ছিল কি না...'

'তা বলতে কি, একালেও...'

'বড়োলোকদের ফুর্তি শুধু লাম্পট্যে। কিন্তু আমাদের এখানে কেউ তো আর বড়োলোক নেই!' বুড়ো বলে কঠোর করে, তারপর আবার ডুবে যায় অতীতের কথায়:

'একদিন মেয়েটা যখন আঙুরলতার ছাঁটাই ডালপালাগুলো জড়ো করছে, এমন সময় গ্রীকের সেই ছেলেটা দেখা দিল। ভাব করলে যেন মেয়েটির আঙুর-ক্ষেতের দেয়ালের ওপর পাহাড়ে পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে তার পা ফসকে গেছে, ধপাস করে সে পড়লে একেবারে মেয়েটির পায়ের কাছে। ভালোমানুষ খ্রীস্টানের মতো মেয়েটি তার ওপর নুয়ে দেখতে লাগল ছেলেটা জখম হয়েছে কি না। যন্ত্রণায় ককাতে ককাতে সে মিনতি করলে, 'জুলিয়া, দোহাই তোমার, দয়া করে লোক ডাকাডাকি করতে যেও না! তোমার হিংসুটে বর যদি আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে, তাহলে আমাকে সে মেরেই ফেলবে... এখানে খানিক জিরিয়ে নিতে দাও, তারপর চলে যাব...'

'মেয়েটির কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ও ভান করলে যেন মূর্ছা গেছে। ভয় পেয়ে মেয়েটি লোক ডাকলে সাহায্যের জন্যে। লোকেরা যখন সবাই দৌড়ে এল তখন কিন্তু হঠাৎ গ্রীকের ছেলেটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল একেবারে খাসা তবিয়তে; ভাব করলে যেন সে দারুণ অস্বস্তি বোধ করছে, চিৎকার করে সে বলতে লাগল মেয়েটিকে সে ভালোবাসে, এই সাধু ইচ্ছা জানিয়ে শপথ করলে, যে মেয়েটিকে বিয়ে করে সে তার কলঙ্ক মুছে দিতে রাজী — মোট কথা সে ব্যাপারটাকে এমনভাবে হাজির করল যেন মেয়েটির আদর-আলিঙ্গনে ক্লান্ত হয়েই সে তার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেয়েটির ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও

সহজ-বিশ্বাসী লোকেরা গল্পটা বিশ্বাস করলে। মেয়েটিই যে লোক ডেকেছিল এ কথাও ওদের মনে পড়ল না। ওরা জানত না যে গ্রীকরা হল জাত ধূর্ত, খ্রীস্টানদের সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল করে দেবার জন্যে খোদ শয়তানই ওদের খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছে। মেয়েটা শপথ করে বললে, যে গ্রীকের ছেলেটা মিছে কথা বলছে, কিন্তু ছেলেটা বোঝালে, সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে জুলিয়া, কার্লোনের বজ্রমুষ্টির ভয় পাচ্ছে। ছেলেটারই জিত হল, মেয়েটা হয়ে উঠল যেন একেবারে উন্দাম পাগল। ঢিল তুলে নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল লোকজনের ওপর। তাই তার হাত বেঁধে সারা গাঁয়ের লোক রওনা দিল শহরের দিকে। ওদিকে মেয়েটির চিৎকার কানে গিয়েছিল কার্লোনের। মেয়েটির কাছে ছুটে আসছিল সে, কিন্তু লোকে যখন বললে কী হয়েছে, তখন ভিড়ের সামনে হাঁটু গেড়ে সে বসল, তারপর লাফিয়ে উঠে বাঁ হাত দিয়ে সে তার প্রিয়তমার মুখের ওপর একটি ঘুসি মারলে আর ডান হাত দিয়ে টুঁটি চেপে ধরল গ্রীকটার। বহু কষ্টে লোকে তাকে ছাড়ালে।'

সেপাইটা গজ গজ করলে, 'লোকটা একেবারে হাঁদা।'

'সাচ্চা লোকের বুদ্ধি যা-কিছু তা সবই থাকে তার বুকের মধ্যে! আগেই বলেছিলাম, ব্যাপারটা ঘটেছিল শীতকালে, শিশু যীশুর জন্ম জয়ন্তী পার্বণের কিছু দিন আগে। মাত্র কিছু দিন আগে। পার্বণের এই দিন লোকে তাদের বাড়তি মদটা, ফলটা, মাছটা, মুরগিটা সবাই সবাইকে উপহার দেয়। সবাই দেয়, আর সবচেয়ে গরিবেরাই যে পায় সবচেয়ে বেশি তা তো জানা কথা। সত্যি কথাটা কেমন করে কার্লোনে জানতে পেরেছিল তা আমার আর মনে নেই, কিন্তু তা সে ঠিকই জানতে পেরেছিল। পার্বণের প্রথম দিন জুলিয়ার মা-বাবা পেলে শুধু একটিমাত্র উপহার — ওরা এমন কি গির্জায় যাবার জন্যেও বাড়ির বার হয় নি। সে উপহার হল পাইন ডালপালা দিয়ে

ভরা একটি ছোটো ঝুড়ি, আর সে ঝুড়ির মধ্যে কার্লোনে গালিয়ার্দির কাটা বাঁ হাতখানা, যে হাতে সে জুলিয়াকে মেরেছিল। জুলিয়াকে নিয়ে আতঙ্কে ওরা ছুটে গেল কার্লোনের বাড়ি। বাড়ির দরজার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে কার্লোনে ওদের সঙ্গে দেখা করলে। রক্ত-মাখা একটা ন্যাকড়া দিয়ে তার ঠুঁটো হাতটা জড়ানো। ছেলেমানুষের মতো কাঁদলে সে।

'ওরা জিগ্যেস করলে, 'এ করেছ কী?'

'ও বললে, 'যা করা উচিত তাই করেছি। যে-লোকটা আমার প্রেমের অপমান করেছে, তার বাঁচার অধিকার নেই। তাকে আমি খুন করেছি... আমার নির্দোষ প্রিয়তমাকে যে হাত আঘাত করেছে, সেটা আমার অপমান। তাই তাকে আমি কেটে ফেলেছি... এখন এইটুকু আমি চাই জুলিয়া, তুমি আর তোমার পরিজনেরা আমায় ক্ষমা করো...'

'ক্ষমা অবশ্যই সকলে করেছিল, কিন্তু বদমাইসদের রক্ষা করার তো আইন আছে। ওই সেই গ্রীকটার জন্যে দু'বছর জেলে রইল গালিয়ার্দি, জেল থেকে তাকে খালাস করে আনতে বিস্তর খরচা হয়ে গেল গালিয়ার্দির ভাইদের...

'পরে সে জুলিয়াকে বিয়ে করে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেশ সুখেই দিন কাটিয়ে গেছে। আর এই দ্বীপে একটা নতুন উপাধি চালু করে দিয়েছে ওরা — সেনৎসামানে, অর্থাৎ নুলো...'

গল্প শেষ করে বুড়ো সজোরে তার পাইপ টানতে থাকে।

সিপাহী বলে, 'ভালো লাগল না গল্পটা। তোমার ওই কার্লোনে হল একটি বুনো... আর সব মিলিয়ে ব্যাপারটা নিতান্ত বোকার মতো...'

'একশ বছর পরে তোমার জীবনটাও নিতান্ত বোকার মতো বলে মনে হবে' — বুড়ো বলে জোর দিয়ে। পাইপ থেকে অন্ধকারে শাদা ধোঁয়ার একটা বড়ো কুণ্ডলী ছেড়ে সে আরও বলল:

'যদি অবশ্য আদৌ কারো মনে থাকে যে তুমি বলে কেউ একদিন দুনিয়ায় বাস করে গেছ...'

নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার একটা জোরালো শব্দ ওঠে ছলাৎ করে — এবারকার শব্দটা যেন ধৈর্যহারা। বুড়ো তার বর্ষাতি খুলে ফেলে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন তলিয়ে যায় কালো জলের মধ্যে — চারিদিক অন্ধকার, শুধু তটের কাছে জলের উজ্জ্বল কম্পন, রুপোর মতো মাছের আঁশের একটু নীলাভা।

তরুণ ইতালি

প্রান্তর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মখমলের পোশাক-পরা রাত আর শহর তাকে বরণ করে সোনালী বাতি নিয়ে। মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় দুটি নারী আর একটি তরুণ, ওরাও যেন রাতকে স্বাগত করতে চলেছে। আর ওদের পিছু-পিছু ভেসে আসে সারা দিনের মেহনতের পর ক্লান্ত জীবনের মৃদু কোলাহল।

রোমানদের নানা ভাষাভাষী ক্রীতদাসদলের হাতে গড়া এই প্রাচীন রাস্তার বাঁধানো পাথরের ওপর তিন জোড়া পায়ের মৃদু শব্দ ওঠে। উষ্ণ নীরবতার মধ্যে একটি নারীর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে দৃঢ় আর কোমল:

'লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে নেই...'

'আমাকে কখনো রূঢ় হতে দেখেছ, মা?' চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করে তরুণ।

'তুই তর্ক করিস বড়ো উত্তেজিত হয়ে...'

'আমার সত্যকে আমি যে তীব্র ভালোবাসি...'

তরুণের বাঁ পাশ ঘেঁষে হাঁটে একটি মেয়ে। পাথরের ওপর ঠকঠক

শব্দ তোলে তার কাঠের জুতো। মেয়েটি হাঁটে কেমন কান্নার মতো, মুখটা উঁচু করে তোলে আকাশের দিকে — বড়োসড়ো সন্ধ্যা তারাটি জ্বলছে সেখানে; তার নিচে সূর্যাস্তের লাল আভা, সেই লালের ওপর দুটি অপ্রজ্বলিত মশালের মতো খাড়া হয়ে আছে দুটো পপলার গাছ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলে, 'সোশ্যালিস্ট হলে প্রায়ই জেলে যেতে হয়।'

'জেলে পাঠানো বন্ধ করবে' — ছেলে উত্তর দেয় শান্তভাবে, 'ও ব্যবস্থায় আখেরে কিছু কাজ দেবে না...'

'কাজ দেবে না কিন্তু ইতিমধ্যে...'

'পৃথিবীর তরুণ হৃদয়কে ধ্বংস করতে পারে এমন শক্তি কোথাও নেই, কখনো জন্মাবেও না...'

'ওসব কথা গানেই শোনায় ভালো রে...'

'লাখো লাখো লোকেই সে গান গাইছে যে মা, আর সারা জীবনই যে ক্রমেই বেশি করে সে গানের জন্যে কান পেতে থাকছে... তুমি নিজেই তো এখন যত ধৈর্য ধরে ভালোভাবে আমার কি পাওলোর কথা শোনো তা তো আগে শুনতে না?'

'ঠিকই! কিন্তু এই ধর্মঘট করে তোকে তো তোর নিজের শহর থেকে চলে যেতে হল...'

'আমাদের দু'জনের পক্ষে শহরটা বড়ো ছোটো, পাওলো রইল। আর ধর্মঘটে তো আমরা জিতলাম...'

ঝংকৃত গলায় সায় দেয় মেয়েটি, 'জিতেছ ঠিকই! তুমি আর পাওলো...'

কথাটা শেষ না করে মেয়েটি কোমল করে হাসতে থাকে তারপর তিন জনেই মিনিটখানেক হাঁটে নীরবে। সামনে দেখা যায় কালো একটা ঢিবি, কোন একটা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে। তার ওপর চিকন

ডালপালা নামিয়ে চিন্তামগ্নের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটি সুরভিত ইউকেলিপ্‌টাস্‌ গাছ। ওরা তিন জন গাছের কাছাকাছি আসতেই একটা মৃদু কাঁপনে খস খস করে ওঠে তার ডাল।

মেয়েটি বলে, 'ওই তো পাওলো।'

লম্বা কালো একটা মূর্তি ভাঙাচোরা দেয়ালগুলো থেকে সরে এসে দাঁড়ায় রাস্তার মাঝখানে।

তরুণ হেসে বলে মেয়েটিকে, 'হৃদয় দিয়ে টের পেলি বুঝি?'

সামনে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে আসে, 'যাচ্ছ তাহলে?'

'হ্যাঁ, এই রইল — মা আর বোন। আমায় আর এগিয়ে দেবার দরকার নেই তোমাদের। এখান থেকে রোম মাত্র পাঁচ ঘণ্টার পথ -- ইচ্ছে করেই পায়ে হেঁটে যাব বলে ঠিক করেছি, যেতে যেতে ভাবনা চিন্তাগুলো একটু গুছিয়ে নেওয়া যাবে...'

ওরা থামল... লম্বা লোকটা টুপি নামিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে:

'মা আর বোনের জন্যে ভাবনা ক'রো না। সব ঠিক থাকবে!'

'তা জানি। আসি, মা!'

ফুঁপিয়ে উঠে মৃদু একটু বিলাপধ্বনি করে মা। শোনা যায় তিনটি সাবেগ চুম্বনের শব্দ। তারপর পুরুষ-কণ্ঠ:

'যাও, বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করো গে। এই অশান্ত দিনগুলোয় অনেক ঝকমারি গেছে তোমার ওপর দিয়ে। যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে! আমার মতো পাওলোও তোমার এক ছেলে। তাহলে, চলি বোনটি...'

আবার চুম্বন আর পাথরের ওপর পায়ের শুকনো খসখস শব্দ — রাত্রির সতর্ক স্তব্ধতার মধ্যে সব শব্দই যেন আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আবার।

অন্ধকার জড়ানো চারটে কালো কালো মূর্তি এক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য যেন কিছুতেই ফের আর আলাদা হতে পারে না।

তারপর নীরবে ছাড়াছাড়ি হয়। তিন জন ধীরে ধীরে ফিরে চলে শহরের আলোগুলোর দিকে, আর একজন দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় সামনে পশ্চিমে, সেখানে সূর্যাস্তের আভা মিলিয়ে গিয়ে এক রাশ উজ্জ্বল তারা ফুটে উঠেছে নীল আকাশে।

'বিদায়!' রাত্রির অন্ধকারে আস্তে ভেসে যায় একটা করুণ কণ্ঠ।

আর দূর থেকে সতেজ গলায় জবাব আসে:

'বিদায়! দুঃখু কোরো না, শীগগিরই ফের দেখা হবে...'

রাস্তার পাথরের ওপর শুকনো শব্দ ওঠে মেয়েটির কাঠের জুতো থেকে, আর খানিকটা ভাঙা ভাঙা গলায় সান্ত্বনা দিতে থাকে পাওলো:

'ও ঠিকই থাকবে, দোন্না ফিলোমেনা, আপনার মেরী মাতার করুণার মতো এতে একেবারে নিশ্চিত থাকতে পারেন। খাসা মাথা ওর, জোরালো কলজে। নিজে ও ভালোবাসতে জানে, আর অন্যের কাছ থেকে সহজেই সে ভালোবাসা পায়... আর লোককে ভালোবাসা — এ তো সেই ডানা যাতে ভর দিয়ে মানুষ উঠে যায় সবকিছুর ওপরে...'

শহরের নম্র ফ্যাকাশে আলো যেন ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে। সে অন্ধকারে ঢেঙা লোকটার কথাগুলো জ্বলে ফুলকির মতো।

'বুকের মধ্যে যার দুনিয়ার মানুষকে মেলাবার মতো মন্ত্র থাকে তার গুণগ্রাহী লোক সে সবখানে পাবেই পাবে!'

ঠিক নগর-প্রাচীর ঘেঁষে নিচু ছাতওয়ালা একটা শাদা সরাইখানা। আলো-ভরা দরজার চৌকনো চোখ দিয়ে সরাইখানাটা যেন পথচলতি লোকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দরজার মুখেই ছোটো ছোটো তিনটে টেবিলে গোলমাল করছে কালো কালো কয়েকটা মূর্তি, গোঙাচ্ছে গিটারের তার, স্নায়বিক কাঁপনে কাঁপছে ম্যান্ডোলিনের ধাতব নিক্কণ।

ওরা তিন জন দরজার কাছে আসতেই বাজনা থেমে যায়, চেঁচামেচি কমে আসে, কয়েকজন উঠে দাঁড়ায়:

ঢেঙা লোকটা বলে, 'শুভ সন্ধ্যা, কমরেডরা!'

এক ডজন গলায় বন্ধুর মতো সানন্দ জবাব আসে:

'শুভ সন্ধ্যা পাওলো, কমরেড! আমাদের কাছে না কি? মদ এক গেলাস?'

'না, না... ধন্যবাদ!'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা বলে:

'তোমাকেও খুব ভালোবাসে আমাদের লোকেরা...'

'কি বললেন, দোন্না ফিলোমেনা, আমাদের লোক?'

'খুব হয়েছে, ঠাট্টা করতে হবে না... আমার আপনার লোকেদের কাছে আমি তো আর পর নই... ওরা সকলেই তোমাদের ভালোবাসে, তোমাকে আর ওকে...'

ঢেঙা লোকটা মেয়েটিকে বাহুলগ্ন করে নিয়ে বলে:

'সকলেই ভালোবাসে, এবং সবাই ছাড়াও আরো একটি মেয়ে... তাই না?'

কোমল গলায় মেয়েটি বলে, 'হ্যাঁ, বটেই তো...'

তখন অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠে মা:

'বাচ্চারা! ...তোমাদের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, যখন কথা শুনি তখন বিশ্বাস না করে পারি না যে আমাদের চেয়ে তোমরা জীবন কাটাবে অনেক ভালো...'

তারপর ওরা তিন জনে অদৃশ্য হয়ে যায় শহরের রাস্তায়। ঝুলি ঝুলি পুরনো এক পোশাকের আস্তিনের মতোই সে রাস্তা জীর্ণ আর সঙ্কীর্ণ...

ঘৃণা

সকাল থেকে প্রবল ধারায় ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়েছে। দুপুরের দিকে জোর ফুরিয়ে এল মেঘের, তাদের ঘন বুনোট ফেঁসে ফেঁসে গেল, বাতাস তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে একরাশ ধোঁয়াটে টুকরোর মতো করে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল সমুদ্রে, সেখানে ফের তা আবার নীল-ধূসর এক ঘন পিণ্ড হয়ে জমাট বেঁধে গাঢ় ছায়া নামাল বর্ষণ-শান্ত জলের ওপর।

পুবের দিকে আকাশ কালো, অন্ধকার চিরে যেতে লাগল বিদ্যুতের ঝলকে, আর দ্বীপখানাকে চোখ ধাঁধানো আলোয় ভরে দিল অপূর্ব এক সূর্য।

দূরে সমুদ্রের বুক থেকে তাকিয়ে দেখলে দ্বীপটাকে নিশ্চয়ই মনে হবে পার্বণের দিনের এক সমৃদ্ধ মন্দির: সবকিছুই ভারি ঝকঝকে রকমের ধোয়ামোছা, জ্বলজ্বলে ফুলে ঢালাও সাজানো, বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা চকমকিয়ে উঠছে চারিদিকেই — আঙুরের হলদেটে কচি পাতার ওপর তা দেখাচ্ছে পোখরাজের মতো, উইস্তারিয়ার গুচ্ছের ওপর তা যেন এক একটা জামীরা, রক্তিম জিরেনিয়মের ওপর তা

যেন চুনি, আর ঘাসের ওপর সর্বত্র, ঝোপঝাড়ের সবুজে, গাছের পাতায় তা ছড়ানো যেন রাশি রাশি মরকত।

বর্ষার পরে সর্বদা যেমন হয় তেমনি চুপচাপ চারিদিক; শোনা যাচ্ছে শুধু জলস্রোতের কোমল ঝিরঝির, সে স্রোত কোথায় যেন লুকিয়ে বইছে পাথরগুলোর মধ্যে — ইউফোরবিয়া, ডিউবেরি, আর প্যাক খাওয়া, সুরভি ভরা ক্লেমাটিসের শেকড়গুলোর তল দিয়ে। নিচে সমুদ্রের কোমল কল্লোল।

ফার্জ ফুলের সোনালী কাঁটাগুলো আকাশের দিকে উঁচানো, জলে ভারি হয়ে দুলছে মৃদু মৃদু — নিঃশব্দে সে জল মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে ওই অদ্ভুত-দর্শন ফুলগুলো থেকে।

সজল শ্যামল এই প্রেক্ষাপটে ফিকে লাইলাক রঙের উইস্তারিয়া যেন পাল্লা দিয়েছে রক্ত-লাল জিরেনিয়ম আর গোলাপের সঙ্গে। ক্লেমাটিস্‌ ফুলের মরচে-হলুদ ঝালরের মধ্যে আইরিস্‌ আর জিলি ফুলের গাঢ় মখমলী বুটি। সবকিছু এমন জ্বলজ্বলে, এমন টকটকে যে মনে হয় বুঝি বেহালা, বাঁশী আর আবেগমন্দ্র চেলোর মতোই ঝঙ্কার দিচ্ছে ফুলগুলো।

পুরনো কড়া মদের মতো ভেজা বাতাসটা মদির আর সুরভিত।

ধূসর একটা শিলাস্তূপ বিস্ফোরণে ভাঙাচোরা — ফাটলগুলোয় চোখে পড়ে মরচে-ধরা লোহার মোটা দাগ। এই শিলাস্তূপের তলে, ডিনামাইটের টক-গন্ধ-ওঠা ছাই-ছাই হলদেটে পাথরনুড়ির মাঝখানে চার জন পাথর-ভাঙা মজুর তাদের দুপুরের খাওয়া খাচ্ছিল। শক্তসমর্থ চেহারা লোকগুলোর, পরনে ভেজা ন্যাতাকানি, পায়ে চামড়ার চটি।

আলু আর বিলিতি বেগুনের সঙ্গে জলপাই তেলে ভাজা অক্টোপাসের কড়া মাংসে একটা মস্তবড়ো পাত্র ভর্তি — তা থেকে ওরা

খাচ্ছিল ধীরেসুস্থে, তৃপ্তি করে, তার সঙ্গে পাল্লা করে একটা বোতল থেকে লাল মদ খাচ্ছিল ঢোকে ঢোকে।

ওদের মধ্যে দাড়ি গোঁপ কামানো দু'জনের চেহারা এত একরকম যে বোঝাই যায় তারা ভাই, এমন কি যমজ ভাই-ও হতে পারে। তৃতীয় জন হল একটি বেঁটেখাটো একচোখ কাণা একটি লোক, পা দুখানা ধনুকের মতো বাঁকা, ছটফটে, শুকনো শরীর, তাতে ওকে দেখাচ্ছিল একটা বুড়ো রোঁয়া-উঠা পাখির মতো। চতুর্থ জন মাঝারি বয়সের এক দাড়িওয়ালা লোক, চওড়া কাঁধ, বাঁকা নাক, মাথায় অনেক পাকা চুল।

মস্ত এক টুকরো রুটি ভেঙে সে মদে ভেজা মোচটা মুছে নিলে, তারপর মুখের অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গুঁজে দিলে টুকরোটা।

লোকটা বলছিল, 'বাজে কথা।' দাড়ি-ভরা চোয়ালটা তার একটানা চিবিয়ে চলেছে, 'মিথ্যে কথা! অন্যায় কিছুই আমি করি নি...'

মোটা মোটা ভুরুর নিচে বাদামী রঙের চোখদুটোয় তার একটা নিরানন্দ পরিহাসের ভাব। গলার স্বর ভারি-ভারি, ভাঙা-ভাঙা, কথা কইছিল ধীরে ধীরে, অনিচ্ছার সঙ্গে। তার সবকিছু থেকে — তার টুপি, তার রোমশ ডাকাতে মুখ, বড়ো বড়ো হাত আর শাদা শাদা পাথরের ধুলোয় ভরা তার নীল ক্যাম্বিসের পোশাক — এ সবকিছু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে বিস্ফোরণের জন্য পাহাড়ের পাথর ফুটো করার ভারটা ওরই ওপরে।

তিন জন সঙ্গী মজুর মন দিয়ে ওর কথা শুনছিল। সে কথায় কেউ বাধা দিচ্ছিল না ওকে, শুধু মাঝে মাঝে ওরা মুখ তুলে তাকাচ্ছিল এমনভাবে যেন বলতে চাইছিল:

'তারপর...'

পাকা ভুরুদুটো নাচিয়ে নাচিয়ে লোকটা বলে চলল:

'লোকটা — আন্দ্রে গ্রাস্‌সো বলে সবাই ডাকে ওকে — লোকটা

আমাদের গাঁয়ে এসেছিল যেন এক রাত-বিরেতের চোর। ভিখিরির মতো তার বেশ — ছেঁড়াখোঁড়া পোশক, একই রঙের টুপি আর বুট-সমানই ফাটা-ছেঁড়া। লোকটা ছিল যেমন লোভী, তেমনি নির্লজ্জ, তেমনি নিষ্ঠুর। আর সাত বছর যেতে না যেতেই গাঁয়ের বুড়োরা সবাই তাকে টুপি খুলে সেলাম জানাতে শুরু করল — কিন্তু সে বড় জোর একটু মাথাও নাড়ত না। চল্লিশ মাইলের মধ্যে এমন লোক নেই যে ওর কাছ থেকে কর্জা না খেয়েছে।'

'যা বলেছ, এমনি লোক আছে বৈকি' — ধনুক-পায়া লোকটা মন্তব্য করলে নিঃশ্বাস ফেলে, মাথা নেড়ে।

কথক একবার তাকাল ওর দিকে। বিদ্রূপ করে জিগ্যেস করলে:

'সাক্ষাৎ ঘটেছে ওদের সঙ্গে?'

বুড়ো লোকটা চুপ করে হাত নাড়লে। দাড়ি গোঁপ কামানো লোকদুটো হেসে উঠল একসঙ্গে। বাঁকা নাকওয়ালা এক ঢোক মদ গিলে নীল আকাশে উড়ন্ত একটা বাজপাখিকে লক্ষ্য করতে করতে বলে চলল:

'আমি তখন তেরো, ওর বাড়ি বানানোর পাথর বইবার কাজে আর কয়েক জনের সঙ্গে আমাকে ও মজুর ধরেছিল। আমাদের সে জানোয়ার বলেও জ্ঞান করত না। আমার সঙ্গী লুকিনো যখন তাকে সে কথা জানাল, ও বললে: 'গাধাটাও আমার নিজের জিনিস, কিন্তু তুই তো আমার কেউ নোস, তোদের দয়ামায়া করে কী লাভ আমার?' এই কথাগুলো যেন ছুরি হয়ে বিঁধল আমার মনে। সেদিন থেকে আরো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। লোকটা সকলের সঙ্গেই নির্লজ্জ আর বেহায়ার মতো ব্যবহার করত, এমন কি মেয়ে বুড়ো কাউকেও খাতির করত না। ভালো মানুষেরা যখন বলত অন্যায় হচ্ছে, সে মুখের ওপর হেসে উঠত। বলত: 'আমি যখন গরিব ছিলাম, আমাকেও তো কেউ মায়া করে নি।' ও মিশত পুরুত, বন্দুকধারী সেপাই আর পুলিসের

সঙ্গে। বাকি লোকজনের সঙ্গে তার দেখা হত কেবল বিষম অভাবের দিনে — আর তখন তাদের নিয়ে সে যা খুশি তাই করতে পারত।'

ধনুক-পায়া লোকটা ফের চাপা গলায় মন্তব্য করলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ রকম লোক আছে বটে।' অন্য তিন জন ওর দিকে তাকাল সহানুভূতি নিয়ে; দাড়ি গোঁপ কামানো লোকদুটোর একজন নীরবে মদের বোতলটা এগিয়ে দিল ওর দিকে। বোতলটা নিয়ে মুখে ঢালবার আগে বুড়ো আলোর দিকে তুলে ধরল সেটাকে, তারপর বললে:

'মাডোনার পবিত্র হৃদয়ের জন্যে পান করা যাক!'

'লোকটা প্রায়ই বলত: 'গরিবেরা খাটে বড়ো লোকদের জন্যে, বোকোরা খাটে বুদ্ধিমানের জন্যে — চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, তাই চলবেও চিরকাল।''

কথক হেসে হাত বাড়ালে বোতলটার দিকে। বোতলটা শূন্য হয়ে গিয়েছিল। অবহেলায় সেটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পাথরের ওপর যেখানে পড়েছিল গাঁইতি, হাতুড়ি আর কালো সাপের মতো এ'কেবে'কে ছিল ফিউজ তারের একটা টুকরো।

'আমার তখন অল্প বয়স, এসব কথায় বেদম রাগ ধরে যেত আমার, সঙ্গী মজুরদেরও: কেননা এসব কথা শুনলে ভালো একটা জীবনের জন্যে আমাদের আশা-আকাংক্ষা সব নিভে যেত। একদিন সন্ধেয় আমি আর আমার বন্ধু লুকিনোর সঙ্গে মাঠে ওর দেখা হয়ে গেল। ও তখন ঘোড়ায় চেপে তাড়াহুড়ো না করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ওকে থামিয়ে ভদ্রভাবে কিন্তু বেশ জোর দিয়েই আমরা বললাম: 'লোকের সঙ্গে আপনি সদয় ব্যবহার করুন এই আমাদের অনুরোধ।''

দাড়ি গোঁপ কামানো লোকদুটো হাসিতে ফেটে পড়ল, একচোখ কাণা লোকটাও মৃদু মৃদু হাসলে, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে কথক:

'ব্যাপারটা নেহাত বোকামি হয়েছিল, তা সত্যি! কিন্তু যৌবন হল

গে সাঁচ্চা। কথার যে শক্তি, তাতে যৌবন বিশ্বাস করে। বলতে পারি, যৌবন হল গে জীবনের বিবেক...'

বুড়ো বললে, 'তারপর, কী জবাব দিলে সে?'

'ও বেশ নির্ভয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'ঘোড়ার পথ ছাড়, পাজীর দল কোথাকার!' পিস্তল বার করে সে একবার আমার দিকে একবার বন্ধুর দিকে তাক করলে। আমরা বললাম, 'আমরা আপনাকে ভয় দেখাতে আসি নি গ্রাস্‌সো, রাগারাগি করবেন না, আমরা শুধু আপনাকে একটু উপদেশ দিতে চেয়েছি!''

'এ্যাই, এইটে বলেছ মন্দ নয়!' বললে দাড়ি গোঁপ কামানো লোকদুটোর একজন, আর অন্য জন মাথা নাড়লে সায় দিয়ে। ধনুক-পায়া লোকটা শক্ত করে ঠোঁট চেপে বাঁকা বাঁকা আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখতে লাগল একটা পাথর।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সরু একটা কাঠি দিয়ে ঘাসের পাতা থেকে স্ফটিকের মতো বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে ঝরিয়ে দেবার খেলায় মাতলে একজন, আর একজন শুকনো ঘাসের ফলা দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে চেয়ে দেখতে লাগল তাকে। বাতাস হয়ে উঠতে লাগল শুকনো আর গরম। দুপুরের সংক্ষিপ্ত ছায়া মিলিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। গুরুগম্ভীর গল্পটার সঙ্গে মৃদু ছলাৎ ছলাৎ করে চলল সমুদ্র।

'এই সাক্ষাতের ফল হল লুকিনোর পক্ষে খুব খারাপ। ওর বাপ আর খুড়ো গ্রাস্‌সোর কাছ থেকে কর্জা খেয়েছিল। বেচারা লুকিনোর চেহারা হয়ে যেতে লাগল রোগা। দাঁত কড়মড় করত সে, আর তার চোখদুটি আর তেমন রইল না যা ভালো লাগত মেয়েদের। আমাকে একদিন সে বললে: 'ঈস, কী বোকামির কাজই না করেছি সেদিন! নেকড়েকে কি আর কথা বলে বোঝানো যায়!' মনে মনে বুঝলাম: 'লুকিনো খুন করতে পারে।' ছোঁড়াটার জন্যে, ওদের ভালোমানুষ পরিবারটার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল আমার। কিন্তু আমি নিজেও গরিব —

দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ ছিল না, মা মারা গিয়েছিল কিছুদিন আগেই।'

বাঁকা-নাক মজুরটা চুনো শাদা আঙুল দিয়ে দাড়ি মোচের ওপর হাত বুলিয়ে নিলে একবার। দেখা গেল ওর বাঁ হাতের তর্জনীতে ঝকঝকে একটা রুপোর আংটি, নিশ্চয় বেশ ভারি হবার কথা।

'ব্যাপারটার যদি আমি একেবারে চূড়ান্ত করে ছাড়তে পারতাম, তাহলে হয়ত লোকের উপকার হত, কিন্তু মনটা আমার একটু নরম। একদিন রাস্তায় গ্রাস্‌সোর দেখা পেয়ে তার পাশেপাশে হাঁটতে হাঁটতে যতটা পারি বিনয়ের সঙ্গে বললাম: 'আপনি বড়ো নীচ আর লোভী মানুষ, আপনার সঙ্গে বাস করা মানুষের পক্ষে কঠিন। আপনি যদি কারো হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন, তাহলে সে হাত ছুরি ওঠাতেও পারে কিন্তু। আমি আপনাকে বলছি: এখান থেকে একেবারে চলে যান!' ও বললে: 'তুই নির্বোধ, হে ছোকরা!' কিন্তু আমি জেদ করতে লাগলাম। ও হেসে বললে: 'আমাকে রেহাই দে তো বাপু, কত চাস? এক লিরা দিলে চলবে?' ব্যাপারটা অপমানের। কিন্তু রাগ চেপে রেখে আমি জেদ ধরলাম: 'আপনাকে বলছি, যান এখান থেকে, শুনুন!' আমরা হাঁটছিলাম গা পাশাপাশি, আমি ওর ডান দিকে। আমার অলক্ষ্যে ও তার ছুরিটা বের করে মারলে আমাকে। বাঁ হাতে বেশি কিছু করতে পারে নি, বুকের মধ্যে ইঞ্চি খানেক ঢুকে গিয়েছিল মাত্র। স্বভাবতই আমি ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলে শুয়োর-মারা করে লাথি মারতে লাগলাম। ও যখন মাটির ওপর আঁকুপাঁকু করছিল তখন বললাম: 'কেমন, এবার যাচ্ছ তো!''

দাড়ি গোঁপ কামানো লোকদুটো কথকের দিকে অবিশ্বাসের একটা দৃষ্টি হেনে চোখ নামলে। ধনুক-পায়া লোকটা নিচু হয়ে জুতোয় চামড়ার ফিতে বাঁধতে শুরু করলে নতুন করে।

'পরের দিন তখনো আমি বিছানায় শুয়ে — বন্দুকধারী

সিপাহীরা এসে আমাকে নিয়ে গেল শেরিফের কাছে। শেরিফ ছিল গ্রাস্‌সোর ইয়ার। বললে: 'চিরো, তুমি সৎ লোক, নিশ্চয় এ কথা অস্বীকার করবে না যে কাল রাতে তুমি গ্রাস্‌সোকে খুন করতে গিয়েছিলে।' আমি বললাম সে কথা ঠিক নয়। কিন্তু ওদের দেখবার ধরনই হল গে আলাদা। ফলে ওরা আমাকে আদালতে সোপর্দ করার আগে জেলে রাখলে দু'মাস, তারপর রায় দিলে এক বছর আট মাস জেল। জজ সায়েবদের আমি বললাম: 'বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল বলে আমি ভাবছি না''

পাথরগুলোর মধ্যে লুকনো একটা নতুন মদের বোতল ও বার করলে টেনে, তারপর মোচের তলে বোতলটা গুঁজে দিয়ে চোঁ চোঁ করে গিললে অনেকক্ষণ। গলার রোমশ ডিমটা তৃষ্ণার্তের মতো ওঠানামা করল আর খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠল দাড়ি। নীরবে গম্ভীরভাবে তিন জোড়া চোখ চেয়ে চেয়ে দেখলে ওকে।

সঙ্গী মজুরদের দিকে বোতলটা এগিয়ে দিয়ে ভেজা দাড়িটায় হাত বুলিয়ে ও বললে, 'এসব কথা বলতেও বিচ্ছিরি লাগে।'

'গাঁয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখি আমার সেখানে কোন জায়গা নেই। সবাই ভয় পাচ্ছে আমায়। লুকিনো বললে, সে বছর অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে। বেচারার একেবারে অঙ্গারের মতো দশা। মনে মনে ভাবলাম: 'বটে!' দেখা করতে গেলাম গ্রাস্‌সোর সঙ্গে। আমাকে দেখে সে ভয়ানক আঁতকে উঠল। বললাম: 'দেখছ তো, ফিরে এসেছি। এবার যাবার পালা তোমার!' ও তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে গুলি করলে, কিন্তু তাতে ছিল পাখি মারার ছররা, আর মারলে আমার পায়ে। তাতে আমি পড়ে পর্যন্ত গেলাম না। বললাম: 'আমাকে খুন করেও যদি ফেলতে তবু আমি কবর থেকে উঠে এসে হানা দিতাম। মাডোনার কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব। তুমি গোঁয়ার বটো, কিন্তু আমিও কম গোঁয়ার নই।'

ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, তাতে অজান্তে ওর হাতখানা আমি ভেঙে ফেলেছিলাম। তেমন কোন ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু প্রথম আক্রমণ ওই করেছিল। লোক জুটল ভিড় করে। ধরে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। এবার সাজা হল তিন বছর ন'মাস। জেলের ওয়ার্ডেন আমার সমস্ত ঘটনা জানত, আমাকে ভালোওবাসত। আমার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলে যাতে আমি বাড়ি ফিরে না যাই। আপুলিয়ায় ওর জামাইয়ের ছিল মস্ত জমি আর আঙুর-ক্ষেত। তার কাছে কাজ নেবার কথা সে বললে। কিন্তু আমি যেটা শুরু করেছি সেটা ছেড়ে দেওয়া তো আর সম্ভব নয়। তাই ফের বাড়ি গেলাম। এবার একেবারে মনস্থির করে গিয়েছিলাম যে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করব না, কেননা ইতিমধ্যে এ শিক্ষা আমার হয়ে গেছে যে দশটা কথার মধ্যে নয়টা কথাই হল অবান্তর। শুধু একটি কথাই ওকে বলবার আছে আমার: 'বেরোও এখান থেকে!' গাঁয়ে পৌঁছলাম এক রবিবারে, এবং সোজা গিয়ে হাজির হলাম গির্জার উপাসনা সভায়। গ্রাস্‌সোও ছিল সেখানে। আমাকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে সারা গির্জা মাথায় তুলল: 'ভাই সব, ঐ লোকটা আমাকে খুন করার জন্যে এখানে এসেছে, আমার আত্মাটাকে নেবার জন্যে শয়তান পাঠিয়েছে ওকে!' ওর কাছে যেতে না যেতে, যা বলবার জন্যে এসেছি সে কথা ওকে যে বলব তার আগেই লোকজন আমাকে ঘিরে ফেললে। কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না। কেননা মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে জিভ আর ডান পাশটা ওর অবশ হয়ে গিয়েছিল পক্ষাঘাতে। সাত সপ্তাহ পরে মারা গেল গ্রাস্‌সো... এই হল গে ব্যাপার। ওদিকে লোকে আমার সম্পর্কে নানা রকম কাহিনী বানিয়েছে... ভয়ংকর ভয়ংকর সব কাহিনী, কিন্তু একদম বাজে।'

লোকটা উপহাসের হাসি হেসে সূর্যের দিকে তাকালে। বললে: 'এবার শুরু করতে হয়...'

অন্য তিন জন উঠে দাঁড়াল নীরবে, ধীরেসুস্থে। শিলাস্তূপের ওপরকার তেলতেলে, মরচে-ধরা ফাটলগুলোর দিকে তাকিয়ে বাঁকা-নাক মজুরটি বললে:

'কাজে যাওয়া যাক...'

সূর্য আকাশের মধ্য বিন্দুতে। যত ছায়া সব গুটিয়ে এসে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চক্রবালের মেঘ ডুবে গেছে সমুদ্রের মধ্যে। জল তার আগের চেয়েও শান্ত আর নীল।

পেপে

দশ বছরের পেপে, টিকটিকির মতো চটপটে, রোগা, পলকা, সর্ সর্ কাঁধ থেকে ঝোলে তার পরনের বিচিত্র ন্যাতাকানি, অসংখ্য ছিদ্র থেকে উঁকি দেয় তার গায়ের চামড়া, রোদে ময়লায় যা কালচে হয়ে উঠেছে।

ওকে দেখে মনে হয় একটা শুকনো তৃণখণ্ড, সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। সকাল থেকে সন্ধ্যে দ্বীপটার এ-পাথর থেকে সে-পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায় পেপে, আর কোথা থেকে যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় শোনা যায় তার কচি গলার অবিশ্রান্ত গান:

সুন্দরী ইতালিয়া,
ও গো মোর ইতালি!

উর্বরা মাটি বেয়ে গুচ্ছে গুচ্ছে নেমেছে যে ফুল, বেগুনী লালচে পাথরগুলোর মধ্যে ছুটোছুটি করে ফিরছে যে টিকটিকিগুলো,

জলপাই গাছের নিখুঁত খোদাই পাতা আর আঙুর-বাগিচার শ্যামকান্ত জাফরির মধ্যেকার পাখিগুলো, সমুদ্রের তলেকার কালচে সবুজ পানার মধ্যে ফিরছে যে মাছ, আর শহরটার সরু সরু গোলমেলে রাস্তায় ঘুরছে যে বিদেশীরা — মুখের ওপর তলোয়ারের কাটা দাগ যে মোটকা জার্মানটার, যে ইংরেজটাকে দেখে সব সময়েই মনে হয় যেন নরবিদ্বেষীর ভূমিকায় অভ্যস্ত এক অভিনেতা, যে আমেরিকানটার সব সময়েই প্রচণ্ড কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা তাকে ইংরেজের মতো দেখাক, আর ডুগডুগি খেলনার মতো বকবকে অননুকরণীয় ফরাসী ভদ্রলোকটি — সবকিছুতেই পেপের আগ্রহ।

'কী একখান মুখ!' পেপে মন্তব্য করে তার খেলার সঙ্গীদের কাছে আর তীক্ষ্ন নজর দিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে জার্মানটাকে। আত্মমর্যাদায় জার্মানটা এমন ফুলে উঠেছে যে মনে হয় মাথার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে তার। 'এই হল মুখ, আমার পেটখানার চেয়ে ছোটো নয়!'

জার্মানদের পেপে পছন্দ করে না। পেপের যা-কিছু ধারণা তা গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট আর স্কোয়ারের ধ্যান-ধারণা আর ছোটো ছোটো সেই সব সেলুন থেকে যেখানে শহরের লোকেরা মদ খায়, তাস খেলে, আর খবরের কাগজ প'ড়ে রাজনীতি আলোচনা করে।

তারা বলে, 'আমাদের মতো গরিব দক্ষিণদেশীদের কাছে আমাদের মুখমিষ্টি মিত্রশক্তিদের চেয়ে বলকানের স্লাভেরা বরং ঢের বেশি আপন। বন্ধুত্বের প্রতিদানে মিত্রশক্তিরা আমাদের দিয়েছে তো ঐ আফ্রিকার মরুভূমিটা।'

দক্ষিণের সহজসরল মানুষের মুখে এই কথা প্রায়ই শোনা যায় আর সবই শোনে পেপে, মনে রাখে সবই।

এই দেখা গেল একজন ইংরেজকে, কাঁচির মতো দু'পায়ে বেজার মুখে হাঁটছে। অমনি পেপে গিয়ে তার সামনে এমন একটা-কিছু

গুন গুন করতে শুরু করে যা অন্ত্যেষ্টির প্রার্থনাও হতে পারে, আবার হতে পারে নেহাতেই একটা করুণ গানের কলি:

বন্ধু গেল মারা, আমার
বৌয়ের যে মুখ ভার...
দিশা খুঁজে পাই না কো হায়
কীসের ব্যথা তার!

আর হাসিতে ফেটে প'ড়ে পেপের খেলার সঙ্গীরা পিছু নেয় বিদেশী লোকটার আর যখনই সে তার বিবর্ণ চোখের সুস্থির দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে, অমনি ওরা ইদুঁরের মতো ছুটছাট করে লুকিয়ে পড়ে ঝোপঝাড় আর দেয়ালের পাশে।

পেপে সম্পর্কে মজার মজার গল্পের শেষ নেই।

একদিন এক ইতালিয়ান ভদ্রমহিলা তাঁর বান্ধবীর কাছে নিজের বাগানের এক ঝুড়ি আপেল পাঠিয়েছিলেন পেপেকে দিয়ে। বললেন:

'দু'পয়সা পাবি, এতে ক্ষতি হবে না তোর...'

তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে পেপে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে রওনা দিলে। দু'পয়সা নেবার জন্য সন্ধের আগে তাকে আর ফিরতে দেখা গেল না।

মহিলাটি বললেন, 'তোর তেমন তাড়া নেই দেখছি!'

নিশ্বাস ফেলে পেপে বললে, 'তাহলেও ভয়ানক হয়রান হয়ে গিয়েছি সিনোরা! ওরা ছিল তো দশেরও বেশি!'

'এক ঝুড়ি ফল, তাতে দশটা হল?'

'ছেলেগুলোর কথা বলছি, সিনোরা।'

'কিন্তু আপেল?'

'আগে ছেলেগুলোর কথা বলি সিনোরা, মিকেলে, জিয়োভান্নি...'

মহিলাটি রেগে উঠে পেপের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলেন। ধমকে উঠলেন:

'আপেলগুলো দিয়ে এসেছিস? জবাব দে!'

'স্কোয়ার পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম, সিনোরা! কিরকম ভালোভাবে গেছি, শুনুন: ওদের টিটকারিতে প্রথমে কান দিই নি একেবারেই। ভাবলাম, আমাকে ওরা গাধার সঙ্গে তুলনা করছে, করুক। সিনোরার মান রাখার জন্যে এসব আমি সহ্য করে যাব, আপনার মান রাখার জন্যে, সিনোরা। কিন্তু ওরা যখন আমার মাকে নিয়েও হাসাহাসি শুরু করলে তখন ভাবলাম, বটে, এটা কিন্তু চলবে না। ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে এমন আচ্ছাসে ওই দস্যিগুলোকে আপেল ছুঁড়ে মারতে শুরু করলাম, যদি দেখতেন! ভারি মজা লাগত আপনার।'

মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার ফলগুলো ওরা চুরি করেছে?!'

সখেদে নিঃশ্বাস ফেলে পেপে বললে:

'আজ্ঞে না, না। চুরি নয়। যে আপেলগুলো ওদের গায়ে লাগে নি সেগুলো দেয়ালে লেগে থেঁতলে যায়। আর বাকিগুলো — আমার শত্রুরা আমার কাছে হেরে যাবার পর ওদের সঙ্গে মিটমাট করে বাকিগুলো আমরা খেয়ে ফেলেছি...'

পেপের কামানো মুণ্ডুটায় মহিলাটি এক রাশ গালাগালি যা তাঁর জানা ছিল তা বর্ষণ করে বহুক্ষণ চেঁচালেন। সবিনয়ে পেপে সে গালাগালি শুনতে লাগল মনোযোগ দিয়ে, জিভের আওয়াজ করছিল প্রায়ই, মাঝে মাঝে এমন কি প্রশংসাই করতে লাগল:

'আহ কেয়াবাত্! কী একখান বুলি!'

তারপর হয়রান হয়ে মহিলাটি যখন ওর কাছ থেকে ভাগলেন, পেছন থেকে পেপে চেঁচিয়ে বললে:

'যদি দেখতেন ঐ হতভাগাগুলোর নোংরা মাথায় আমি আপনার

বাগানের ঐ তোফা আপেলগুলো কিরকম টিপ করে মেরেছিলাম, তাহলে কিছুতেই এত অস্থির হতেন না। শুধু যদি একবার দেখতেন, তাহলে একটা ডবল পয়সার বদলে আমাকে দুটো ডবল পয়সাই দিতেন নির্ঘাৎ!'

বিজয়ীর বিনীত অহঙ্কারটুকু ঐ নির্বোধ মহিলাটির মাথায় ঢোকে নি। তিনি শুধু কিল উঁচিয়ে শাসালেন।

পেপের দিদি পেপের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো কিন্তু পেপের মতো তুখোড় নয়। ধনী আমেরিকানের একটা ভিলায় সে ঝিয়ের কাজ নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে শুরু করল তার চেহারা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল মেয়েটি, গালে ধরল গোলাপী আভা, ভাল দানাপানি পেয়ে রসাল হয়ে উঠতে লাগল শরতকালের নাশপাতির মতো।

ভাই একদিন জিগ্যেস করলে:

'সত্যিই রোজ খেতে পাস তুই?'

গর্ব করে দিদি বললে, 'ইচ্ছে করলে দিনে দুবার তিনবারও খেতে পারি।'

পেপে পরামর্শ দিলে, 'দেখিস, অত খেয়ে দাঁত নষ্ট করিস না!' তারপর কী খানিক ভেবে আবার জিগ্যেস করলে:

'তোর মনিব বেশ বড়োলোক নাকি রে?'

'নয় আবার, আমার তো মনে হয়, রাজার চাইতেও বড়োলোক!'

'চালাকি করিস না! আচ্ছা, কত জোড়া ট্রাউজার আছে ওর?'

'বলা কঠিন।'

'দশ জোড়া?'

'বোধ হয় বেশি...'

পেপে বললে, 'বেশ, তাহলে আমার জন্যে এক জোড়া ট্রাউজার নিয়ে আসিস, পায়াদুটো যেন বেশি লম্বা নয় কিন্তু গরম।'

'কেন?'

'বা, আমারটার দিকে তাকিয়ে দেখ্ না একবার!'

দেখার মতো অবশ্য বিশেষ কিছুই ছিল না, কেননা পেপের ট্রাউজারটার অল্প একটুই টিকে ছিল।

দিদি বললে, 'তা বটে, সত্যি তোর কিছু পোশাক দরকার। কিন্তু ও যদি ভাবে আমি চুরি করে এনেছি।'

পেপে দিদিকে ভালোমতো আশ্বাস দিলে:

'ভাবিস না লোকের বুদ্ধি আমাদের চেয়ে কম! যার অনেক আছে তার থেকে যদি একটুখানি নেওয়া যায় তো তাকে চুরি বলে না, ওটা হল একটু ভাগ বসানো!'

দিদি আপত্তি করে বলেছিল, 'বাজে বকিস না!' কিন্তু অচিরেই পেপে দিদিকে বুঝিয়ে মত করালে। দিদি যখন রান্নাঘরে নিয়ে এল একটি ভালো হালকা ধূসর রঙের ট্রাউজার, দেখা গেল সেটা পেপের মাথাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, কী করা দরকার তা ঠিক করতে পেপের মুহূর্তও দেরি হল না।

বললে, 'একটা ছুরি দে তো!'

ভাই বোনে মিলে ওরা দ্রুত আমেরিকানটির ট্রাউজার থেকে ছোটদের মতো একটা ভারি মানানসই পোশাক বানাতে লেগে গেল। এবং এ প্রচেষ্টার ফল হল ঢিলেঢালা থলির মতো একটা পাজামা, যা দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হবে কাঁধ থেকে, এবং সে দড়িকে বেঁধে নেওয়া যাবে গলার কাছে। ট্রাউজারের পকেট থেকেই তৈরি হয়ে গেল চমৎকার কাজে লাগার মতো হাতা।

আরো ভালো, আরো আরামের একটা পোশাক এ থেকে করা যেত যদি এসে না বাধ সাধতেন ট্রাউজারের মালিকের বৌ। রান্নাঘরে

এসে মহিলাটি আমেরিকানদের যা নিয়ম সেই মতো এক কদর্য গালাগালির স্রোত বইয়ে দিলেন, সমান কদর্য উচ্চারণে সবকটা ভাষায়।

কিছুতেই এই বাগ্মিতা থামাতে পারলে না পেপে। মুখ কোঁচকাল পেপে, বুকের ওপর হাত রাখলে, হতাশ ভঙ্গিতে চেপে ধরল মাথাখানা, হুতাশে নিঃশ্বাস ছাড়লে কিন্তু অকুস্থলে স্বামীর আবির্ভাব না ঘটা পর্যন্ত মহিলাটি শান্ত হলেন না।

স্বামী জিগ্যেস করলে, 'ব্যাপার কী?'

পেপে বললে:

'আপনার সিনোরা যে-রকম হৈ চৈ তুলেছেন তাতে আমি ভারি অবাক হয়ে গেছি মশায়, বাস্তবিকপক্ষে আপনার কথা ভেবে আমি খানিকটা অপমানও বোধ করেছি। দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে, সিনোরা ভেবেছেন আমরা বুঝি ট্রাউজারখানা নষ্ট করে ফেলেছি, কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওটা আমার গায়ে ঠিকই হবে! ওঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন এই যে ট্রাউজারখানা আমি নিলাম, সেটাই যেন আপনার শেষ সম্বল, আর একজোড়া ট্রাউজার কেনার ক্ষমতাও যেন আপনার নেই...'

আমেরিকান ভদ্রলোকটি অবিচলিতভাবে পেপের এই বক্তৃতা শোনার পর মন্তব্য করলে:

'কিন্তু হে ছোকরা, আমি যে ভাবছি পুলিশ ডাকতে হবে।'

'সত্যি?' পেপে জিগ্যেস করলে অবাক হয়ে, 'কেন বলুন তো?'

'তোমাকে জেলে পাঠাবার জন্যে...'

এতে ভয়ানক আহত বোধ করলে পেপে, এমন কি সে কেঁদে ফেলতেও পারত। কিন্তু কান্না চেপে দারুণ একটা মর্যাদার সঙ্গে বললে:

'লোককে জেলে পাঠিয়ে যদি আপনার আনন্দ হয় সিনোর, তবে পাঠান। আপনার যদি একটা ট্রাউজারও না থাকত, আর আমার অনেক

থাকত, তবে আমি কিন্তু তা করতাম না। আমি আপনাকে দু'জোড়া ট্রাউজার দিয়ে দিতাম, হয়ত তিন জোড়াই, যদিও তিন জোড়া ট্রাউজার কেউ এক বারে পরতে পারে না! বিশেষ করে এই গরমের দিনে...'

আমেরিকানটি হো হো করে হেসে উঠল, কেননা বড়োলোকদেরও মাঝে মাঝে মেজাজ ভালো থাকে।

পেপেকে কিছু চকোলেট খাইয়ে লোকটা এক ফ্রাঙ্ক বকশিস দিয়ে দিলে। টাকাটা কামড়ে দেখে নিয়ে পেপে ধন্যবাদ দিলে দাতাকে:

'ধন্যবাদ সিনোর! টাকাটা মেকি নয় বলেই মনে হয়, না?'

কিন্তু পেপে যখন বড়ো বড়ো পাথরের মাঝখানে একলা দাঁড়িয়ে চিন্তিতভাবে ফাটলগুলো স্থিরদৃষ্টিতে দেখতে থাকে যেন শিলা জগতের কোন এক অন্ধকার ইতিহাস পড়ছে, তখনই পেপের সেরা মূর্তি। এমনি সব মুহূর্তে পেপের জীবন্ত চোখদুটো বড়ো হয়ে ওঠে, আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে দৃষ্টি, সরু সরু হাতদুটো ওর পিছন দিকে, আর অল্প একটু নুয়ে পড়া মাথাখানা সামান্য দুলতে থাকে ফুলের মতো। আর আস্তে করে গুনগুনিয়ে গান গেয়ে চলে পেপে, — গান ওর মুখে লেগেই আছে।

ভালো লাগে ওকে দেখতে যখন ও তাকিয়ে থাকে ফুলের দিকে, উইস্টারিয়া গুচ্ছের দিকে, দেয়াল বেয়ে যা গোলাপী-বেগুনি আভায় ফুটে উঠেছে রাশি রাশি। বেহালার তারের মতো ও দাঁড়ায় টান টান হয়ে যেন কান পেতে শোনে সমুদ্র সমীরণে রেশমী পাপড়িগুলোর কোমল স্পন্দন।

তাকিয়ে থাকে আর গান গায় পেপে:

'ফিয়োরিনো... ফিয়োরিনো...'

আর অনেক দূর থেকে যেন এক বিপুল খঞ্জনীর ধ্বনির মতো ভেসে আসে সমুদ্রের চাপা নিঃশ্বাস। ফুলের ওপর খেলা করে

প্রজাপতি। মাথা তুলে পেপে তাকিয়ে দেখে তাদের উড়ে চলা, রোদ্দুরে মিট মিট করে পেপের চোখ, ঠোঁটদুটো ওর স্ফুরিত হয়ে ওঠে হাসিতে — সে হাসিতে একটু ঈর্ষা একটু-বা বিষাদ মেশা, তবু সেই হল এই পৃথিবীতে এক গুরুজনের উদার হাসি।

মরকত মণির রঙা একটা টিকটিকিকে ভয় দেখাবার জন্য হাতে তালি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে পেপে, 'চ্যো! চ্যো!'

আর যখন আয়নার মতো শান্ত হয়ে আসে সমুদ্র, শিলাস্তূপের মধ্যে যখন তরঙ্গভঙ্গের শাদা ঝালর অদৃশ্য হয় তখন কোন একটা পাথরের ওপর বসে পেপে তার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে স্বচ্ছ জলের ভেতরে, সেখানে লালচে সমুদ্র গুল্মের মাঝে গা ভাসিয়ে চলে মাছ, দ্রুত ঝলক দেয় চিংড়ি, আর কান্নি মেরে চলে কাঁকড়াগুলো। আর এই স্তব্ধতার রাজ্যে নীলাভ জলের ওপর দিয়ে আস্তে করে ভেসে যেতে থাকে ছেলেটার ঝংকৃত ভাবাকুল কণ্ঠ:

'সাগর, ও গো সাগর!..'

বড়োরা মাঝে মাঝে পেপে সম্পর্কে বলে:

'ওটা একটা এনার্কিস্ট হয়ে উঠবে ভবিষ্যতে!'

কিন্তু আর একটু তলিয়ে যারা পরস্পরকে দেখতে পায়, এমন কিছু সহৃদয় লোকের মত অন্য রকম:

'পেপে আমাদের কবি হবে...'

আর ছুতোর মিস্ত্রি পাস্কুয়ালিনো — বুড়ো মতো যে লোকটার মাথাটা মনে হয় রুপো ঢালাই, যার মুখখানাকে মনে হয় প্রাচীন রোমান মুদ্রার ওপরে খোদাই মূর্তির মতো, সেই মানী জ্ঞানী পাস্কুয়ালিনোর আছে একটা নিজস্ব মত:

'আমাদের চেয়ে অনেক ভালো হবে আমাদের ছেলেরা, জীবন তাদের অনেক সুখের হবে!'

সে কথা বিশ্বাস করে অনেক লোক।

ইস্টার

ইস্টারের আগের এক কৃষ্ণপক্ষ রাতের শনিবার। অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কালো পোশাক-পরা একটি নারী-মূর্তি শহরতলীর সংকীর্ণ গলি-ঘুঁজির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। মাথার ওপরকার ঘোমটায় মুখটা চোখে পড়ে না, ঢিলে আচ্ছাদনে অজস্র ভাঁজ। তাতে ওকে দেখায় অসম্ভব লম্বা। হাঁটে নীরবে যেন গভীরতম শোকের প্রতিমূর্তি।

তার পেছনে পেছনে একই রকম ধীর গতিতে চলে বাজনার দল -- দলটা এত ঘেঁষাঘেঁষি যে মনে হয় একাকার একটা দেহ। মাথার ওপরে তাদের রামশিঙার পেতলের মুখগুলো দেখতে ভয়ানক, কোনটা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে, কোনটা প্রার্থীর মতো কালো আকাশের দিকে উঁচু করা, সবকটা বাজনাই গজরায়, হাঁপায়; বিনিদ্র একদল সন্ন্যাসীর মতো নাকী সুরে বাজে ক্লারিওনেট, বাসুনের আওয়াজ শুনে মনে হয় যেন বুড়ো বদরাগী এক পুরুতের হুঙ্কার। কর্নেট-আ-পিস্তন থেকে জাগে প্রতিহিংসার নালিশ আর তার নিরাশ

ধুয়া ধরে ফরাসী শিঙা। স্যাক্সহর্ন থেকে জাগে শোকার্ত প্রার্থনা, নিরানন্দ মার্চ সঙ্গীতটার তালে তাল দিয়ে ওঠে বড়ো জয়ঢাক, আর ছোটো ঢাকের শুকনো চড়বড়ে শব্দের সঙ্গে মিশে যায় পাথরের ওপর শত শত পায়ের খড়খড়ে আওয়াজ।

পেতলের বাজনাগুলো মিট মিট করে এক হলদেটে নিষ্প্রাণ আভায়, আর তাদের বেষ্টনে মানুষগুলোকে দেখায় বিকট বিচিত্র; কাঠের বাদ্যযন্ত্রগুলো যেন শুঁড় তুলেছে উঁচু করে, ছাই ছাই রঙের ঘরবাড়িগুলোর মাঝখানকার সরু রাস্তা দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে চলছে যেন এক প্রকাণ্ড কালো সাপ — গায়কদের দলটা যেন সেই সাপের মাথা।

ছোটো ছোটো অসমান স্কোয়ারগুলোকে দেখায় যেন শহরের পাথুরে পোশাকের কালজীর্ণ এক একটা ছিদ্র। খ্রীস্টের শেষ যন্ত্রণার রাতের এই অদ্ভুত শোভাযাত্রাটা মাঝে মাঝে গিয়ে পড়ে সেই ছিদ্রের মধ্যে তারপর ফের ঠাসাঠাসি করে ফিরে আসে শহরের আর একটা কোন রাস্তার ফাটলে, চেষ্টা করে যেন দেয়ালগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেবার। গোমড়া এই সাপটার এক-একটা অংশ যেন তৈরি হয়েছে জীবন্ত এক একটা মানুষ দিয়ে — ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সাপ বুকে হেঁটে চলে নির্বাক আকাশে ঢাকা শহর দিয়ে, রহস্যাবৃত নারী-মূর্তিটিকে অনুসরণ করে।

স্তব্ধ, কৃষ্ণবাসা সে নারী যেন শোকের এক দুর্ভেদ্য বর্ম পরে রাত্রির অন্ধকারে চলেছে কিসের সন্ধানে। দর্শকের কল্পনাকে সে নারী টেনে নিয়ে যায় কোন প্রাচীন বিশ্বাসের তমসায়, মনে পড়ে যায় আইসিসের কথা, দুরাত্মা সেথ-তিফনের হাতে মারা পড়েছে যার ভাই আর স্বামী; মনে হয় যেন তার দুর্বোধ্য মূর্তিটা থেকে কৃষ্ণ বর্ণের এক জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে সবকিছুকে ঢেকে দিচ্ছে এক যুগাতীত ভয়ংকর তমসায় — সে তমসা যেন এই রাতেই জেগে

উঠেছে শুধু মানুষকে তার অতীত সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে বলে।

সৎকারকালীন সঙ্গীতের রেশ সজোরে ধ্বনিত হয় জানলার কাচে, ঝনঝনিয়ে তোলে তার সার্শি, লোকে কী নিয়ে যেন কথা বলে অনুচ্চ স্বরে, তবে সব শব্দই মিলিয়ে যায় পাথরের ওপর হাজার পায়ের চাপা খসখস শব্দে। পায়ের তলে পাথরগুলো শক্ত তবু মনে হয় যেন মাটিটা টলমলে, বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছে, মানুষের গাঢ় গন্ধ উঠছে তা থেকে, আর অজান্তে লোকে তাকায় ওপরের দিকে, সেখানে কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে মিটমিটিয়ে জ্বলে তারা।

দূরে উঁচু একটা দেয়ালের চৌকো চৌকো কালো কালো জানলার গায়ে এবার জেগে ওঠে লাল আলোর প্রতিচ্ছায়া। সে আলো জ্বলে, নেভে, আবার জ্বলে, আর ঝনের বাসন্তী শ্বসনের মতো ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে যায় একটা চাপা গুঞ্জন।

'আসছে... আসছে...'

সেখানে, সামনে জেগে উঠে বাড়তে থাকে অন্য একটা কোলাহল, লঘু, ওখানকার আলোটাও জ্বলে বেশি উজ্জ্বল হয়ে। মনে হয় নারী-মূর্তিটি যেন তার পদক্ষেপ দ্রুত করে তুলেছে। ভিড়টাও চঞ্চল হয়ে ছুটল তার পেছন পেছন, বাজনদারদের মধ্যেও যেন একটা তাল ভঙ্গ হয়, মুহূর্তের জন্য সুর এলোমেলো হয়ে গৎ ছিঁড়ে শশব্যস্ত একটা বাঁশিতে আচমকা বেজে ওঠে হাস্যকর এক চড়া তান। তাতে অনুচ্চ হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

পর মুহূর্তেই যেন রূপকথার আকস্মিকতার সামনে দেখা যায় ছোট্ট একটা স্কোয়ার, তার মাঝখানে দুটি মূর্তি মশাল আর ফুলঝুরির আলোয় আলোকিত। লম্বা শাদা আলখাল্লায় সোনালী-চুল খ্রীস্টের পরিচিত মূর্তি, অন্যটি তারই প্রিয় শিষ্য নীল পোশাক-পরা জন। তাদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যত কালো কালো

মূর্তি, হাতে তাদের আলো, ময়লা রঙের দাক্ষিণী মুখগুলো সবই এক দিব্য আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত — সে আনন্দ তাদের নিজেদেরই সৃষ্টি, নিজেদেরই গর্ব।

খ্রীস্ট নিজেও আনন্দে উচ্ছল। এক হাতে তাঁর ফুলে ঢাকা মৃত্যুমণ্ড ক্রুশ, অন্য হাতখানা দ্রুত নেড়ে কী যেন বলছেন তিনি। শ্মশ্রুহীন তরুণ জন, আডোনিসের মতো সুন্দর — কোঁকড়া চুলের গুচ্ছে ভরা মাথা দুলিয়ে তিনি হাসেন।

তৈল স্রোতের মতো জনতা স্কোয়ারে উথলিয়ে পড়ে বৃত্ত রচনা করে আর মেঘাবৃত নিশিথিনীর মতো সেই নারী যেন উঁচু হয়ে উঠে ভেসে চলে যায় খ্রীস্টের একেবারে কাছে। সেখানে থেমে ঘোমটা খুলে ফেলে সে, কালো আবরণ তার মেঘের মতো লুটিয়ে পড়ে পায়ের কাছে।

ঘোমটা খসে পড়তেই গর্বিত উল্লসিত দপ্‌দপে আলোয় আত্মপ্রকাশ করে মাডোনার মুখখানা, দু'পাশ ঘিরে নামা চুলের সোনায় সে মুখ উজ্জ্বল আর তাঁর পোশাকের ভেতর থেকে, ঈশ্বর-জননীর কাছ ঘেঁষে যারা দাঁড়িয়ে, তাদের হাত থেকে দলে দলে শ্বেত কপোত ডানার ঝলক দিয়ে উড়ে যায় অন্ধকার আকাশের দিকে। মুহূর্তের জন্য সত্যি করেই বুঝি মনে হয় রূপোর চমক দেওয়া শ্বেতবসনা পুষ্পভূষিতা সেই নারী, শ্বেত এবং প্রায়-স্বচ্ছ খ্রীস্ট আর নীল জন — অদ্ভুত অপ্রাকৃত এই তিন মূর্তিই যেন ভেসে চলেছে স্বর্গে, কপোতের সজীব শ্বেত পক্ষ বিধুননে যেন সত্যিই তাঁদের ঘিরে এসেছে দেবদূতের দল।

'জয়, মাডোনার জয়!' হাজার কণ্ঠে চিৎকার ওঠে জনতার অন্ধকার স্তূপ থেকে আর মুহূর্তে বদলে যায় জগৎ। বাতায়নে বাতায়নে জেগে ওঠে আলো, উঁচু করে তোলা হাতে হাতে জ্বলে ওঠে মশাল, সোনালী ফুলঝুরির ধারা নামে সবখানে, ফেটে পড়ে লাল সবুজ আর বেগুনী

আলোর ঝলক, মাথার ওপর পাক দিতে থাকে কপোত আর সবাই ওপর দিকে চেয়ে উল্লাসে চিৎকার করে উঠে:

'জয়, মাডোনার জয়!'

আলোর দপদপানিতে দুলতে থাকে ঘরবাড়ির দেয়াল আর প্রত্যেকটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ায় শিশু, নারী আর কুমারীরা। মস্ত মস্ত ফুলের মতো ফুটে ওঠে তাদের পরব দিনের জ্বলজ্বলে বেশভূষা, আর জন আর খ্রীস্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রৌপ্যবসনা মাডোনা যেন জ্বলতে থাকেন, গলতে থাকেন। লোকের নজরে পড়ে দুধে আলতা রঙের তাঁর মুখের ডৌল, আয়ত নয়ন, মাথায় ছোটো ছোটো কুণ্ডনে সোনালী কেশদাম যেন মুকুট, দুই উচ্ছল স্রোতে তা নেমে এসেছে তাঁর কাঁধের ওপর। পুনরুজ্জীবিতের যা উচিত, তেমনি আনন্দময় হাসি হাসছেন খ্রীস্ট প্রাণভরে, নীলনয়না মাডোনা হাসছেন মাথা হেলিয়ে আর মশাল টেনে নিয়ে দোলাচ্ছে জন, চারপাশে ছড়িয়ে চলেছে ফুলকি। বয়সে জন নিতান্ত বালক, তীক্ষ্ম চোখ, পাখির মতো লঘু আর ক্ষিপ্র; স্পষ্টই বোঝা যায় দুষ্টুমি করতে পেলে তাঁর ভারি মজা।

দুরন্ত হাসিতে হেসে ওঠেন তিন জনেই — সে হাসি সম্ভব শুধু এই দক্ষিণ দেশী সূর্যের নিচে, উল্লসিত সাগরের কূলে। আর তাঁদের দিকে চেয়ে হেসে ওঠে আশেপাশের লোকেরাও, হাসিখুশি সেই সব লোক যারা সবকিছুর মধ্যে থেকেই সৃষ্টি করতে পারে সুন্দরের, এবং নিজেরাই যারা সুন্দরতম।

বাচ্চারাও থাকে বৈকি। ত্রিমূর্তির পায়ের কাছে তারা মাথার ওপরকার শাদা পাখিগুলোর মতোই ফরফরিয়ে পাক খেতে থাকে আর ঝংকৃত সহর্ষ উদ্বেল গলায় চিৎকার তোলে:

'জয়, মাডোনার জয়!'

প্রার্থনা করে বুড়িরা। স্বপ্নের মতো সুন্দর এই ত্রয়ীর দিকে

তাকিয়ে তারা প্রার্থনা করে। সবকিছুর জন্য, এবং সবার চেয়ে বেশি করে মাডোনা আছেন বলে তারা শুকনো ঠোঁটে ফিসফিসিয়ে জ্ঞাপন করে যায় তাদের কৃতজ্ঞতা যদিও এটা খুব ভালো করেই তাদের জানা যে খ্রীস্ট হল ভিয়া পিজাকেনো রাস্তার এক ছুতোর, জন হল এক ঘড়িওয়ালা আর মাডোনা আর কেউ নয়, কশিদা দর্জি মেয়ে আনিতা ব্রাগালিয়া।

দূর থেকে ভেসে আসে সঙ্গীতের সুগম্ভীর শব্দ আর মনে পড়ে যায় সেই পরিচিত প্রাচীন গানের কথাগুলি:

'মৃত্যু হননের এই উৎসব...'

ভোর হয়ে আসে। গির্জায় সানন্দ ধ্বনি, ঘণ্টাগুলো পাল্লা দিয়ে ঘোষণা করে, বসন্তের দেবতা খ্রীস্ট উত্থিত হয়েছেন মৃতের মধ্যে থেকে। স্কোয়ারে ঘন হয়ে দাঁড়ায় বাজনদাররা, বেজে ওঠে সঙ্গীত আর তার তালে তালে পা ফেলে অনেকেই যায় গির্জার দিকে। সেখানেও অর্গানগুলোয় স্তবগান পুনরুজ্জীবিত বসন্তের দেবতার উদ্দেশে, আর এই পবিত্র মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা শত শত পাখি পাক খেয়ে যায় গম্বুজের নিচে।

জীবন্ত প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র প্রাণী এই পাখি। মানুষের সেরা উৎসবে তাদের অংশীদার করে নেওয়ার এই প্রথাটি ভারি চমৎকার। মন ভরে ওঠে এক আশ্চর্য সুরে যখন দেখি বিচিত্র বর্ণের পালকে ঢাকা ছোটো ছোটো ডানা মেলা এই সব শত শত জীব গির্জার চারপাশে উড়ে উড়ে কূজনে গুঞ্জনে ভরে তুলেছে, উড়ে বসছে কার্নিস আর মূর্তির ওপর, কখনো বা নেমে আসছে বেদীর আসনে।

জনশূন্য হয়ে আসে স্কোয়ারখানা। ভাস্বর সেই তিন মূর্তি হাত ধরাধরি করে মিলেমিশে গায় সুন্দর এক গান, রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে তারা, পেছনে বাজনদাররা, বাজনদারদের পেছনে জনতা। ছোটো বাচ্চারা, আলোর সুন্দর ছটায় তাদের দেখায় যেন ছড়িয়ে পড়া কতকগুলো প্রবালের গুটি। কপোতগুলি ইতিমধ্যে বাড়ির ছাতে আর আলসেতে বসে কূজন শুরু করে দিয়েছে।

ফের মনে পড়ে সুন্দর গানটা:

'খ্রীস্ট উত্থিত হয়েছেন...'

আর সকলেই আমরা উত্থিত হব মৃতের মধ্যে থেকে, মৃত্যুকে জয় করব মৃত্যু দিয়ে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়। আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

'Raduga' Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

Перевод сделан по изданию:
М. Горький. Полное собрание сочинений.
Изд. «Наука», М.—Л., 1970 г., т. 12.

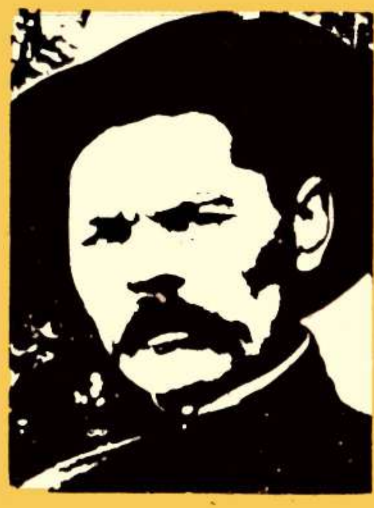

সোভিয়েত সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, অসামান্য রুশ সাহিত্যিক মাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) সৃষ্টিকর্ম সারা বিশ্বের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। তাঁর 'মা' উপন্যাস, তিন খণ্ডে আত্মজীবনীমূলক আখ্যান 'আমার ছেলেবেলা', 'পৃথিবীর পথে', 'পৃথিবীর পাঠশালায়', এপিকধর্মী উপন্যাস 'ক্লিম সামগিনের জীবন', নাটক, ছোটো ছোটো গল্প, লেনিন, তলস্তয়, চেখভের সাহিত্যিক চিত্রায়ণাদি বিদেশী ভাষায় ছাপা হয়ে চলেছে নিরন্তর।

'ইতালির রূপকথা' গোর্কি লেখেন ১৯০৬-১৯১৩ সালে ইতালিতে তাঁর প্রথম বসবাসের সময়, সাধারণ ইতালীয় মানুষের জীবনই তার উপজীব্য। 'স্বয়ং জীবনের হাতে যা রচিত তার চেয়ে সুন্দর রূপকথা কিছু নেই' এণ্ডারসেনের এই কথাকে পুস্তকের শীর্ষলিপিতে তুলে ধরে গোর্কি এই গল্পমালাকে 'রূপকথা' বলেছেন কেবল আপেক্ষিক অর্থে। বইটির পেছনকার ভাবনা গোর্কি নিজেই সূত্রবদ্ধ করেছেন এই বলে: 'লোকদের সুকঠিন, দ্রুত ক্লান্তিকর জীবনে খানিকটা স্ফূর্তি আনা...'

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো